॥ সম্পাদনায় ॥

ডঃ আশ্বিন কুমার ভট্টাচার্য

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর
স্মৃতির উদ্দেশে—

॥সূচী॥

একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১
বাংলা একাঙ্ক নাটকের ধারা— ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ২০

খ্যাতির বিড়ম্বনা—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭
রাজধানীর রাস্তায়—	শচীন সেনগুপ্ত	৪৫
দেবী—	তুলসী লাহিড়ী	৬১
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫
রাজপুরী—	মন্মথ রায়	৯২
অসাধারণ—	মন্মথ রায়	১১৫
শিক কাবাব—	বনফুল	১২৫
উপসংহার—	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৩৯
আধিভৌতিক—	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	১৫৮
সাপ্তাহিক সমাচার—	পরিমল গোস্বামী	১৭৬
উজান যাত্রা—	বিধায়ক ভট্টাচার্য	১৮৯
অপচয়—	দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়	২১২
এক সন্ধ্যায়—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২২২
সাজঘর—	অখিল নিয়োগী	২৩২
কুয়াশা—	সুনীল দত্ত	২৪১
একচিল্‌তে—	গিরিশঙ্কর	২৫৭
সকাল বেলায় একঘণ্টা—	সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী	২৬৫
একটি রাত্রি—	শিতাংশু মৈত্র	২৮০
কোথায় গেল !—	কিরণ মৈত্র	২৮৮
মনোবিকলন—	রমেন লাহিড়ী	২৯৯

একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

দেশ-কালের আধারে পরিণামশীলতার এক মহাতন্ত্র এই বিশ্বপ্রকৃতি। কেউ বলতে পারে না—কোন্ অনাদিকল্প অতীতে তার বিবর্তনের আরম্ভ আর কোন্ অনন্তকল্প ভবিষ্যতেই বা তার বিবর্তনের শেষ। এইটুকু শুধু আমাদের কাছে স্পষ্ট যে সে বিবর্তনশীল। এবং এই কথাই আমরা সত্য ব'লে স্বীকার করি যে অজ্ঞাত এক সুদূর অতীতে তার বিবর্তনশীল জীবনের আরম্ভ হয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তের ভিতর দিয়ে সে নিজেকে অভিব্যক্ত করতে করতে, নতুন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এ চলার বিরাম নেই। এ চলার শেষ নেই। এই চলারই গতিছন্দে অজৈব ও জৈব জগতের বিচিত্র রূপরাজি অভিব্যক্ত হয়েছে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের এক রহস্যময় সংসারচক্র গড়ে উঠেছে। অভিব্যক্তির প্রথম পর্যায়ে মহাকালের বুকে অগণিত নক্ষত্রমণ্ডল, অসংখ্য সৌরজগৎ এবং তাদের গ্রহ-উপগ্রহ জন্মলাভ করেছে। তারপর গ্রহে-উপগ্রহে অজৈব জগতের কত বিরাট কত বিচিত্র প্রকাশই না দেখা দিয়েছে। সেখানে কত বিচিত্র রূপ! কত বিচিত্রতর রূপান্তর! গুণময়ী প্রকৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে অবশ্যই মনে হবে এ যেন তার উদ্দেশ্যমূলক আচরণ; এ যেন বহুরূপে নিজেকে সৃষ্টি; প্রকৃতির হাতে-গড়া শিল্প; অথবা কোন বিধাতা পুরুষ কল্পনা করলে—দৈবশিল্প। কিন্তু 'শিল্প' শব্দটি—এ সব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, সাগর, মহাসাগর, পর্বত, মরুভূমি প্রভৃতিকে কখনই 'শিল্প' আখ্যা দেওয়া হয় না। কারণ তারা কোন সচেতন ব্যক্তির সজ্ঞান সৃষ্টি নয়—সৌন্দর্যবোধের বা রূপচেতনার প্রকাশ নয়। অতএব, এই পর্যায়ে বস্তুর বিচিত্ররূপ অভিব্যক্তি থাকলেও 'শিল্প' নেই—সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন কোন স্রষ্টা বা দ্রষ্টা নেই।

এই স্তরের পরবর্তী পর্যায়েও অর্থাৎ মনুষ্যেতর প্রাণীর পর্যায়েও শিল্পের জন্ম সম্ভব হয়নি। এককোষী প্রাণী থেকে শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বানর প্রজাতি পর্যন্ত যে সব প্রাণী উদ্ভূত হয়েছে, তারা যদিও জীবধর্মের প্রেরণায় নানারূপ আচরণ

করেছে, এমন কি উচ্চতর প্রাণীদের কেউ কেউ আত্মরক্ষার এবং আত্মপ্রজননের তাগিদ মেটাতে যেয়ে পরিবেশ থেকে বস্তু সংগ্রহ করে উপযোগী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তবু তাদের সেই সৃষ্টিকে শিল্প বলে কখনও মর্যাদা দেওয়া হয়নি। উই বা পিঁপড়ের বাসায়, বাবুই পাখীর বাসায়, মৌমাছির মৌচাক নির্মাণে এবং আরো অনেক কিছুতে নির্মাণবৃত্তির প্রশংসনীয় নিদর্শন পাওয়া যায়, এ কথা সত্য, এও সত্য যে মনুষ্যেতর প্রাণীদের কারো কারো মধ্যে বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের প্রবণতাও কিছু কিছু পাওয়া যায় এবং সৌন্দর্যবোধের আভাসও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায় (ডারুইন "অরিজিন অফ স্পিসিজ" গ্রন্থে একাধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করেছেন), কিন্তু এ কথা আরো বেশী সত্য যে প্রাণীদের উল্লিখিত নির্মিতিগুলিকে বা বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের ফলকে শিল্প বলে গণ্য করা হয় না—গণ্য করা চলেও না। সুতরাং মনুষ্যেতর প্রাণীর স্তরে আর যাই হো'ক, শিল্পের জন্ম হয় নি।

শিল্পের জন্ম সম্ভব হয়েছে বিবর্তনের আরো এক ধাপ এদিকে এগিয়ে—'মনুষ্য' প্রজাতির উদ্ভবের পরে। মনুষ্যেতর প্রাণীর স্তর থেকে যেদিন মনুষ্য প্রজাতির উদ্ভব ঘটল, সেদিন জৈব বিবর্তনের ধারা নতুনতর একটি স্তরে উন্নীত হ'ল—বিবর্তন-ধারায় এক গুণগত পরিবর্তন দেখা দিল। এই গুণগত পরিবর্তনের মূল নিহিত ছিল 'মানুষ'-নামক প্রাণীর ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের বা স্নায়ুতন্ত্রের জটিল সংগঠনের মধ্যে। মানুষের স্তরে পৌঁছে ঊর্ধ্বতন মস্তিষ্কের গঠনে এমন একটা পরিবর্তন বা পরিবর্ধন (vast expansion of the association area) দেখা দিল, যার ফলে মানুষ বাগ্‌ভাষা (articulate speech) প্রয়োগে সমর্থ হল—বাইরের ও অন্তরের অভিজ্ঞতাকে শব্দ সংকেতে প্রকাশ করার অধিকার লাভ করল। এই অধিকারই মনুষ্যত্বের প্রথম এবং প্রধান অধিকার এবং এর বলেই মানুষের মধ্যে কল্পনা শক্তির ও চিন্তাশক্তির উদ্ভব ঘটেছে—মানুষ সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে—মানুষ মনোজীবক (psychozoic) প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

তবে, মনোজীবকই হোক আর যাই হোক—জীবস্বভাবটুকু তার ঠিকই আছে। অন্য জীবের মতোই মানুষকে আত্মরক্ষা-আত্মপ্রজননে, এক কথায় অভিযোজনে, ব্যাপৃত থাকতে হয়। অর্থাৎ মনোজীবকত্ব তার বিশেষ স্বভাব বটে কিন্তু মূল স্বভাব জীবত্ব। মানুষ যে উন্নত মানসিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে তা অভিযোজন নিরপেক্ষ কোন ঘটনা নয়, তা অভিযোজন-ব্যাপারেরই ফল এবং অভিযোজনেরই উন্নততর উপায় বিশেষ। জীবনযাপন বলতেই যখন

পরিবেষ্টনীর সঙ্গে বুঝাপড়া করার চেষ্টা, এক কথায় অভিযোজন বুঝায়, তখন এককোষী থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রজাতিই অভিযোজনে ব্যাপৃত থাকতে বাধ্য। এরই তাগিদে জীব যূথবদ্ধভাবে বাস করতে চায়, মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, সামাজিক জীবন যাপন করতে চায়। আমরা দেখি প্রাণীদের অনেকেই যৌথ জীবন যাপন করে, দলবদ্ধভাবে আত্মরক্ষা করে এবং বংশ রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু বাগ্‌ভাষার অধিকার এবং আনুষঙ্গিক ক্ষমতা নেই বলেই পশুরা পশুর স্তরেই রয়ে গেছে। তারা দলবদ্ধ জীবন যাপন করলেও সমাজ গড়তে পারেনি, অভিযোজনের উন্নততর প্রণালী উদ্ভাবন করতে পারেনি। এখানেই পশুর জীবনের সঙ্গে মানুষের জীবনযাপনের মৌলিক পার্থক্য। পশুরা দলবদ্ধ জীবন যাপন করে নিছক নির্জ্ঞান জৈবিক আবেগের তাড়নায় আর মানুষের সামাজিক জীবন অনেক পরিমাণে তার সজ্ঞান ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। পশুদের অভিযোজন প্রচেষ্টা যেখানে অতি সাধারণ কয়েকটি কায়িক-মানসিক আচরণে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, মানুষের অভিযোজন প্রচেষ্টা সেখানে মনন-ক্ষমতার এবং প্রকাশ-ক্ষমতার সহায়ে, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরাট ও বিচিত্র আকারে পরিণত হয়েছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস আসলে মনোজীবক প্রাণী মানুষেরই উন্নত অভিযোজন-প্রচেষ্টার ইতিহাস—অভিযোজন করতে যেয়ে মানুষের মনে যে চিন্তা জন্মেছে এবং জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যে চিন্তা মানুষের ইচ্ছা ও অনুভবকে প্রভাবিত করেছে—সেই চিন্তার ইতিহাস; অভিযোজনের প্রয়োজনে মতিবুদ্ধি খাটিয়ে যে সব দ্রব্যসামগ্রী মানুষ তৈরী করেছে সেই সব কারুকর্মের ইতিহাস এবং সমাজের বা নিজের আনন্দ-বেদনার উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে যেয়ে যে সব চারুরূপ রচনা করেছে সেইসব চারুকর্মের ইতিহাস—এক কথায় মানুষের জ্ঞান-অনুভব-কর্মের বিচিত্র প্রকাশের ইতিহাস। এই সমস্ত কিছুরই মূলে জীবন ও তার অভিযোজন প্রচেষ্টা—জীবনের প্রয়োজনেই জ্ঞান, জীবনের প্রয়োজনেই অনুভব বা প্রেম, জীবনের প্রয়োজনেই কর্ম। জীবনের বৃন্তেই জ্ঞান-অনুভব-কর্মের ফুল ফোটে, জীবনের ভিত্তির উপরেই জ্ঞানের, অনুভবের এবং কর্মের বিচিত্র প্রকোষ্ঠ গড়ে উঠে। জীবনের চিন্তাই যুক্তিযুক্ত হ'য়ে 'সত্য' নাম ধারণ করে, জীবনের কল্পনাই রূপ লাভ ক'রে 'সুন্দর' আখ্যা পায়, এবং জীবনের ইচ্ছা বা কর্মই মঙ্গল বোধের সঙ্গে সঙ্গত হ'য়ে 'শিব' নাম গ্রহণ করে। এই কারণেই অর্থাৎ সত্য-শিব-সুন্দরের বোধ জীবন যাপনেরই ফল বলে, সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে সত্য-শিব-সুন্দরের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত হয়ে আছে। সত্য-চেতনা, শিব-চেতনা এবং সৌন্দর্য-চেতনার দেশকাল

নিরপেক্ষ কোন রূপ নেই। যেমন সত্য-চেতনার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ আছে, তেমনি শিব-চেতনার এবং সৌন্দর্য-চেতনারও উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আছে। সুতরাং সত্য-শিব-সুন্দর চেতনার কথা একটিমাত্র কথাই নয়, রীতিমত একটি ইতিকথা—আদিম অবস্থা থেকে সমাজ যত স্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে এসেছে, সেই সব বিশেষ বিশেষ স্তরে মানুষের সত্যবোধ, শিববোধ এবং সৌন্দর্যবোধ যে যে রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে তারই ক্রমবিকাশের ইতিহাস। এই ক্রমাভিব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে সত্য-শিব-সুন্দর—কারো স্বরূপই সম্যক জানা যায় না। এই কারণেই জ্ঞানের, শিল্পের এবং কর্মের উৎপত্তি ও পরিণতির আলোচনা করতে, তাদের বিষয় ও রূপরীতির আলোচনা করতে, ঐতিহাসিক এবং নৈয়ায়িক দুই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে। কারণ সংজ্ঞাকরণ যেখানে ব্যক্তিরই স্বরূপলক্ষণনির্দেশ এবং ব্যক্তি যেখানে ইতিহাসের অন্তর্গত, সেখানে ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস বাদ দিয়ে রেখে, সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার করা চলে না।

আসল কথা, কোন শিল্পের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য, রূপ এবং রীতির বিচার করতে হলে সমাজের যে বিশেষ অবস্থায় শিল্পের জন্ম এবং যে যে বিশেষ অবস্থার ভিতর দিয়ে শিল্পের ক্রমবিকাশ ঘটেছে সেই সেই অবস্থার বিশেষ প্রকৃতিটি অবশ্যই জেনে নেওয়া দরকার। কেন জেনে নেওয়া দরকার, একটি দৃষ্টান্ত দিলেই তা' বুঝা যাবে। নাটকের কথাই ধরা যাক। আমরা জানি প্রথম নাটকের উৎপত্তি বা অভিনয় হয়েছে ধর্মোৎসবে; প্রথম নাটকের বিষয়বস্তু 'দেবতার কাহিনী', প্রথম নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য—সমাজের ধর্মীয় আবেগের পরিতর্পণ, নাটকের আদিম রূপ—একক একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত অনুকরণ, নাটকের রীতি—গীতিকেন্দ্রিক বা কাব্যিক। প্রথম পর্যায়ের নাটকের এই প্রকৃতি কেন তা' ব্যাখ্যা করতে হলে, অবশ্যই আমাদের আদিম যুগের সমাজব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। প্রথমতঃ আদিমযুগের সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলতে যা বুঝায় তার কিছুই ছিলনা, ছিল সমষ্টি-চেতনা। এর কারণ আর কিছুই নয়, কারণ এই যে আদিম পর্যায়ের সমাজে (আহরণ ও শিকার যুগে উৎপাদন-বণ্টনে কোন জটিলতা দেখা দেয়নি বলে শ্রমবিভাগ বা কর্মবিভাগের কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি) সমগ্র সমাজ যেন একক একটি সত্তা, সমষ্টিগতভাবে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত এবং জ্ঞানে, অনুভবে ও কর্মে একক। তারপর আদিম সমাজের মানুষও আজকের মানুষেরই মতো জৈবিক এবং মনোজৈবিক দুই প্রেরণারই অধীন ছিল। মনের প্রেরণাবশেই পরিবেশের

অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত গড়তে যেয়ে আদিম সমাজের মানুষ অতিপ্রাকৃত একটি শক্তির বা সত্তার অস্তিত্ব অনুমান করেছিল। এই শক্তিকেই সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধিকর্তা বলে সর্বশক্তিমানের আসনে বসিয়েছিল এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে তথা আত্মরক্ষা করতে সে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। আদিম মানুষের বিশ্বাসপ্রবণ অনুমানসর্বস্ব অনৈয়ায়িক মনে এই বিশ্বাসের প্রভাব সহজেই অনুমেয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানই ছিল আদিম সমাজের সবচেয়ে ঐকান্তিক আবেগপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং সব অনুষ্ঠানই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মমূলক। এই সব অনুষ্ঠানেই সমগ্র সমাজ জ্ঞান-অনুভব-কর্মের চরম সার্থকতা উপলব্ধি করত। এই কারণেই অর্থাৎ সমাজের বিশেষ অবস্থার জন্যই প্রাচীন সমাজের মানুষের আনন্দ-বেদনা ধর্মোৎসবকে কেন্দ্র করেই আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। আগেই বলেছি, নৈয়ায়িক বুদ্ধির অভাবে এই সমাজের সবচেয়ে প্রবল আবেগ ধর্মীয় আবেগ ; দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে পারাই সবচেয়ে বড় কাজ—পরম পুরুষার্থ। সুতরাং দেবতার কাহিনীই সব চেয়ে আবেগোদ্দীপক এবং নাটকের প্রথম বিষয়বস্তু। কিন্তু এই কাহিনী বহুস্থান-কাল-পাত্রের সংযোগে খুব জটিল ছিল না। কারণ জটিল কাহিনী কল্পনা করার জন্য যে উন্নত মানসিক ব্যাপার বা জটিল ঘটনা দরকার তা তখনও সম্ভব হয়নি। এই কারণেই আদিম যুগের গান ও গল্প যেমন আকারে ছোট ছিল তেমনি. প্রথম পর্যায়ের নাটকও ছিল একটি একক ঘটনার উপস্থাপন—সরল এবং সংক্ষিপ্ত একটা বৃত্ত। সরলতা এবং সংক্ষিপ্ততাই ছিল প্রথম যুগের রচনার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য। যে কোন একখানি গ্রীক ট্র্যাজেডিকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাব যে প্রত্যেক নাটকেই একটিমাত্র ঘটনাকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে—বৃত্তের একটি মাত্র ধারা, তা'তে কোন উপধারা নেই এবং বৃত্তের মধ্যে যে ঘটনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে তার কাল-ব্যাপ্তিও খুবই অল্প অর্থাৎ ঘটনার এবং অভিনয়ের কালমাত্রার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে একটি মাত্র ঘটনাকে সংক্ষিপ্তাকারে অর্থাৎ স্থান-ঐক্য এবং কাল-ঐক্য বজায় রেখে রূপ দেওয়ার এই চেষ্টা অহেতুক কোন ব্যাপার নয়। যে সামাজিক অনুষ্ঠানে ঐ নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল, তার বিধি ব্যবস্থা, যে ভাবে নাট্যাভিনয়ের উৎপত্তি হয়েছিল সেই নিমিত্ত কারণটি, যে মন থেকে ঐ রচনাগুলির সৃষ্টি হয়েছিল সেই মনগুলির শক্তিসামর্থ্য—সব কিছু মিলে নাট্যরচনার প্রথাটি প্রচলিত হয়েছিল। ডাওনিসাস দেবতার উৎসবে যে সমবেত সংগীত 'ডিথিরাম্ব' গান করা হত, সেই সমবেত সংগীতকে কেন্দ্র করে

গ্রীকনাটকের জন্ম হয়েছিল বলে কোরাসই ছিল গ্রীকনাটকের ঐক্য-বিধায়ক মূলশক্তি, কোরাসই ছিল গ্রীকনাটকের সূত্রধার এবং কোরাসেরই ছিল নাটকীয় ঘটনাগুলির বিভিন্ন পর্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব। যদিও কোরাস একাধারে ছিল সংযোগবিধায়ক ভাষ্যকার এবং অন্যতম চরিত্র, প্রকৃতিতে কোরাস ছিল গায়ক—ডিথিরাম্ব-গায়কেরই বংশধর। তাই কোরাসকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করে যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছিল, তা অনিবার্য ভাবেই গীতিকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অধিকন্তু কোরাস নানা পর্বের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব নেওয়ায় গ্রীক নাট্যকাহিনীতে সুস্পষ্ট অঙ্ক-বিভাগের প্রয়োজন তত অপরিহার্য বলে মনে হয়নি। গ্রীক নাটকের কাহিনী কোরাস দ্বারা সন্ধি-বিভক্ত হয়েছে বটে—প্রত্যেক কাহিনীই বেশীকম সন্ধি-বিভক্ত—কিন্তু অঙ্ক-বিভক্ত নয়। এই কারণে, যদিও গ্রীকনাটককে একাঙ্ক বা পঞ্চাঙ্ক কোন বিশেষণই দেওয়া চলে না, তবু একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে যে গ্রীকনাটক যেখানেই "ঘটনা-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং স্থান-ঐক্য" নিষ্ঠার সঙ্গে মানতে চেষ্টা করেছে সেখানেই তা' একাঙ্কের আদর্শ সংহতির দিকেই এগিয়ে গিয়েছে। কাল-স্থানের ঐক্য এবং ঘটনার কাল-মাত্রার ও অভিনয়ের কালমাত্রার সমতা থেকেই ঐ আদর্শ সংহতির রূপটি পাওয়া যায়। বাস্তবিকই, একটি মাত্র সরল ঘটনা বা স্বল্পকালব্যাপী কার্যকে স্থান-কালের ঐক্যের আধারে যেখানে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানে একাঙ্কোচিত সরলতা ও সংক্ষিপ্ততা তথা সংহত রূপটি না পাওয়ার কোন কারণ নেই। একাঙ্ক নাটকের অন্যতম লক্ষণ—বহিরঙ্গ লক্ষণ হলেও লক্ষণ বটে—স্বল্পাকৃতিকত্ব, প্রথম পর্যায়ের গ্রীকনাটকেও লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকনাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করতে যেয়ে মহামতি এ্যারিষ্টটল যে কথাটি লিখেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোরাসের সঙ্গে একটিমাত্র পাত্রের সংযোগের ফলে প্রথম নাট্য গড়ে উঠেছিল এবং ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্রের সংযোগ বা সমাবেশ ঘটায় গ্রীকনাটক বর্তমান আকৃতি লাভ করেছিল।

বিশেষ লক্ষ্যণীয় এই যে প্রথম পর্যায়ে নাটকের বৃত্ত ছিল স্বল্পায়তন—"short plot," এবং পরবর্তী কালে বৃহদায়তন বৃত্ত (one of greater compass) রচিত হয়েছিল। এই "বিষয়-ঐক্য—কাল-ঐক্য—স্থান-ঐক্য"-বিশিষ্ট স্বল্পায়তন বৃত্ত, আকৃতি-প্রকৃতিতে যে একাঙ্ক নাটকেরই সমগোত্রীয়, এ কথা অবশ্যই বলা যেতে পারে। কিন্তু এই স্বল্পায়তন বৃত্তের গঠন—যা অতি প্রথমে

ছিল "mere improvisation" এবং পরে বিবর্তিত হতে হতে যা' "short plot"-এ দাঁড়িয়েছিল এবং আরো পরে বিবর্তিত হতে হতে যা' অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন বৃত্তে পরিণত হয়েছিল—অবশ্যই স্রষ্টার মানসিক সামর্থ্য এবং সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। স্বল্পায়তন বৃত্তের স্থলে ক্রমে যে বৃহদায়তন বৃত্তের চাহিদা দেখা দিয়েছিল তাও অহেতুক কোন ঘটনা নয়।

একদিকে অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারের তথা কল্পনা-পরিকল্পনা ক্ষমতার বৃদ্ধি, অন্যদিকে সামাজিক জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ও জটিল ঘটনার বা কাহিনীর সম্ভাব এবং দীর্ঘকালব্যাপী অনুষ্ঠানের বা উপস্থাপনার অবকাশ—এই সব নানা কারণের সংযোগে বৃহদায়তন বৃত্ত প্রচলিত হয়েছিল। তারপর থেকে, সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সমাজের অবস্থা-ব্যবস্থার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন বৃত্ত রচনার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রশ্রয় পেয়েছিল এবং স্বল্পায়তন বৃত্তের রচনা প্রেরণার অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইয়োরোপীয় নাটকের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, যে মধ্যযুগের শেষে এবং রেণেসাঁসের গোড়ার দিকে স্বল্পায়তন প্রহসন এবং "ইন্টারলুড" নামক নাটিকাগুলি রচিত হয়েছিল বটে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং তারও পরে দু'একখানা একাঙ্ক নাটক মাঝে মাঝে রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু একথা অবশ্যই বলা যায় যে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৃহদায়তন (পঞ্চাঙ্ক, চতুরঙ্ক, ত্র্যঙ্ক) নাটকেরই একাধিপত্য চলে এসেছে।

✓একাঙ্ক নাটকের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—বিংশ শতাব্দীতে এসেই। আগেই বলেছি একাঙ্কের মতো স্বল্পায়তন নাট্যের বৃহদায়তন নাট্যের কাছে পরাভব, ক্রমে তিরোভাব এবং বিংশ শতাব্দীতে পুনরাবির্ভাব অহেতুক ঘটনা নয়; নিশ্চয়ই অলৌকিক প্রেরণার ফলে ঘটেনি। এক্ষেত্রেও চাহিদা ও যোগানের নিয়ম কাজ করেছে। পেশাদার সম্প্রদায়ের বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের চাহিদায় যে সমস্ত নাটক রচিত হয়েছে তার গঠন অভিনয়কালের মাত্রা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পারেনি। দীর্ঘকালস্থায়ী অভিনয়ের জন্য অনেকাঙ্ক নাটকই কাম্য। এই সব অনুষ্ঠানে স্বল্পায়তনবৃত্তের নাটিকার বিশেষ কোন মর্যাদা বা স্থান ছিল না। তবে একেবারেই ছিল না এমন কথা বলা যায় না। এইসব অভিনয়ে পঞ্চাঙ্ক নাটকের আগে পিছে একাঙ্কিকা প্রয়োগের সুযোগ ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে—"কার্টেন রেজার"গুলি (যবনিকা-উত্তোলক প্রহসন বা পূর্বরঙ্গীয় নাটিকা) এবং পরিশিষ্ট নাটিকাগুলি (দর্শকের মন হাল্‌কা করার জন্য একাঙ্ক প্রহসন) এই জাতীয় নাটকের দৃষ্টান্ত। বিংশ শতাব্দীর

গোড়ার দিকেও এদের দেখা গেছে। কিন্তু আধুনিক ব্যবসায়িক থিয়েটারের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের পূর্বরঙ্গীয় নাটিকার এবং পরিশিষ্ট নাটিকার অভিনয় প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে এবং পঞ্চাঙ্ক নাটকের বৃহদায়তন বৃত্তও সংকুচিত হয়ে ত্র্যঙ্ক, চতুরাঙ্ক নাটকের সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করেছে। সে যাই হোক, আমরা দেখলাম, পেশাদার রঙ্গমঞ্চে একাঙ্কিকার চাহিদা "কার্টেন রেজার" বা "আফটার পিস" প্রহসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কোন ব্যবসায়ী নাট্যাধিকারীই তখন গুরুগম্ভীর ভাবের কোন একাঙ্কিকা অভিনয় করার কথা ভাবতে পারেন নি; একই কারণে আজও কেউ ভাবতে পারেন না এবং পারেন না যে তার প্রমাণ—এখনও কোন পেশাদার থিয়েটার নিয়মিতভাবে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় (প্রতি শো-তে দু'খানা করে?) চালাতে এগিয়ে আসছেন না। আমরা দেখতে পাই—অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মাণ নাট্যকার এবং নাট্যাতত্ত্ববিদ লেসিঙ্—'ইহুদী' (Die Juden) নামে একখানি একাঙ্ক নাটিকা লিখেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবনাট্য-আন্দোলনের গোত্র-পিতা নাট্যকার ইবসেন, 'The Warriors Barrow' (1850)—নামে একখানি একাঙ্কিকা লিখেছেন এবং নাট্যকার ষ্ট্রিণ্ডবার্গ প্রভৃতি একাধিক একাঙ্কিকা রচনা করেছেন এবং তা থেকে এ কথা অনুমান করা চলে যে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ একাঙ্কিকা রচনার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন; কিন্তু তখনও একাঙ্কিকার সামাজিক চাহিদা দেখা দেয়নি বলে ঐ রচনাগুলিকে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হিসাবেই গণ্য করতে পারি। তখনও একাঙ্কিকা নাট্যকারদের অন্যতম প্রকাশ-মাধ্যম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেনি। যদিও "the usual one act piece is to the play as the short story is to the novel" এবং যে সামাজিক অবস্থায় আধুনিক ছোটগল্পের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে সেই অবস্থায় একাঙ্কিকা রচনার প্রেরণাও প্রত্যাশা করা যায়, অর্থাৎ আধুনিক ছোটগল্প যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ ফল—"peculiar product of nineteenth century", একাঙ্কিকাও তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ দান হিসাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করবে—কিন্তু আমরা দেখি ছোটগল্প যত সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে একাঙ্কিকা তত সহজে প্রতিষ্ঠা বা প্রসার লাভ করতে পারে নি। পারে নি তার কারণ এই যে ছোটগল্পের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যেখানে সংবাদপত্রের একটিমাত্র মাধ্যম বা বাহনই যথেষ্ট, সেখানে একাঙ্ক নাটিকার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংবাদ-পত্রের সঙ্গে সঙ্গে চাই এমন কতকগুলি স্বাধীন ও সৌখিন নাট্যগোষ্ঠী যাঁরা

ঐ একাঙ্কিকাগুলি অভিনয় করবেন। আধুনিক ছোটগল্পের এবং একাঙ্কিকার শ্রীবৃদ্ধির মূলে সংবাদপত্রের দান কতখানি, তা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এ কথা সত্য, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার আওতায়, ব্যক্তির শ্রেণীচেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ উন্মেষিত ও বিকশিত হওয়ায়, ব্যক্তি-জীবন অধিকতর গুরুত্ব লাভ করেছে এবং ব্যক্তিজীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখের কথা, ব্যক্তিমনের রহস্যকে, এক কথায় জীবনের ছোট ছোট ঘটনাকে ব্যক্ত করার জন্য সমাজমনে একটি নতুন প্রবণতা দেখা দিয়েছে। ব্যক্তিজীবনের বিচিত্র আচরণকে নানা দিক থেকে এবং নানা পরিস্থিতিতে বিন্যস্ত করে পর্যবেক্ষণ করার এই প্রবণতা—ব্যাপকতর ও বহুমুখী জীবনজিজ্ঞাসারই পরিণতি বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রবণতাটুকুই তো যথেষ্ট নয়। প্রবণতা যদি আশ্রয় বা বাহন খুঁজে না পায়, তাহ'লে দরিদ্রের মনোরথের মতোই তা' নিষ্ফল হয়ে যায়। 'সংবাদপত্রই হচ্ছে সেই বাহন যা আশ্রয় ক'রে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনসমালোচনার ঐকান্তিক প্রবৃত্তি' ছোটগল্পের আকারে আত্ম-প্রকাশ করার সুযোগ ক'রে নিয়েছিল। আধুনিক ছোটগল্পের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে সংবাদপত্রের পত্রপুটেই ছোটগল্পের জন্ম ও পুষ্টি হয়েছে। কিন্তু একাঙ্কিকা রচনার প্রেরণার জন্য শুধু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাই যথেষ্ট নয়; একাঙ্কিকা রচনার মুখ্য প্রেরণা আসতে পারে একমাত্র রঙ্গপৃষ্ঠ থেকেই—একাঙ্কিকা-অভিনয়ের চাহিদা থেকেই। সুতরাং ছোটগল্পের বাহন যেখানে একটিমাত্র অর্থাৎ সংবাদপত্র, একাঙ্কিকার বাহন সেখানে দুটি—সংবাদপত্র ও নাট্যগোষ্ঠী। এই কারণেই একাঙ্কিকার প্রতিষ্ঠা এসেছে ছোট গল্পের প্রতিষ্ঠার অনেক পরে—স্বাধীন নাট্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠার পরে। প্রথমে ইয়োরোপে এবং পরে আমেরিকায় এবং অন্যান্য মহাদেশে যে সব অপেশাদার এবং আধাপেশাদার স্বাধীনচেতা নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল—যেমন প্যারিসের Theater Libre—১৮৮৭, বার্লিনের Freie Buhne—১৮৮৯, লণ্ডনে Independent Theatre—১৮৯১, প্যারিসের Theatre de laeuvre—১৮৯৩, ডাবলিনের Little Theatre—১৮৮৯, Abbey—১৯০৪, শিকাগোর New Theatre, Hull House Theatre—১৯০৬, প্যারিসের Theatre du Vieux Colombier—১৯১৪, নিউইয়োর্কের Provincetown players, Neighbourhood playhouse, Washington Square players—১৯১৫ (১৯১৯ খ্রীঃ Theatre guild এ পরিণত)—বিভিন্ন কম্যুনিটি থিয়েটার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থিয়েটার—

এই সব নাট্যগোষ্ঠীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেই তথা চাহিদাতেই একাঙ্ক নাটিকা তার বর্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আমেরিকাতে যেমন আর্থার হপকিন্স মহাশয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দেই—নিখিল আমেরিকা নাট্য উৎসব প্রবর্তন করে (এবং "দি থিয়েটার আর্টস মান্থ লি" পত্রিকা প্রকাশ ক'রে) একাঙ্কিকার চাহিদা আরো বাড়িয়ে দেন, ইংলণ্ডে তেমনি জিওফ্রে হুইটওয়ার্থ প্রতিষ্ঠিত "ব্রিটিশ ড্রামা লিগ" (বি-ডি-এল)-এর (১৯১৯) কার্যকলাপ, বিশেষ করে ড্রামা লিগ আয়োজিত বাৎসরিক কম্যুনিটি থিয়েটার উৎসব অর্থাৎ একাঙ্ক নাটিকার প্রতিযোগিতা, একাঙ্ক নাটিকার চাহিদা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। "স্কটিশ কম্যুনিটি ড্রামা এসোসিয়েশান্" (এস-সি-ডি-এ)—আয়োজিত একাঙ্ক প্রতিযোগিতার প্রেরণাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। তারপর "কার্নেগি ইউনাইটেড কিংগডম ট্রাষ্ট"-সাহায্যপুষ্ট কাউন্টি ড্রামা কমিটিগুলিও একাঙ্ক নাটিকা রচনায় উল্লেখযোগ্য প্রেরণা যুগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে কলেজে নাট্যবিভাগ ও থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একাঙ্ক নাটিকা রচনার প্রেরণায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সরকার পৃষ্ঠপোষিত "ফেডারেল থিয়েটার প্রোজেক্ট" (১৯৩৫ প্রতিষ্ঠিত) এবং ইংলণ্ডের "গিল্ড অফ লিটল থিয়েটার্সে"র (১৯৪৬) উদ্যমও স্মরণীয়। তবে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ৪ বছর কাজ করার পরে বিশেষ কয়েকটি কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। একটি কারণ খুবই উল্লেখযোগ্য এবং প্রত্যেক আধুনিক নাট্যকারের ও নাট্যগোষ্ঠীর অবশ্য বিবেচ্য। নাট্যশিল্পীদের অর্থ সাহায্য করে নাট্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি করবার জন্যই প্রতিষ্ঠানটি গড়া হয়েছিল। কিন্তু বহু অর্থব্যয়ের পর সরকার দেখলেন আশানুরূপ ফল পাওয়া দূরের কথা—যে থিয়েটার দলগুলিকে তাঁরা টাকা দিয়ে পুষ্ট করছেন তাদের অনেকেই নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করবার চেষ্টা করছে। কী আপশোষ! এই সব সম্প্রদায়কে অর্থ-সাহায্য দিয়ে পুষ্ট করা আর দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা একই কথা! রক্ষণশীলরা চীৎকার শুরু করলেন—ফলে প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে গেল। বলা বাহুল্য, নতুনভাবে জীবন সমালোচনা করবার চেষ্টা, নতুন জীবনাদর্শ অনুসারে জীবন গড়ার সঙ্কল্প থেকেই অপেশাদার স্বাধীন থিয়েটার সম্প্রদায়গুলির জন্ম এবং সেই প্রবৃত্তি বশেই প্রগতিশীল নাট্যসম্প্রদায়গুলি—'socialistic or communistic propaganda' ক'রেছিল এবং এখনও করছে। "ফেডারেল থিয়েটার প্রোজেক্ট" বন্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আমেরিকায় নতুন নতুন বিষয়-

বস্তু এবং রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিশ্চয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।
যেতে পারে না বলেই যায়নি। এ কথা অনুমান করতে কষ্ট করতে হয় না
যে যাঁরা অর্থলোভে বা খ্যাতিলোভে দল গড়েননি—মানবতার আদর্শ অর্থাৎ
সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার
জন্যই দল গড়েছেন, তাঁরা সরকারের অর্থসাহায্যের আশায় নিজেদের আদর্শ
ও অভিপ্রায় বিসর্জন দিয়ে শুধু প্রয়োগ কৌশল নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না,
পারবেনও না। বিদ্রোহী থিয়েটারই প্রগতিবাদী স্বাধীন থিয়েটারের যোগ্য
বংশধর। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আবেগ তাদের সহজাত। সার্বভৌম মুক্তির
ধ্যান সামনে রেখেই দেশে দেশে স্বাধীন থিয়েটারের দল কাজ ক'রে এসেছে,
এবং কাজ ক'রে চলেছে এবং তাদের চাহিদাতেই আজ দেশে দেশে একাঙ্ক
নাটিকার সোনার ফসল ফলছে। স্বাধীন এবং অপেশাদার থিয়েটারের ইতিহাস
উনবিংশ শতাব্দীর এবং বিংশ শতাব্দীর সমাজনৈতিক অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্বের
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করতে গেলেই দেখা যাবে—প্রগতিবাদী
ছোটগল্পের মতোই, একাঙ্ক নাটিকা নতুন জীবন-আদর্শের আলোকে রেখেই
জীবনকে দেখাতে চেষ্টা করছে—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গভীরতর চেতনাকে
ব্যক্ত করতে তথা শোষণ-শাসন-মুক্ত জীবনকে ধ্যান করবার চেষ্টা করছে।
বলাবাহুল্য সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার গভীরতর চেতনা বা স্বরূপকে ব্যক্ত
করতে গেলেই—socialistic or communistic propaganda এসে
যাবেই; পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার উপরে গণতন্ত্রের মুখোস-পরা
যে ছদ্মবেশী ধনতন্ত্র তার শোষণ-শাসনের জটিল নাগপাশ ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে
আছে, তার কুটিল চক্রান্তের ও শোষণ-শাসনের রূপগুলি তুলে ধরতেই
হবে—পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থার অবসান ঘটাবার জন্য, গণতন্ত্র
প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য, সমাজচিত্তে আবেগ সঞ্চার
করতেই হবে। "ফেডারেল থিয়েটার প্রোজেক্‌টে"র ব্যর্থতা, একদিকে যেমন
শাসকশ্রেণীর গণস্বার্থ-প্রতিকূল স্বার্থের কেন্দ্রটিকে, অন্যদিক তেমনি
প্রগতিশীল নাট্যকার এবং নাট্যসম্প্রদায়ের লক্ষ্য-গৃহটিকে আলোকিত করেছে।
প্রগতি বলতে আমরা যদি—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার একটি আদর্শ অবস্থার
দিকে এগিয়ে যাওয়া বুঝি এবং সেই আদর্শ অবস্থাটি যদি সমাজতন্ত্র বা
সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে সম্ভব না হয়, তাহলে এ কথা অবশ্যই মেনে নিতে
হবে যে প্রগতিশীল শিল্পীকে শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের বা সাম্যতন্ত্রের আদর্শে
অনুপ্রাণিত হতেই হবে। বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ এবং সাম্যবাদের যে

দ্বন্দ্ব চলেছে, সেই আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা থেকেই আধুনিক ছোটগল্পের এবং আধুনিক একাঙ্ক নাটিকার সৃষ্টি হচ্ছে। উন্নত সমাজচেতনা, ব্যক্তিস্বাধীনতার আবেগ, শ্রেণীগতভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার কামনা, সর্বতোভাবে আত্মপ্রকাশের বা আত্মবিকাশের আস্পৃহা, একাঙ্ক সৃষ্টির মূলে যেমন অন্যতম কারণ হিসাবে কাজ করেছে—তেমনি সামাজিক উৎসব হিসাবে নাট্যাভিনয়ের বিশেষতঃ একাঙ্ক নাটিকার বহু প্রচলন ও সমাদর, পাঠ্যতালিকায় একাঙ্কিকার স্থানলাভ, নাট্য-প্রতিযোগিতার ফলে নাট্যকারের ও অভিনেতার সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি, অর্থোপার্জনের অধিকতর সুযোগ—এই সমস্ত নানা কারণ, একাঙ্ক-নাটিকার চাহিদা বাড়িয়েছে। তবে আদিম যুগে যে কারণে স্থান-কাল-কার্য ঐক্যসম্পন্ন স্বল্পায়তন বৃত্তের নাটিকা রচিত হয়েছিল আধুনিক একাঙ্ক-নাটিকার রচনার মূলে কিন্তু ঠিক সেই কারণটি নেই। আদিমযুগের নাটকে যে স্বল্পায়তন বৃত্ত দেখা যায় তার গঠনের মূলে ছিল আদিম মনের স্বল্প অভিজ্ঞতা, অল্প ধারণা ও সংশ্লেষণী শক্তি এবং অল্প পরিকল্পনা শক্তি, আর আধুনিক একাঙ্ক নাটিকার স্বল্পায়তন বৃত্ত বহু ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংহত রূপ—অল্পের মধ্যে বহুকে সংশ্লিষ্টাকারে পরিকল্পিত করার চেষ্টা—পরিকল্পনা শক্তিকে অল্পপরিসরে প্রয়োগ করার কৌশল—এক কথায় শক্তি-দৈন্যের রূপ নয়—শক্তি-সংযমের ফল—অধিকতর সজ্ঞান চেষ্টার অর্থাৎ অতিনিয়ন্ত্রিত কল্পনাশক্তির ফল।

একাঙ্ক নাটিকার উপরে ঐতিহাসিক অবলোকন এইটুকুই যথেষ্ট। এবার একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপের আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। সংজ্ঞা নিরূপণের আসল সমস্যা—বস্তুর বা শ্রেণীর বৈশেষিক লক্ষণ অর্থাৎ যে লক্ষণটি বস্তুকে বা শ্রেণীকে সমজাতীয় বস্তু বা শ্রেণী থেকে পৃথক করেছে সেই লক্ষণটি নির্দেশ করা। আমরা জানি চারুশিল্পের মধ্যে 'কাব্য' অন্যতম এবং সেই কাব্য আবার শ্রব্য এবং দৃশ্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একাঙ্ক নাটিকা দৃশ্যকাব্যেরই বিশেষ এক প্রজাতি এবং অঙ্ক-সংখ্যার ভিত্তিতেই এই শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হয়েছে। অতএব একাঙ্ক নাটিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে আপাততঃ এ কথা বলা যেতে পারে—একাঙ্ক নাটিকা হচ্ছে সেই শ্রেণীর দৃশ্য কাব্য যার "কার্য" একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে এবং স্বল্পায়তনে উপস্থাপিত হয়। এই সংজ্ঞাটি মোটামুটিভাবে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তিদোষ মুক্ত। দ্ব্যঙ্ক, ত্র্যঙ্ক, চতুরঙ্ক এবং পঞ্চাঙ্ক নাটক থেকে একাঙ্কিকার পার্থক্য এখানেই যে একাঙ্কের কার্য একটিমাত্র অঙ্কের পরিসরে উপস্থাপিত হয়, অন্যদিকে একাঙ্ক বড় নাটক

অর্থাৎ বৃহদায়তন বৃত্তের পঞ্চাঙ্ক নাটককল্প নাটক থেকে একাঙ্ক নাটিকার পার্থক্য রয়েছে সেখানেই যেখানে একাঙ্কিকা স্বল্পায়তন বৃত্তের দৃশ্য কাব্য। একদিকে "একাঙ্কত্ব", অন্যদিকে "স্বল্পায়তনত্ব", একাঙ্কিকাকে পঞ্চাঙ্কাদি নাটক থেকে পৃথক করেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে একাঙ্কত্ব ও স্বল্পায়তনত্বই একাঙ্কিকার বৈশেষিক লক্ষণ।

প্রথমতঃ একাঙ্কত্বের তাৎপর্য বিচার করা যাক। একাঙ্কত্বের স্বরূপ আলোচনা করার গোড়াতেই একটি মূল বিষয় সম্বন্ধে আমাদের পরিচ্ছন্ন ধারণা রাখা দরকার। বিষয়টি এই যে—প্রত্যেক শিল্পসামগ্রী—তা' ছোটই হোক আর বড়ই হোক—একটি সমগ্র বা গোটা একটা পদার্থ—একক একটি ব্যক্তি—নানা অঙ্গের সমবায়ে গঠিত একটি অঙ্গী—ইংরেজিতে যাকে বলে "organic whole"। এককত্ব বা সমগ্রত্ব বা অঙ্গিত্ব প্রত্যেক শিল্পেরই অপরিহার্য লক্ষণ সুতরাং একাঙ্ক নাটিকারও বটে। অর্থাৎ একাঙ্ক নাটিকা স্বতন্ত্র শিল্পকর্মের মর্যাদা তখনই দাবী করতে পেরেছে যখন তার বৃত্ত হয়েছে 'organic whole' with a beginning, middle and end—এক কথায় স্বয়ংসম্পূর্ণ রসনিষ্পাদক ঘটনাতন্ত্র। এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার। এই সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত এই যে যেমন গোটা নাটকের বিচ্ছিন্ন কোন অঙ্ক অর্থাৎ বৃহৎ কোন কার্যের বিশেষ একটি পর্ব বা সন্ধিকে একাঙ্ক নাটিকার মর্যাদা দেওয়া চলবে না, তেমনি একটি অঙ্কের পরিসরে অসমন্বিত ঘটনার বিন্যাস করলেও একাঙ্ক নাটিকা রচনা করা হবে না। মনে রাখতেই হবে—একাঙ্ক নাটিকা নিজেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বৃত্ত—"ছোট" হলেও "সমগ্র" একটি কার্য। সমগ্রতা কাকে বলে, আগেই আভাসে বলা হয়েছে; এখানে সামান্য একটু বিস্তারে বলা যাক।

এ সম্পর্কে প্রাচীন—এবং প্রশংসনীয়—আলোচনা পাওয়া যায় এ্যারিষ্টটলের পোয়েটিকস্-গ্রন্থে এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। এ্যারিষ্টটল লিখেছেন—প্রত্যেক বৃত্তেই সম্পূর্ণ, সমগ্র এবং আয়তন-সম্পন্ন কার্য উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আয়তন-সম্পন্ন বলা হল এই কারণে যে এমন সমগ্রও (whole) সম্ভব যার আয়তন (magnitude) অতি নগণ্য। 'সমগ্র' বলা যায় তাকেই "which has a beginning, middle and an end"—যার আদি-মধ্য-অন্ত আছে। এই কথাগুলি বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত। 'আদি'র ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে লিখেছেন—"a beginning is that which does not itself follow anything by causal necessity, but after

which something naturally is or comes to be অর্থাৎ বৃত্তের আগু বা প্রারম্ভিক ঘটনা হবে এমন ঘটনা যা অন্য কোন পূর্বভাবী ঘটনার অনিবার্য পরিণতি বলে মনে হবে না, অর্থাৎ যা পূর্বভাবী কোন ঘটনার আকাঙ্ক্ষা জাগাবে না, কিন্তু পরবর্তী ঘটনার অনিবার্য কারণ রূপে কাজ করবে—পরবর্তী ঘটনার ও পরিণতির আকাঙ্ক্ষা জাগাবে। বৃত্তের মধ্যবর্তী সন্ধি বা ঘটনা হবে সেই ঘটনা যা পূর্ববর্তী ঘটনার কার্য এবং পরবর্তী ঘটনার কারণ ; অর্থাৎ মধ্য সন্ধিতে থাকবে এমন ঘটনা যা একাধারে পূর্ব-ঘটনাপেক্ষী এবং পরঘটনাভিমুখী। বর্তমানের মতোই তা' অতীতের পরিণতি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। আর অন্ত্য ঘটনা হবে—"that which itself naturally follows some other thing either by necessity or as a rule, but has nothing following it." অর্থাৎ এমন ঘটনা যা পূর্ববর্তী ঘটনার স্বাভাবিক পরিণতি বটে, কিন্তু যার পরে অন্য কোন ঘটনার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এ্যারিষ্টটলের সুস্পষ্ট নির্দেশ—সুগঠিত কোন বৃত্ত—"must neither begin nor end at haphazard but conform to these rules." এই নির্দেশের মর্ম এই যে ছোট বা বড় যেরূপ বৃত্তই হোক, তার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনা কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—'আরম্ভ' ও 'শেষ' কার্যকারণ নিয়মের সূত্রে আবদ্ধ। আরম্ভকে বলা যায় শেষের মূলকারণ বা সম্ভাবনা এবং শেষকে বলা যায় আরম্ভেরই স্বাভাবিক বা সম্ভাব্য পর্যবসান। নাট্যাচার্য ভরতও প্রত্যেক কার্যের পাঁচটি অবস্থা বা পর্যায়ের কথা বলেছেন এবং প্রারম্ভকে বীজস্থাপনার এবং উপসংহারকে ফল-প্রাপ্তির সঙ্গে তুলনা ক'রে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে বৃত্তের আরম্ভ বা উপসংহার বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয় ; বীজ যেমন ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়ে ফলে পরিণত হয়, তেমনি প্রারম্ভিক ঘটনাই ক্রমপরিণতির ভিতর দিয়ে উপ-সংহারে পর্যবসিত হয়। অন্যভাবে বললে বলা যায়—ফলাকাঙ্ক্ষাই যেমন বীজস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি বৃত্তের উপসংহারই প্রারম্ভকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে।

মোট কথা, প্রারম্ভ এবং উপসংহার যেখানে অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত, আদি-মধ্য-অন্ত যেখানে কার্যকারণ নিয়মসূত্রে আবদ্ধ সেখানেই ঘটনাপরম্পরা—সমগ্রতায় মণ্ডিত হয় এবং বৃত্তের মর্যাদা লাভ করে। এই সমগ্রতা, আগেই বলেছি, বড় ছোট সব বৃত্তের পক্ষেই অত্যাবশ্যক এবং তা রক্ষা করতে গেলে যা যা অবশ্য পালনীয়, একাঙ্ক নাটিকাকেও তা পালন করতে হবে অর্থাৎ একাঙ্ক

নাটিকাকেও exposition, progression, continuity প্রভৃতি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে গঠন-উৎকর্ষ অর্জন করতে হবে। এ সব বিষয়ে এবং নাটকীয়ত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে একাধিক অঙ্কের নাটকের সঙ্গে একাঙ্ক নাটিকার বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। অনেকাঙ্ক নাটকের এবং একাঙ্ক নাটিকার নাট্যকারের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা এই যে অনেকাঙ্ক নাটকের নাট্যকারকে বৃহদায়তন বৃত্তের বিস্তীর্ণ পরিসরে উল্লিখিত সমস্যার সমাধান করতে হয় আর একাঙ্ক-নাটিকার নাট্যকারকে স্বল্পায়তন বৃত্তের সংকীর্ণ পরিসরে সমস্ত কিছু সম্পাদন করতে হয়। অনেকাঙ্ক নাট্যের নাট্যকারকে যেমন premise এবং root-action নির্বাচন করতে হয়, একাঙ্ক নাটিকার নাট্যকারকেও তা করতে হয়। প্রথম জনের বৃত্তের বৃহৎ আয়তন যেমন তাঁর প্রতিপাদ্যের বিস্তার-সম্ভাবনার মধ্যেই নিহিত থাকে, শেষোক্তের বৃত্তের স্বল্প আয়তনও প্রতিপাদ্য বা উপস্থাপ্য বিষয়ের স্বল্প দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষতার উপরে নির্ভর করে। অনেকাঙ্ক নাট্যের কার্যের মধ্যে যেমন উপসংহার (ক্লাইম্যাক্স) অভিমুখী একটি আরোহণশীল ক্রমগতি থাকে, তেমনি একাঙ্ক নাটিকার স্বল্পকালব্যাপী কার্যেও আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত ক্রমপরিণতি এবং আরোহণ থাকা চাই। মোটকথা—অনেকাঙ্ক নাটক সমগ্রতার একটি বৃহৎ ক্ষেত্র এবং একাঙ্ক নাটিকা সমগ্রতার সংকীর্ণ একটি ক্ষেত্র—এই যা পার্থক্য।

এই কারণেই অর্থাৎ একাঙ্ক নাটিকা অতি স্বল্প দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ কার্যের উপস্থাপনা বলেই, একদেশে বা স্থানে, অত্যল্প কালের মধ্যে এবং অল্প পাত্রপাত্রী অবলম্বনে একটি "সমগ্র" কার্য বা বৃত্ত গড়ে তুলতে বিশেষ নির্মাণদক্ষতার আবশ্যক—আবশ্যক অতন্দ্র পরিমিতি-বোধ, আবশ্যক শব্দশক্তির উপরে—শব্দের অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা শক্তির উপরে অবাধ অধিকার, আবশ্যক বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে প্রতিফলিত করার দুর্লভ কৌশল—বিস্তৃত ঘটনাকে স্বল্প দেশ-কালে "compress" করার বা সংশ্লেষণের দক্ষতা।

এই প্রসঙ্গেই বিচার্য—একাঙ্ক নাটিকায় স্থান-ঐক্য এবং কাল-ঐক্য এবং ঐকান্তিক কার্য-ঐক্য অপরিহার্য কি না। প্রশ্নগুলি আরো সুনির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করলে বলতে হবে—একাঙ্ক-নাটিকার কার্যকে একটিমাত্র দৃশ্যে উপস্থাপিত করতে হবে কিনা, অভিনয়কালের সঙ্গে ঘটনার কালমাত্রা সমান হবে কিনা —আরম্ভ থেকে উপসংহার পর্যন্ত কালপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারা থাকবে কি না এবং বহু দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ কার্য একাঙ্কিকায় অবশ্য বর্জনীয় কিনা অর্থাৎ একদেশে ও স্বল্পকালে নিষ্পাদ্য এবং স্বল্পপাত্রসাপেক্ষ কার্যই একাঙ্ক নাটিকার

একমাত্র উপযোগী উপস্থাপ্য কিনা। বলা বাহুল্য, স্থান-ঐক্যের এবং কাল-ঐক্যের ঐকান্তিক রূপ শুধু সেখানেই সম্ভব যেখানে কার্যটি একান্ত ভাবেই সরল বা একক—যেখানে কার্যটি সম্পাদন করতে একাধিক দেশ এবং বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কালপর্ব কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। এ কথাও বাহুল্য—কার্যের নিষ্পত্তির জন্য যেখানে বহুদেশ, বহুকাল এবং বহুপাত্রপাত্রী অপেক্ষিত সেখানেই একাধিক অঙ্ক বা বহুদৃশ্য-বিভক্ত অঙ্কের পরিকল্পনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এখন, একাঙ্ক নাটিকার উদ্দেশ্য যদি হয় ছোটগল্পেরই মতো একান্তভাবে সরল ও একক ঘটনাকেই উপস্থাপনা করা, তাহলে একথা অবশ্যই স্বীকার্য হয়ে দাঁড়ায়, যে আদর্শ একাঙ্ক নাটিকা হবে সেই রচনাই যাতে স্থান-কাল-কার্য ঐক্যের নিখুঁত সমাবেশ ঘটবে।

অন্য যুক্তি থেকেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। আগেই বলা হয়েছে একাঙ্ক নাটিকা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্য—আদি-মধ্য-অন্ত-সমন্বিত একটি সমগ্র বৃত্ত। যেহেতু সমগ্র বা পরিণামপ্রদর্শক সেই হেতু জীবনের বিশেষ একটি রসনীয় পরিণামের মুহূর্তকেই একাঙ্ক রূপ দিতে বাধ্য; অর্থাৎ একাঙ্ক নাটিকায় দ্বন্দ্বের একটি অন্তিম মুহূর্তকেই (climax) উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়। অন্তিম মুহূর্তের ঘটনাটি বা পরিণাম মুহূর্ত—নিশ্চয়ই বহুদেশে-কালে পরিব্যাপ্ত হ'তে পারে না এবং তা পারে না বলেই একাঙ্ক নাটিকার ঘটনা ঐ অন্তিম মুহূর্তের দেশকাল-বিন্দু থেকে বেশী দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না—বহুদেশে এবং বহুকালে ব্যাপ্ত হতে পারে না। কত দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে ?—এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি—দেশকালের নিরন্তরতা বজায় রেখে যতটুকু ব্যাপ্ত হওয়া সম্ভব, একাঙ্ক নাটিকার কার্য শুধু ততটুকুই দেশে-কালে ব্যাপ্ত হ'তে পারে। সুতরাং দেশকালের নিরন্তরত্ব কি, একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলা দরকার। প্রথমতঃ দেশের "নিরন্তরতা" সম্বন্ধে দুএকটি কথা বলা যাক। স্থান-ঐক্য বলতে আমরা বুঝি—যে দৃশ্যে কার্যের আরম্ভ সেই একই দৃশ্যের সামনে বা মধ্যে কার্যের সমস্ত ঘটনা উপস্থাপনা করা—এক কথায় দৃশ্যসজ্জার কোন পরিবর্তন না ঘটানো। যে নাটকের সমস্ত ঘটনা একটিমাত্র স্থানে বা দৃশ্যেই ঘটে, সেই নাটককে আমরা 'স্থান-ঐক্য' বিশিষ্ট নাটকের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করে থাকি। তেমনি, যেখানে ঐ দৃশ্যটিকে যথাযথ এবং যথাস্থানে রেখেও, দৃশ্যটিকে অব্যবহিতভাবে নতুন দেশে সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়, দৃশ্যটির পরিসর বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়, সেখানেও (ঐ নতুন স্থান সমেত) দৃশ্যটিতে স্থান-

ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে যেখানে একটি বড় দরজা বা জানালা খুলে দিতেই, সম্মুখস্থ দৃশ্যটির অতি সংলগ্ন কোন কক্ষ বা বারান্দা বা উন্মুক্ত স্থানের কার্য দৃশ্য হয়ে উঠে তথা কার্যের উপস্থাপনা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে যায়, দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, সেখানেও মূল দৃশ্যের সঙ্গে নতুন দৃশ্যটি মিশে যাওয়ায়, অন্তর্ভুক্ত স্থানটুকুর ব্যবধান মুছে যায়—মূল দেশের সঙ্গে তা নিরন্তর যোগে যুক্ত হয়। একাধিক গ্রীকনাটকে আমরা এই ধরণের যৌগিক স্থান-ঐক্য লক্ষ্য করে থাকি। মনে রাখতে হবে—নিরন্তরতাই এইসব ক্ষেত্রে ঐকদেশিকতা অক্ষুণ্ণ রাখে। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে কার্যকে একাধিকস্থানে ব্যাপ্ত বলে মনে হ'লেও নিরন্তরতা থাকে বলে কার্যটি আসলে একটি দৃশ্যেরই অন্তর্গত বলে গৃহীত হয়। অতএব, মূল দৃশ্য থেকে কার্য যদি এমন স্থানে সরে যায় যে স্থান অসংলগ্ন এবং যা মূল দৃশ্যের দেশের সঙ্গে একযোগে দৃশ্য করা সম্ভব নয়, তাহলে কার্যের ঐকদেশিকতা বা স্থান-ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়—বিচ্ছিন্ন দেশে কার্য বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন দেশে বিশ্লিষ্ট যে কার্য, তা' যত ছোটই হোক—তা' খাঁটি একাঙ্ক নাটিকার উপযোগী নয়। একাঙ্ক নাটিকার কার্য একান্ত সরল ও সংক্ষিপ্ত বলে একদেশে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং স্বল্পকালব্যাপী ঘটনাকে বহুদেশে ছড়িয়ে দিয়ে যে সব নাটিকা লেখা হয়, তাকে আর যে নামই দেওয়া যাক আদর্শ একাঙ্ক বলা চলে না। আকৃতিতে একাঙ্ক নাটিকার মতো দেখতে হলেও প্রকৃতিতে তারা ভিন্ন জাতি। অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে—যেখানে কোন একটি বাস্তব দৃশ্যকে ভিত্তি ক'রে একাধিক স্বপ্ন-দৃশ্য বা জাগ্রৎ স্বপ্নের দৃশ্য উপস্থাপনা করা হয়, সেখানে ঐকদেশিকত্ব ক্ষুণ্ণ হবে কি? Cicely Hamilton-এর লেখা "The Child in Flanders"—A Nativity play in a prologue, Five Tableaux and epilogue—এই নাটিকাকে আমরা খাঁটি একাঙ্কিকা বলতে পারি কি? এই নাটিকার প্রোলোগের এবং এপিলোগের কার্য একটি কুটীরের দৃশ্যে উপস্থাপিত হয়েছে বটে কিন্তু পাঁচটি ছায়া-দৃশ্যের স্থান—ভিন্ন ভিন্ন দেশ; সুতরাং ঐকদেশিকত্ব কোথায়? আশা করি, যৌগিক স্থান-ঐক্য সম্বন্ধে আগে যে আলোচনা করা হয়েছে, সেই আলোচনা থেকেই উত্তর পাওয়া যাবে। সেখানে এই কথাই বলা হয়েছে যে মূল দৃশ্যের সঙ্গে নিরন্তর যোগে বা অব্যবহিতভাবে যুক্ত যে স্থান, তা' দৃশ্য করলে স্থান-ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয় না। সেই আলোচনার সঙ্গে এখানে এইটুকু যোগ করা যাক যে একদেশে অবস্থিত কোন ব্যক্তির স্বপ্নকে দর্শকের প্রত্যক্ষগোচর করবার জন্য যেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের দৃশ্য পরিকল্পিত হয়, সেখানে বাহ্যতঃ বহুদেশিকতা

থাকলেও, কার্যকে মূলতঃ ঐকদেশিক বলেই গণ্য করা উচিত। কেবল এই সূত্রানুসারেই আমরা উল্লিখিত নাটিকাটিকে (অবশ্য কাল-ঐক্য বজায় থাকলে) একাঙ্কের পংক্তিতে স্থান দিতে পারি। বাস্তবিক প্রকৃত বহুদেশিকতা বলতে যা বুঝায় এখানে তা' নেই—মূল কার্য বহুদেশে বিন্যস্ত হয়নি। স্থান-ঐক্য একাঙ্ক নাটিকার পক্ষে কত অপরিহার্য—বিভিন্ন একাঙ্ক নাটিকা সংকলন গ্রন্থগুলিতে যে সব একাঙ্ক নাটিকা স্থান পেয়েছে তাদের গঠনবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেই তা' বুঝতে পারা যায়। এমন কি যে সব নাটকে কাল-ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে সেখানেও স্থান-ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। W. W. Jacob রচিত গল্পের Louis. Parker-কৃত নাট্যরূপ "The Monkey's Paw"—(A story in three scenes) নাটিকার ঘটনা একটি স্থানেই ঘটেছে কিন্তু কার্যের কাল—একরাত্রি-একদিন পার হয়ে আর একরাত্রি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। এই নাটিকায় তিনটি দৃশ্য তিনটি স্থানে স্থাপিত দৃশ্য নয়, তিনটি বিচ্ছিন্ন কালে উপস্থাপিত দৃশ্য। এই নাটকে যে কার্যটি উপস্থাপিত হয়েছে তার মোট কাল পরিমাণ এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা নয়, কার্যটি বহু ঘণ্টাসাপেক্ষ অর্থাৎ তার আরম্ভ ও উপসংহারের মধ্যে অনেক ঘণ্টার ব্যবধান চাই। সুতরাং এ প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে—তবে কি একাঙ্ক নাটিকার কার্যকে 'এককালীন ঘটনা' হতে হবে না? একাঙ্ক নাটিকায় স্থান-ঐক্য বজায় রেখে একাধিক দিনব্যাপী বিচ্ছিন্নকালের ঘটনাবলীও উপস্থাপিত করা চলে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমরা আর একবার একাঙ্কনাটিকার আদর্শ রূপটি ধ্যান করে নিতে পারি। আগেই বলেছি একাঙ্কিকার আদর্শ রূপটি—দেশ-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং কার্য-ঐক্য—এই তিন ঐক্যের এক ঐকান্তিক সমন্বয়ের ফল। বহুদেশে বা দীর্ঘ ও বিচ্ছিন্নকালে বা বহুশাখায় ব্যাপ্ত হওয়ার প্রবণতা অবশ্যই আদর্শ সমন্বয়ের পরিপন্থী না হয়ে পারে না। এই দিক থেকে বিচার করলে কার্যের একাধিক দেশে ছড়িয়ে পড়া অথবা দীর্ঘকালে বা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কালপর্বে বিভক্ত হওয়া অথবা বহু মুখে শাখায়িত হওয়া ত্রুটি বলেই গণ্য করতে হবে। দেশ-কাল-কার্য ঐক্যের যে আদর্শ সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, তা' যে কল্পনামাত্র নয়, মহাকবি ভাসের লেখা সংস্কৃত একাঙ্ক নাটিকাগুলি (পৃথিবীর প্রাচীনতম একাঙ্ক নাটিকা) এবং বিভিন্ন দেশের খাঁটি একাঙ্কিকাগুলি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে। মহাকবি ভাস তাঁর নাটিকাগুলিতে একটিমাত্র ঘটনাকে একটিমাত্র দৃশ্যে এবং একটিমাত্র কাল-পর্বে এবং অবিচ্ছিন্ন কালধারায় উপস্থাপিত করে আদর্শ সমন্বয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। লেডি গ্রেগরী রচিত

"Rising of the Moon"-জাতীয় একাঙ্ক নাটিকাগুলিতেও আমরা ঐরূপ
আদর্শ সমন্বয় দেখতে পাই। অবশ্য সব নাট্যকারের সব নাটিকাতে ঐরূপ
সমন্বয় পাওয়া যায় না। কোনটিতে একাধিক দেশের প্রবণতা কোনটিতে
বা একাধিক কালের প্রবণতা এসেছে এবং আদর্শ সমন্বয় ব্যাহত করে দিয়েছে।
"Rising of the Moon", J. M. Synge-রচিত "Riders to the Sea"
এবং W. W. Jacob-এর "Monkey's Paw"—এই তিনটি একাঙ্কিকাকে
পাশাপাশি রেখে দেখলেই—আদর্শ সমন্বয় কি এবং কি কি ভাবে তা' ব্যাহত
হতে পারে তা পরিষ্কার বুঝা যাবে। "Rising of the Moon" নাটিকায় যে
ঘটনাটি ঘটেছে তা যেমন একক তেমনি আদ্যন্ত দেশে-কালে অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ
কার্যের মধ্যে দেশগত বা কালগত কোন বিচ্ছেদ ঘটেনি। দ্বিতীয়তঃ "Riders
to the Sea" নাটিকায় দেখা যায়—স্থান-ঐক্য থাকলেও ঘটনার কালমাত্রা এবং
উপস্থাপনার কালমাত্রার মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি ঘটতে পারেনি। পারেনি তার
কারণ, ছোট ছেলের মেলায় যাওয়া—ঘোড়া থেকে সাগরের মধ্যে পড়ে ডুবে
মরা—মৃত দেহকে দেখা—উদ্ধার করে নিয়ে আসা—এতগুলি ঘটনা নিশ্চয়ই
দীর্ঘকাল সাপেক্ষ ; অন্ততঃ মা ও কন্যাদ্বয়ের কথোপকথনে যেটুকু সময় অতি-
বাহিত হয়েছে, সেই সময়ের মধ্যে অতগুলি ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। সুতরাং
এ কথা বলতেই হবে যে নাট্যকার দৃশ্যটিকে এক রেখেছেন বটে কিন্তু তা
রাখতে যেয়ে ঘটনার কাল এবং উপস্থাপনার কালের মধ্যে সঙ্গতি সৃষ্টি করতে
পারেন নি। ঐ দু'টি কালকে সমান করতে হলে যা করা দরকার তা' করতে
পারেন নি। ঘটনার স্বাভাবিক কালব্যাপ্তিকে অভিনয়ের সংকীর্ণ কালের
মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় রাখতে যেয়েই নাট্যকার এই অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন তথা
সমন্বয়হানি ঘটিয়েছেন। তারপর "Monkey's Paw" নাটিকায়—ত্রিপর্বিক
ঘটনাকে তিন কালপর্বে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা
হয়েছে ; ফলে আদর্শ সমন্বয়ের রূপটি ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। কারণ শুধু দৈশিক
অবিচ্ছেদ থাকাই যথেষ্ট নয়, আদর্শ সমন্বয়ের জন্য কালিক অবিচ্ছেদও
চাই। সুতরাং "Monkey's Paw"কে একাঙ্ক নাটিকার মর্যাদা দিতে গেলে,
একাঙ্কিকার সংজ্ঞাটিকে ব্যাপকতর করেই তা' দিতে হবে—উক্ত নাটিকাখানিকে
একাঙ্কিকা বলে স্বীকার করলে, সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই মেনে নিতে হবে যে
দৃশ্যসজ্জা ঠিক রেখে একাধিক দিনব্যাপী ঘটনা বা কার্যকে বিচ্ছিন্ন কালপর্বে
ভাগ ক'রে ক'রে উপস্থাপিত করলেও একাঙ্কিকা রচনা করা হবে এবং শেষ
পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে হবে যে—একাঙ্কিকা নামতঃ একাঙ্ক অর্থাৎ

একদৃশ্য বিশিষ্ট হলেও, একাধিক দেশে একাধিককালেও একাঙ্কিকার কার্য ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং তা পারে শুধু এই একটিমাত্র সর্তেই যে তাকে স্বল্প-কালের মধ্যে অভিনেয় হতে হবে। অর্থাৎ স্থান-ঐক্যের, কাল-ঐক্যের এবং কার্য-ঐক্যের সর্ত একান্তভাবে না মেনেও একাঙ্কিকা লেখা চলে এবং একাঙ্কিকার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য স্থান-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং কার্য-ঐক্যের আদর্শ সমন্বয় নয়, বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য—স্বল্পকালে-অভিনেয়ত্ব। এই হিসাবে একাঙ্কিকার সংজ্ঞা দাঁড়াবে—স্বল্পকালে অভিনেয় রসনীয় রচনামাত্রই একাঙ্কিকা এবং নাটিকার সঙ্গে একাঙ্কিকার মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই; পার্থক্য যেটুকু ঘটেছে—সে শুধু আকৃতিগত বা আয়তনগত এবং তার আসল কারণ অভিনয়কালের পরিমাণ। আর্চার যেমন নাটকীয়ত্বের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে লিখেছিলেন—"The only valid definition of the dramatic is any representation of imaginary personages which is capable of interesting an average audience assembled in a theatre" আমরাও কি হাল ছেড়ে দিয়ে তেমনি বলব—যে নাটিকা অল্প সময়ে অভিনেয় এবং যা দর্শকচিত্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম তার নামই একাঙ্কিকা?

নিশ্চয়ই সংজ্ঞাটিকে এত ব্যাপক করতে দেওয়া (নাট্যকারদের দুর্বলতাকে এতখানি মার্জনা করে নেওয়া তথা প্রশ্রয় দেওয়া) সমীচীন হবে না। অতএব দেশকালের অবিচ্ছেদ বা ঐক্যকে এবং কার্যের ঐকান্তিক এককত্বকে আমরা আদর্শ একাঙ্কিকার অপরিহার্য লক্ষণ বলেই স্বীকার করব এবং যে যে স্থলে উল্লিখিত আদর্শ সমন্বয়ের হানি ঘটবে সেই সেই স্থলকে ত্রুটি বলেই গণ্য করব। আগেই বলেছি কার্য যেখানে একান্তভাবে একক সেখানে ঐকদেশিকতা এবং ঐককালিকতা অবশ্যম্ভাবী এবং যে কার্যের মধ্যে বহুদেশপ্রবণতা বা বহুকালপ্রবণতা থাকে সেই কার্য ঠিক একান্তভাবে একক নয়—সেই কার্য অনেকাঙ্ক নাটকেই উপস্থাপ্য। অতএব, আমরা যদি এ কথাও স্বীকার করি যে একাঙ্কিকার বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপ্য বিষয়ের বা কার্যের ঐকান্তিক এককত্ব, তা' হলেও দেখা যাবে—স্থান-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং কার্য-ঐক্যের আদর্শ সমন্বয়ের মধ্যেই একাঙ্কিকার বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে।

এ পর্যন্ত একাঙ্কিকার উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, আশা করি তা' থেকে একাঙ্কিকার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে এবং নাট্যসাহিত্যে একাঙ্কিকার স্থান নির্দেশে পাঠকবর্গ যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। আশা পূর্ণ হলে সকলেরই আনন্দ হয়, আমিও সেই সকলের একজন।

বাংলা একাঙ্ক নাটকের ধারা

অজিতকুমার ঘোষ

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থের নাটক নির্বাচন করতে গিয়ে একাঙ্ক নাটকের
আঙ্গিকের দিকে একটু কঠোর দৃষ্টি রেখেছি, এবং সেজন্য রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির
বিড়ম্বনা ছাড়া একাধিক দৃশ্যসম্বলিত কোনো নাটকই আমরা গ্রহণ করিনি।
এখানে অনেকেই আপত্তি তুলে বলতে পারেন যে, একাধিক দৃশ্যের অনেক
একাঙ্ক নাটকই তো বিশ্বনাট্যসাহিত্যে স্থান পেয়েছে। বিষয়টি একটু
বিচার ক'রে দেখা দরকার। একের অধিক দৃশ্য থাকা সত্ত্বেও যে একাঙ্ক
নাটকগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে তাদের আমরা দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।
প্রথম শ্রেণীতে ফেলতে পারি সেই নাটকগুলিকে যাদের মধ্যে শুধু দৃশ্যের
বহুলত্ব নয়, দৃশ্যসজ্জারও বৈচিত্র্য রয়েছে। সেজন্য এই প্রকার নাটকগুলিতে
নাট্যপ্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা যে শুধু ক্ষুণ্ণ হয় তা নয়, নাট্যঘটনার ঐক্য ও
অখণ্ডতাও অনেক পরিমাণে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। দৃশ্যের বিভিন্নতা
সত্ত্বেও একটি ভাবগত পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলেই
এই ধরনের নাটককে সার্থক একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা চলে। শুধুমাত্র
শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার দ্বারাই তা' সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ
রসোত্তীর্ণ নাটকরূপে মেটারলিঙ্কের A Miracle of Saint Antony ও
গলসওয়ার্দির The Little Man নামক একাঙ্ক নাটকের উল্লেখ করা যায়।

একাধিক দৃশ্যের একাঙ্কগুলির দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা সেই নাটকগুলিকে
অন্তর্ভুক্ত করতে পারি যাদের মধ্যে দৃশ্যসংখ্যা একের অধিক হলেও দৃশ্যসজ্জা
কিন্তু বিচিত্র নয়। একই দৃশ্যসজ্জার ফলে নাটকের ভাবপরিমণ্ডল খণ্ডিত
হয় না এবং সেজন্যই এই শ্রেণীর নাটকে একাঙ্ক নাটকের ধর্ম বজায় রাখা
সহজ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এই শ্রেণীর নাটকে পর্দা ফেলে দৃশ্যের
যে বহুলত্ব সৃষ্টি করা হয় তার মধ্য দিয়ে সময়ের অতিক্রান্তিই বোঝাবার
চেষ্টা হয়। তবে সময়ের অতিক্রান্তি খুব বেশি হ'য়ে গেলে নাট্যঘটনার

ভাগবত ঐক্য নষ্ট হয় এবং একাঙ্ক নাটকের মৌল ধর্মও তাতে ব্যাহত হয়। আনাতোল ফ্রান্সের The Man Who Married a Dumb Wife, ড্রিঙ্ক ওয়াটারের x=o : A Night of the Trojan War, জেকবসের The Monkey's Paw প্রভৃতি প্রসিদ্ধ একাঙ্ক নাটকগুলিকে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে।

উপরিউক্ত একাধিক দৃশ্যসমন্বিত একাঙ্ক নাটকগুলির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বাংলা সাহিত্যের অনেকগুলি নাটকই আমরা একটু সাহস দেখিয়ে একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। গিরিশচন্দ্রের কোনো কোনো পঞ্চরং জাতীয় নাটক ও অমৃতলালের কয়েকখানি প্রহসনকেও আমরা একাঙ্ক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকটির মধ্যে তিনটি দৃশ্য থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যসজ্জার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং নাটকটির আয়তন ছোট, এবং এতে ঘটনার বৈচিত্র্য ও চরিত্রের জটিল বাহুলত্বও নেই। সেজন্য এই নাটকটিকেও একটু উদার ভাবে দেখতে গেলে একাঙ্ক নাটক বলে অভিহিত করা চলে।

কিন্তু একাঙ্ক নাটকের সীমানা একটু কঠিন ভাবে বেঁধে না দিলে এই নাটকের আঙ্গিক সম্বন্ধে শিথিলতা ও স্বেচ্ছাচার দেখা যেতে পারে। বস্তুত একাঙ্ক নাটকের বিভিন্ন রূপ থাকবার ফলে পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটকের সুস্পষ্ট ভেদরেখা সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন থাকেন না। রবীন্দ্রনাথের মালিনী নাটকে চারটি মাত্র দৃশ্য রয়েছে, কিন্তু নাটকটিকে কখনো একাঙ্ক নাটকের শ্রেণীতে ফেলা যায় না, কারণ এই নাটকে ঘটনার জটিলতা ও ব্যাপ্তি ও চরিত্র বৈচিত্র্য একাঙ্ক নাটকের ধর্মকে অস্বীকার করেছে। আবার মুক্তধারা ও রক্তকরবী নাটকের মধ্যে শুধুমাত্র একটি অঙ্ক থাকলেও এই নাটক দুটিকে কখনই একাঙ্ক নাটক বলা চলে না। কারণ একটি অঙ্ক থাকলেও এদের মধ্যে কাহিনীর যে বহুবিস্তৃত গতি ও বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে যে বহুধা ভাববৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে সেগুলি একাঙ্ক নাটকের আদর্শ গুরুতররূপে লঙ্ঘন করেছে। বুঝতে পারা যাচ্ছে ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা,—এগুলিই একাঙ্ক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ। একাধিক দৃশ্য ও দৃশ্যসজ্জার মধ্যে এই লক্ষণগুলি মাঝে মাঝে দেখা গেলেও একটি মাত্র দৃশ্যের মধ্যে এই লক্ষণগুলি সবচেয়ে সার্থক ভাবে ধরা পড়ে। সেজন্য একটি মাত্র দৃশ্যসম্বলিত নাটককেই আমরা আদর্শ একাঙ্ক নাটক বলে গ্রহণ করেছি এবং সেই আদর্শ সম্মুখে রেখেই আমরা নাটক নির্বাচন করেছি।

যে নাটকগুলি এই সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাদের সম্বন্ধে একটু কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের নাটিকা নিয়েই এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে, তার কারণ রবীন্দ্রনাথের আগে বাংলা সাহিত্যে সার্থক একাঙ্কিকা খুব বেশি লেখা হয়নি। তবে একেবারেই লেখা হয়নি তা নয়। অমৃতলাল বসুর চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে বিদেশী নাটকের দ্বারা প্রভাবান্বিত একটি নিখুঁত একাঙ্ক নাটকরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। অমৃতলালের আরো কয়েকটি নাটকের মধ্যে যে একাঙ্ক নাটকের কিছু কিছু লক্ষণ রয়েছে তা তো পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আরো দু'একখানি একাঙ্ক নাটকের কথাও উল্লেখ করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের পুনর্জন্ম একখানি সার্থক শিল্পরসোত্তীর্ণ একাঙ্ক নাটক। এই সংকলনের মধ্যে নাটকখানি অন্তর্ভুক্ত হয়নি ব'লে আমরা ত্রুটি স্বীকার করছি। রবীন্দ্রনাথের এক অঙ্কবিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার নাট্যকাব্যগুলি, যথা বিদায়-অভিশাপ, কর্ণ-কুন্তীসংবাদ, গান্ধারীর আবেদন প্রভৃতির কথাও এ-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হয়। হারমন আউল্ড Theatre and Stage নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে একাঙ্ক নাটকের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তাতে কাব্যনাট্যের (Poetic Play) একটি বিশিষ্ট শ্রেণী নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপরি-উক্ত নাট্যকাব্যগুলি একাঙ্ক নাটকের নিয়মকানুনগুলি অনুসরণ করলেও তাদের মধ্যে কাব্যের ভাগ এত বেশি যে নাটক বলে তাদের গ্রহণ করতেই দ্বিধা বোধ হয়। নাটকের মধ্যে ঘটনার গতি, উত্তেজনা সৃষ্টিকারী অবস্থাবিপর্যয় ও শ্বাসরোধকারী উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে হয় সেগুলি উপরিউক্ত নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। সেজন্য নাটক না বলে তাদের নাট্যলক্ষণাক্রান্ত কাব্য বলাই বোধ হয় অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিকতম কাল পর্যন্ত প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাবান নাট্যকারের একাঙ্ক নাটক এই সংকলন-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তবে স্বীকার করছি দু'একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকারের নাটক আমাদের তালিকাভুক্ত করতে পারলাম না। এবং সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। শুধু কেবল আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে এটুকু ব'লতে পারি যে এ-ত্রুটি আমাদের ইচ্ছাকৃত নয়। আমাদের সংকলন-গ্রন্থ-বহির্ভূত স্বল্পখ্যাত অথচ শক্তিমান কয়েকজন উদীয়মান নাট্যকারের কথাও এখানে স্মরণ করছি। ভবিষ্যতে 'একাঙ্ক সঞ্চয়নের' দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁদের নাটক অন্তর্ভুক্ত করবার ইচ্ছা রইল।

একাঙ্ক নাটকের বিষয় ও রসের অজস্র বৈচিত্র্য দেখা যায়। সেই বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা সংকলিত নাটকগুলি নির্বাচন করেছি। সেজন্য এই

গ্রন্থে ঐতিহাসিক পরিবেশ ও আধুনিক পরিবেশ, উদ্ভট কল্পনানির্ভরতা ও কঠোর বাস্তবধর্মিতা এবং করুণ ও গম্ভীর রসের সঙ্গে কৌতুক ও তরল রস সবকিছুই স্থান পেয়েছে। আমাদের নির্বাচিত নাটকগুলি তাদের রচয়িতাদের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা সে-সম্বন্ধে হয়তো বিতর্ক উঠতে পারে, কিন্তু নাট্যকারদের মানসধর্ম ও বিশিষ্ট রসপ্রবণতার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাটক নির্বাচন করবার চেষ্টা করেছি।

একাঙ্ক নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নামই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা উচিত। একাঙ্ক নাটকের আঙ্গিকের দিকে সচেতন দৃষ্টি রেখে তিনি নাটক রচনা করেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর অনেকগুলি নাটকের মধ্যেই একাঙ্ক নাটকের শিল্পধর্ম পরিস্ফুট হয়েছে। হাস্যকৌতুকের কয়েকটি নাটিকা, ব্যঙ্গকৌতুকের স্বর্গীয় প্রহসন ও বিনিপয়সার ভোজ নামক অদ্বিতীয় আত্মলাপী একাঙ্কিকা এবং রথের রশি প্রভৃতি নাটকগুলি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। **খ্যাতির বিড়ম্বনা** বোধ হয় হাস্যকৌতুকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় একাঙ্ক নাটক। নাটকটির মধ্যে দু'টি দৃশ্য আছে কিন্তু দৃশ্যসজ্জার কোনো পরিবর্তন নেই। সময়ের ব্যবধান বোঝাবার জন্যই নাটকটিকে দুটি দৃশ্যে খণ্ডিত করা হয়েছে, কিন্তু একাঙ্ক নাটকের অবিচ্ছিন্ন গতি ও ভাবগত ঐক্য এতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রথম দৃশ্যটিকে Exposition বলা যেতে পারে। মূল নাট্যঘটনাটি দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘটেছে। একটির পর একটি লোকের আগমনের মধ্য দিয়ে ঘটনা ক্রমোচ্চ গতি লাভ ক'রে, গায়ক ও বাদকদের উদ্দণ্ড তাণ্ডবের মধ্যে climax-এ পৌঁছেছে। কৃপণ ও অনুদার লোকের জব্দ হওয়ার কাহিনী নিয়ে মলিয়ের থেকে আরম্ভ করে বহু নাট্যকারই নাটক রচনা করেছেন। আলোচ্য নাটকেও দুকড়ি দত্তের কৃপণতা ও অনুদারতার জন্য তার প্রতি শাস্তিবিধান করা হয়েছে বটে, কিন্তু শাস্তিবিধানের কঠোরতা উদ্দাম কৌতুকরসের উচ্ছ্বসিত প্রাবল্যে ভেসে গিয়েছে।

খ্যাতির বিড়ম্বনায় জীবনের যে দিকটি আমরা দেখলাম, ঠিক তার বিপরীত দিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল **রাজধানীর রাস্তায়** নামক নাটিকায়। বর্তমান কালের প্রবীণতম নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত এই নাটিকাটির মধ্যে মন্বন্তরের একটি কালো বিভীষিকার চিত্র তুলে ধরেছেন। যুদ্ধের রাত ছিল তখন কালিমাকুটিল। সেই রাতের মধ্যে মানুষের জান্তবরূপ সর্বপ্রকার হিংস্রতা নিয়ে বেরিয়ে আসত। নাটিকাটির মধ্যে মানুষের সেই

রূপটি অতি বাস্তবভাবে চিত্রিত হয়েছে। ক্ষুধার অন্ন যখন দুর্লভ হয় তখন মানুষ যে কিরকম স্বার্থপর ও নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে তার পরিচয় পাওয়া যায় নাটিকাটির মধ্যে। কিন্তু তবুও সাধারণ বঞ্চিত মানুষ মনুষ্যত্ব একেবারে হারাতে পারে না। যে হারাধনকে বিলাসী চাল নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার সময় ইঁট দিয়ে মেরেছে সে-ই আবার হারাধন ও মোহিনীর পক্ষ হয়ে মনোহরের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং পরিশেষে হারাধনের সঙ্গে সে একই মৃত্যুময় পরিণাম বরণ ক'রে নিয়েছে নাটিকাটির মধ্যে প্রবল ধনিকের লোভ ও সরকারী খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রতি শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু নাট্যকারকে চালিত করেছে তাঁর সুগভীর সহানুভূতি। এই সহানুভূতি তাদের প্রতি যারা ক্ষুধার তাড়নায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করলেও সর্বরিক্ততার মধ্যে এক পারস্পরিক ঐক্য বোধ করে, প্রভাতের সূর্য যাদের কাছে জীবনের আলো না এনে মৃত্যুর অন্ধকারই নিয়ে আসে।

দেবী নাটিকাটির স্থান ও পরিবেশে অভিনবত্ব থাকলেও মূল সমস্যাটি কিন্তু একই—সেই অভাবগ্রস্ত মানুষের বাঁচবার আশায় মৃত্যুবরণ। শুধু কেবল দুটি টাকার আশায় বাউরী মেয়ে শুখনি বাঘের ভয় উপেক্ষা ক'রে গভীর অন্ধকারে সাহেবদের ডাকবাংলোয় এসেছে, অবুঝ ছেলেদুটিকে খেতে দিতে হবে, অশান্ত বুড়িটির ক্ষুধাকেও শান্ত করতে হবে, তাই না এসে তার উপায় নেই। দুটো টাকা হাতে যখন পেল, তখন তার মনে অনেক আশা, কয়েকটি প্রাণীকে পেট ভ'রে খেতে দেবার অনেক স্বপ্ন! কিন্তু সব আশা আর স্বপ্ন এক নিমেষেই ফুরিয়ে গেল। টাটকা রক্তের সিঁদূরে টাকা দুটি লাল হ'য়ে উঠল। বাউরী মেয়ে হ'য়ে উঠল দেবী—স্নেহ মমতায়, নির্ভীক প্রয়াসে ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে। নাটিকাটির নাট্যরস জমে উঠেছে রহস্যময় পরিবেশের রসসৃষ্টিতে। নিবিড় রাত, বিজন ডাকবাংলো, বাঘের ভয়ে থমথমে আরণ্য প্রকৃতি, জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি—এই পরিবেশে একদিকে বাঘিনীয় আবির্ভাব-প্রত্যাশায় এক আতঙ্করোমাঞ্চ, অন্যদিকে এক উদ্ধত যৌবনচঞ্চলা নারীর মোহমদির আকর্ষণ। এই ভয় ও মোহ দুই বিচিত্র রসের প্রভাব নাট্যঘটনাটির মধ্যে জাগিয়ে তুলে নাট্যকার এক বাস্তব অর্থনৈতিক সমস্যার দিকে ঘটনাটিকে টেনে নিয়ে গেলেন। এরই ফলে নাটকের মধ্যে এক সুতীব্র কৌতূহল সতত জাগ্রত থাকে, এবং আকস্মিক ভাবে আমাদের প্রত্যাশাকে খণ্ডিত করে এক পরিবেশবিচ্ছিন্ন বাস্তব সমস্যার দিকে ঘটনাটির পরিণতি ঘটানোর ফলে নাট্যরসও ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে।

বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটক রচনাতেও তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন তার পরিচয় আমরা তাঁর কালিন্দী, দুই পুরুষ, পথের ডাক প্রভৃতি নাটকের মধ্যে পেয়েছি। একাঙ্ক নাটক তিনি বেশি লেখেন নি, কিন্তু এ-ধরনের নাটক রচনাতেও যে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত তা এই গ্রন্থে সংকলিত নাটকটি পড়লে বুঝতে পারা যাবে। বর্তমান ঘটনার সঙ্গে অতীত ঘটনার যোগ স্থাপন ক'রে তিনি সুতীব্র নাট্যকৌতূহল জাগিয়ে তুলেছেন এবং পরিশেষে এক অজ্ঞাত রহস্যের আকস্মিক আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এক অপ্রত্যাশিত করুণ পরিণতিতে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। নাটকটির ঘটনা বৈষ্ণব পরিবেশকে আশ্রয় করেছে। বাংলার একান্ত নিজস্ব রসভক্তির এই পরিবেশটি তারাশঙ্করের হাতে এক অপূর্ব বাস্তব ও সরসরূপ লাভ করেছে। রাধা উপন্যাসে এই বৈষ্ণব রসজগতের সার্থকতম রূপটি আমরা পেয়েছি। **বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা** নামক নাটিকাটির মধ্যে একদিকে কৃষ্ণপদে নিবেদিতপ্রাণা এক নারীর দেহবিক্রয় ক'রে নিজের বিগ্রহকে রক্ষা করবার প্রচেষ্টা যেমন লোকনীতি-বহির্ভূত এক অভিনব মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে, তেমনি এক কুৎসিতদর্শন, কামনালোলুপ বৈষ্ণবের প্রতারিত কামপরিতৃপ্তির সুকরুণ পরিণতিও গভীর সমবেদনার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। যে কঠিনচিত্ত গোবিন্দদাস দীর্ঘদিনের চেষ্টার ফলে কৃষ্ণদাসের আখড়াটি দখল ক'রে কৃষ্ণভামিনীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই আবার ভামিনীর কাছে পরাজয় স্বীকার করে কলঙ্কিনীর দহে আত্মবিসর্জন দিয়েছে, এখানেই তো চরম নাটকীয়তা। মানুষের উদ্ধত জয় দেখতে দেখতে পরাজয়ের ধূলায় লুটিয়ে পড়ে আবার কোথাও কোথাও পরাজয়ের কালিমাও জয়ের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে, নাটিকাটির মধ্যে এই সত্যই পুনরায় আমরা দেখতে পেলাম।

বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়ই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম শিল্পসম্মত একাঙ্ক নাটকের ধারা প্রবর্তন করেন। শুধু প্রবর্তয়িতা নন, তিনিই একাঙ্ক নাটকের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা। সাঁইত্রিশ বছর আগে তিনি একাঙ্ক নাটক রচনা শুরু করেছিলেন এবং এই দীর্ঘকাল ধ'রে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে বিচিত্র আঙ্গিকে বহু একাঙ্কিকা রচনা ক'রে চলেছেন। একাঙ্কিকা, নব একাঙ্ক ও ফকিরের পাথর এই তিনখানি সংকলন-গ্রন্থে তাঁর একাঙ্ক নাটকগুলি সংকলিত হয়েছে। ১৯২৫ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত একাঙ্ক নাটক রচনার প্রাথমিক পর্বে যে নাটকগুলি তিনি লিখেছিলেন সেগুলির অধিকাংশই প্রাচীন ঐতিহাসিক

পরিবেশে রচিত। একাঙ্ক নাটকরূপে এই নাটকগুলিই তাঁর উৎকৃষ্টতম রচনা। রাজপুরী, বিদ্যুৎপর্ণা, লক্ষহীরা, অরূপরতন, মাতৃমূর্তি প্রভৃতি নাটকগুলি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্বের পর তিনি সামাজিক বিষয় অবলম্বনেই তাঁর অধিকাংশ একাঙ্কিকা রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর যৌবনের রচনাগুলির মধ্যে হৃদয়াবেগের যে প্রবল ঘাতপ্রতিঘাত দেখা যায় পরিণত বয়সে তার পরিবর্তে তিনি সমাজের নানা জটিল সমস্যার অবতারণা করেছেন। প্রথম যুগের নাটিকাগুলিতে বাসনাকামনার সুগভীর আলোড়নে যে বেদনা ও ব্যর্থতার অশ্রুময় উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছে সাম্প্রতিক যুগে তার স্থানে শ্লেষ ও বিদ্রূপের দ্রুতধাবমান আবর্ত একটু প্রাধান্য পেয়েছে। ত্রিশ বছরের ব্যবধানে লিখিত দুটি নাটিকাকে আমরা এই সংকলন-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করলাম।

রাজপুরী নাট্যকারের একটি শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা। ঘটনার তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত, মুহুর্মুহু জটিল সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব এবং হৃদয়বৃত্তির শ্বাস-রোধকারী লীলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চরম নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। নাটকাটির কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অসাধারণ ব্যক্তিত্বময় রাণী চরিত্রটি। সে দাসীকন্যা বটে, কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তি, সুকঠোর সংকল্প ও নির্ভীক আচরণে সে এক অসামান্যা নারী। প্রণয়ীর প্রতি লালসা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, রাজার প্রতি কর্তব্য এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি বিচিত্র ও বিরোধী হৃদয়াবেগে তার সত্তা দুর্দমনীয় বেগে আলোড়িত হয়েছে। পরিশেষে এই নারী ভোগঐশ্বর্যের সব আয়োজন উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল বোধ হয় সর্বরিক্ততা ও সর্বশান্তির পথে। বিরূধক শাক্যমুনির হত্যার আদেশ দিয়ে অবশেষে নিজের মায়েরই হত্যার কারণ হ'লো। এর মধ্যে ভাগ্যের যে নির্মম পরিহাস আছে তা নাটকের ট্র্যাজেডিকে গ্রীক ট্র্যাজেডির মত গাঢ় ও গম্ভীর করে তুলেছে। সব কামনা, সব হিংসার শেষে যে বৈরাগ্যের পরম শান্তি বিরাজমান তারই ব্যঞ্জনা রয়েছে নাটিকাটির পরিণতিতে।

অসাধারণ নাটিকাটির মধ্যে এক আদর্শবাদী অধ্যাপকের চরিত্র অতি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অধ্যাপক পবিত্র বসু বর্তমান যুগে বাস ক'রেও সনাতন নীতি ও সত্যনিষ্ঠাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধ'রে আছেন। কিন্তু বাস্তব সংসার বড় কঠোর। বড় নিষ্ঠুর, তার দাবী অনন্ত, ক্ষুধাও প্রচণ্ড। অমলা যে কাজটি করেছেন তা খুবই নিন্দনীয় ও অপরাধজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বামী ও সংসারের কল্যাণের দিকে তাকিয়েই তিনি এরূপ অন্যায় কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পবিত্র ন্যায়ের জন্য সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করেছিলেন

আর অমলা সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অন্যায়ের কাছে নিজেকে বিসর্জন দিলেন। বর্তমান স্বার্থসর্বস্ব ও সত্যভ্রষ্ট জগতে হয়তো অমলার অন্যায় কাজ সমর্থনের জন্য প্রখর যুক্তি সাময়িক জয়লাভ করতে পারে, কিন্তু পরাজিত বেদনাহত অধ্যাপকের সত্যনিষ্ঠা চতুর্দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে তারার আলোর মতই চিরকাল জলজল করতে থাকবে।

সাহিত্যের প্রায় সব বিভাগেই সার্থক সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিতে বনফুলেব মত খুব কম লেখকই সক্ষম হয়েছেন। সংস্কৃত একাঙ্ক নাটকের একটি বিভাগ হল ভাণ। এই ভাণ নামটি গ্রহণ ক'রে তাঁর দশটি একাঙ্ক নাটকের নাম দিলেন দশ-ভাণ। পরিবেশ, আঙ্গিক ও রসের দিক দিয়ে বনফুলের একাঙ্ক নাটক-গুলিতে নানাবিধ বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক একাঙ্কিকার মধ্যে নিখুঁত নাট্যকলাকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। **শিককাবাব** একটি অসাধারণ একাঙ্ক নাটক। একটি নেপথ্যবর্তিনী নারীকে কেন্দ্র ক'রে একদল জান্তব মানুষের কামনালোলুপ রূপ নগ্ন আগুনের মতই নাটিকাটির মধ্যে অনাবৃত হয়েছে। একদিকে একটি হতভাগী নারীর দুর্ভাগ্য কাহিনী ও আত্মহত্যা যেমন এক করুণ কান্নার মতই আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে তেমনি অন্যদিকে আক্রমণোদ্যত হিংস্র বাঘের মতই প্রতীক্ষারত দুর্দান্ত জমিদার ও তাঁর প্রসাদ-প্রত্যাশী তীক্ষ্ণ নখ-দন্তবিশিষ্ট কয়েকটি শ্বাপদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এক বীভৎস সম্ভাবনা আমাদের অন্তরকে আশঙ্কাকম্পমান করে রাখে। এই আত্যন্তিক উত্তেজনাজনিত উৎকণ্ঠা এবং করুণ ও বীভৎস রসের এই যে মিশ্রণ—এদের মধ্য দিয়েই সুতীব্র নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছে। বনফুলের ছোট গল্পের শেষে যেমন অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনার দ্বারা কাহিনীর মূলধারা একেবারে বিপরীত পরিণতি লাভ করে, তেমনি এই নাটিকাতেও একেবারে শেষদিকে সৌদামিনীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়ে সর্বপ্রকার কল্পিত সম্ভাবনাকে একেবারে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলা হয়েছে। শিককাবাবের প্রতি জমিদার ও তার মোসাহেবদের যে লোভ দেখানো হয়েছে তার মধ্য দিয়ে নারীমাংসলোলুপতার এক গূঢ়তর ব্যঞ্জনা রয়েছে। শিককাবাব ভক্ষণের সময় চরিত্রগুলির মধ্যে-যে শ্বাপদসুলভ লুব্ধ ব্যগ্রতা দেখা গিয়েছে তার মধ্য দিয়ে আর এক প্রকার মাংস আস্বাদনার আসন্ন সম্ভাবনা দর্শকচিত্তে জাগ্রত হয় এবং নিরুদ্ধ নিশ্বাসে নাট্যঘটনার পরিণতি দেখবার জন্য সে অপেক্ষা করতে থাকে।

শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্তের **উপসংহার** নাটিকাটির সঙ্গে পিরাণ্ডেলোর Six characters in search of an Author নাটকটির সাদৃশ্য রয়েছে।

এখানে নাটিকার তারাপদ চরিত্রটিকে ভূত নাম দেওয়া হয়েছে, ভূতের মধ্য দিয়ে জীবনের বলিষ্ঠ আশা ও আনন্দবাদ ব্যক্ত হয়েছে। যে সব সাহিত্যিক দুঃখ ও নৈরাশ্যকেই বড় করে দেখেছেন ভূত যেন তাঁদের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ মতবাদ। স্বামী ও স্ত্রীর কথোপকথনের মধ্যে নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে স্বামীর গম্ভীর গুরুত্ববোধের সঙ্গে স্ত্রীর লঘু পরিহাসপ্রিয়তার একটি চমৎকার ভাব-বৈপরিত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল তাঁর সংলাপ। এই সংলাপ হ্রস্ব, ক্ষিপ্র ও সাহিত্য-রস সমৃদ্ধ।

আধিভৌতিক কৌতুকরসাত্মক উপভোগ্য নাটিকা। এখানে হরেক রকম মানুষের উদ্ভট কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে এক কৌতুকের চিড়িয়াখানা যেন খুলে দেওয়া হয়েছে। বিকৃত সাহেবী ভাবাপন্ন নিকলডে, থিয়েটার-পাগল ঘেণ্টু ও পেণ্টু, হিন্দীভাষী পাঠক ও বাঙাল মুন্সী, রুগ্ন ডাক্তার ও মূর্খ গণক প্রভৃতি বহু বিচিত্র টাইপ চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন আনাগোনায় এক উচ্ছ্বসিত কৌতুকরসের ধারা নাটকের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু চরিত্রগুলি যত বিচিত্রই হোক এদের উদ্দেশ্য কিন্তু এক। সেই উদ্দেশ্য হ'ল রায়বাহাদুরের অর্থ আত্মসাৎ করা। হাসির উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এদের নীচ ও নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ শ্লেষের বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নাটিকাটির কাহিনী কিন্তু জমে উঠেছে রায়বাহাদুরের বাড়ি থেকে চলে যাবার পর। রায়বাহাদুরের মঙ্গল ঘটাবার জন্য আচার্য ও ফকিরের যুগপৎ প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা ক'রে ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া, ভুল সংবাদকে ভিত্তি ক'রে কৃত্রিম বিলাপের বন্যা, রায়বাহাদুরের শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন এবং সর্বশেষে বুঝি বা প্রেতলোক থেকে স্বয়ং রায়বাহাদুরের আবির্ভাব ও তাঁর আত্মীয় ও শুভাকাঙ্খীদের মধ্যে বিষম ত্রাসের সঞ্চার প্রভৃতি চমকপ্রদ ঘটনার মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত্ত এক অদম্য কৌতূহল ও অবিচ্ছিন্ন উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে থাকে।

সাপ্তাহিক সমাচার একটি নিখুঁত একাঙ্ক নাটক। গল্পের আসরেই হোক আর নাটকের মঞ্চেই হোক—শ্রীপরিমল গোস্বামী রঙ্গব্যঙ্গ সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত। তাঁর ঘুঘু-তে কিন্তু আমরা ঘুঘু ও ফাঁদ দুই-ই দেখেছি। তবে আলোচ্য নাটিকা-টিতে ব্যঙ্গের লৌহবাণ অপেক্ষা রঙ্গের ফুলবাণই নিক্ষিপ্ত হয়েছে বেশি এবং নাটিকাটির উপভোগ্যতা তাই এত বেড়েছে। একটি নারীচরিত্রকে অবলম্বন ক'রে দুটি পুরুষ চরিত্রের ভাগ্য ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে আকস্মিক ভাবে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিস্থিতির দ্রুত রূপান্তরের মধ্যেই নাটকীয় রস

বিশেষ ভাবে জমে উঠেছে। যে ইন্দুর কাছে বঙ্কিম-প্রতিকূলা পরিতৃপ্তি দেবীর কথা বলতে এল সেই যখন সম্পাদকীয় নিরপেক্ষতা ছেড়ে দিয়ে প্রেমিকের আত্মপক্ষপাতী উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করতে লাগল তখন পরিস্থিতি বেশ জটিল হয়ে উঠল। কিন্তু পরিস্থিতির জটিলতা আরো বৃদ্ধি পেল তখন যখন বিস্ময়বিমূঢ় বঙ্কিম দেখল সে, তারই সামনে তার বহু আকাঙ্খিতা পরিতৃপ্তি দেবী এক হঠাৎ পরিচিত সম্পাদকের সঙ্গে প্রেমের ইন্দ্রধনুরঞ্জিত আকাশপথে উড়ে চলেছে। বিপর্যস্ত ও উন্মত্ত বঙ্কিম তাদের ভূপাতিত করবার অনেক চেষ্টা করল (বিমান-ধ্বংসী কামানের দ্বারাই বোধ হয়)। যা হোক, অবস্থা যখন প্রায় আয়ত্তের বাইরে তখনই দেখা গেল পরিতৃপ্তি নিজেই নেমে এল মাটিতে। এবার বিপর্যস্ত হবার পালা ইন্দুর। সে তার কাব্যের রঙীন সিঁড়ি বেয়ে পরিতৃপ্তি দেবীকে নিয়ে স্বপ্নস্বর্গের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ঠিক এমন সময় দেখা গেল স্বর্গের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাগ্যের বাঁকা হাসির মতই বঙ্কিম। দ্বারপথে সে একা দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করল বঙ্কিম ও পরিতৃপ্তি।

আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য সম্প্রতি একাঙ্ক নাটক রচনাতেও তাঁর নিপুণ হস্ত প্রয়োগ করেছেন। তাঁর কান্না হাসির পালা বইখানিতে সার্থক একাঙ্ক নাটকরচনার পরিচয় রয়েছে। **উজান যাত্রা**র মধ্যে তিনি বর্তমান সমাজের একটি অতি বাস্তব সমস্যা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে গভীর সমাজসচেতনতা ও বেদনাসিক্ত সহানুভূতি তাঁর বহু-খ্যাত নাটক ক্ষুধার মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন তার সুপ্রচুর নিদর্শন এই নাটিকাটির মধ্যেও পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত একটি উদ্বাস্তু পরিবারের কাহিনীই এতে বর্ণিত হয়েছে। এই উদ্বাস্তু মানুষগুলির ভাগ্য দিয়ে বিধাতা কি ছিনিমিনিই না খেলেছেন! নিজেদের বাসস্থান থেকে তারা বিতাড়িত আর যে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে তারা এল সেখানেও তারা প্রত্যাখ্যাত। তাদের পিছনে দুঃস্বপ্নের অন্ধকার আর সম্মুখে শূন্যতার কুজ্ঝটিকা। তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত হেডমাষ্টার বেকার হ'য়ে ব'সে ঘর বাঁধেন আর মহাজ্ঞানী পণ্ডিত প্রায় অনাহারেই কাল কাটান। অক্ষম সর্বহারা পিতামাতার একমাত্র কন্যাকে আজকাল যে কি নিদারুণ সংগ্রাম চালাতে হয় তার ইতিহাস আমরা কমই রাখি। কিন্তু তার ইতিহাস দিয়েছেন নাট্যকার অভাগী বিনোদিনীর মধ্যে। যে সংগ্রামশীলা নারীটি নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চরমতম লজ্জা ও দুর্ভাগ্য বরণ ক'রে নিল তাকে অপরাধিনী বলা যে কত বড়

অন্যায় তা নাট্যকার তাঁর মুখপাত্র উদারচেতা বিদ্যাবাগীশের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত নীতি ও দুর্নীতির ধারণা সে কত ভ্রান্ত ও নিষ্ঠুর তার পরিচয় আমরা পেলাম এই নাটিকাটির মধ্যে। নাট্যকারের দরদ ও সহানুভূতি যেমন একদিকে ব্যক্ত হয়েছে তেমনি অন্যদিকে বর্ষিত হয়েছে তাঁর শ্লেষ ও বিদ্রূপ। এই শ্লেষ ও বিদ্রূপের পাত্র হল গোপীকান্ত গোঁসাই। রবীন্দ্রনাথের গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মতই এঁরও "মনটা যেমন, সর্বদাই রসসিক্ত থাকে'। আর একজন নাট্যকারের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবিদ্ধ হয়েছেন, তিনি হলেন অপর্ণার বোন সুপর্ণা। তাঁর বাঙাল বিতৃষ্ণা, কঠোর শাসনপ্রিয়তা, কৃত্রিম ফ্যাসানবিলাস ও স্বৈরাচার সবকিছুর মধ্য দিয়ে নাট্যকার ভণ্ড, অনুদার ও দুর্নীতিপরায়ণ সমাজকেই তীব্র আঘাত হেনেছেন।

একটি তরুণ ও একটি তরুণী পরস্পরকে ভালোবাসে, কিন্তু তাদের ভালো-বাসার কুসুমটি তো সার্থক হ'য়ে ফুটতে পরে না। জীবনে আছে কঠোর দারিদ্র্য এবং তার অনিবার্য ফল—মারাত্মক ব্যাধি, আর আছে পুরোনো ধ্বসে-পড়া সমাজের কতকগুলি প্রাণহীন প্রেতাত্মা (মিসেস অ্যালভিঙ এদেরই প্রেতাত্মা বলেছিলেন)। এরা সেই ভালোবাসার কুসুমটিকে ছিঁড়ে তার পাপড়িগুলি ধূলায় ছড়িয়ে দেয়। জীবনের এই ট্র্যাজেডি নূতন নয়, কিন্তু চিরন্তন। সেই ট্র্যাজেডিই তো দেখা গেল **অপচয়** একাঙ্কিকাটির সন্ধ্যা ও মিলনের জীবনে। সন্ধ্যার মা সুশীলা তিনটি মেয়ের ভাবনায় অতিমাত্রায় পীড়িত। পূর্ববঙ্গ থেকে তিনি অনেক কিছু ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু ছাড়তে পারেন নি জাতি ও কুলের সংস্কার। না পারাই অবশ্য তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। অনেক চেষ্টা, অনেক কষ্টের পর মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন, কিন্তু বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ আসে না। বিপন্ন সুশীলা জলমগ্ন লোক যেমন তৃণখণ্ড ধরে বাঁচতে চায় তেমনি ভাবে ফটিককে আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু এখানেও তাঁকে ব্যর্থ-কাম হ'তে হ'ল। আরো আঘাত তাঁর জন্য অপেক্ষা ক'রছিল। যে জাতি ও কুলের প্রতি মোহ তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারেননি, তাঁর মেয়ে সন্ধ্যা যখন সেই জাতি ও কুলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না ক'রে স্বাধীন ভাবে জীবনকে যাচাই করতে চাইল তখন তিনি কঠিন আঘাত পেলেন। স্নেহ অপেক্ষা সংস্কার বড় হ'য়ে উঠলে এমনি ভাবে মানুষ আঘাত পায়। কিন্তু সন্ধ্যাও স্বাধীন জীবনের আস্বাদ চেয়েও পেল না। ফুলের মালা সে মিলনের গলায় পরিয়ে দিল বটে, কিন্তু আশাহীন ক্ষয়রোগগ্রস্ত মিলনের বুকে প্রতিহত হ'য়ে সেই মালা তরবারি হয়েই যেন সন্ধ্যাকে নিষ্ঠুর আঘাত করল।

কথাশিল্পী শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কালে নাটক রচনাতেও তাঁর প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। তাঁর ভাড়াটে চাই ও বারো ভূতে নাটিকা দু'খানি অশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ইতিহাসখ্যাত বাস্তব জীবনকাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনায় তাঁর বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। রামমোহন নাটকের মধ্যে সেই পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বর্তমান নাটিকা **এক সন্ধ্যায়** পুনরায় সেই পরিচয় পাওয়া গেল। বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের পারস্পরিক অনুরাগের সম্বন্ধ অবলম্বন ক'রে নাটিকাটি রচিত হয়েছে। বিহারী-লালের কাব্যই যে শুধু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবান্বিত করেছিল তা' নয়, বিহারী-লালের সঙ্গে তাঁর একটি নিবিড় প্রীতি-সম্পর্কও বর্তমান ছিল। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘিরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল।" কিন্তু তাঁর এই আনন্দানুভূতির মূলে একটি বেদনার উৎস ছিল। এই বেদনার উৎসের সন্ধান পাই তাঁর সারদামঙ্গলে এবং আঘাতের ছলে এই উৎসটিই তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন যে তাঁর নতুন বৌঠান তাঁর কবিত্ব-অহঙ্কার এবং কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে কোনোমতেই প্রশংসা করতে চাইতেন না। নতুন বৌঠানের সেই আচরণ এই নাটিকায় নাট্যকার বিহারীলালের উপর আরোপ করে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগের রূপটিকে আরো গূঢ় ও গভীর করে তুলেছেন। আত্মভোলা, কাব্যরসে মাতোয়ারা বিহারীলালের যে-চিত্রটি নাটিকাটির মধ্যে পেলাম তা' কখনো ভোলা যায় না। তিনি নিজে কাব্য সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট নন, তাঁর শিষ্যের কাব্যসৃষ্টিতেও মূর্তিমান প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন! আঘাত তিনি করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন, সেই আঘাতে রবির চিত্ত সুরের আলোতেই ঝ'রে ঝ'রে পড়বে।

সাজঘর নাটিকাটির মধ্যে শ্রীঅখিল নিয়োগী অভিনেতৃজীবনের দু'টি দিক চমৎকার ভাবে তুলে ধরেছেন। পাদপ্রদীপের সামনে যে অভিনেতা জীবনের বিচিত্র রস ফুটিয়ে তুলে ঘন ঘন করতালিমিশ্রিত অভিনন্দন লাভ করে, সাধারণ লোকের বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে সে কতই না সুখী ও সৌভাগ্যবান! কিন্তু তার নিত্যকার বাস্তব জীবন এই করতালি-সম্বর্ধিত জীবনের যে কত বড় প্রতিবাদ

তার সন্ধান ক'জনই বা রাখে! কিন্তু সেই দুঃখ ও দারিদ্র্যবিড়ম্বিত জীবনটিই যে একান্ত নিষ্ঠুর ভাবে সত্য, রংদার পোষাক ও নকল পরচুলাশোভিত জীবন তো এক ক্ষণিকের মিথ্যা বিলাস মাত্র। থিয়েটারের আর্থিক সাফল্যের মূলে যে শিল্পীর অভিনয়নৈপুণ্য বিদ্যমান সেই কিভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে নির্মম ভাবে উপেক্ষিত হয় নাট্যকার সেই সমস্যা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু উঁচু তলার মানুষের মধ্যে যা দুর্লভ তাই হয়তো নীচের তলার মানুষের মধ্যে হঠাৎ চোখে পড়ে, তাই সাজঘরের মধ্যে মাঝে মাঝে মাকালের মত মানুষও দেখা যায়—মাকাল ফল নয়, খাঁটি সুমিষ্ট ফল।

শ্রীসুনীল দত্ত নাট্যসাহিত্যের একজন একান্ত অনুরক্ত ও অক্লান্ত সাধক। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক উভয় প্রকার নাটকেই তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে চলেছেন। **কুয়াশা** নাটিকাটির মধ্যেও তাঁর সৃষ্টিনৈপুণ্যের স্বাক্ষর বিদ্যমান। স্ত্রীর প্রতি অমূলক সন্দেহ ও তার নিরসন নিয়ে অনেক প্রসিদ্ধ নাট্যকারই নাটক রচনা ক'রে গেছেন। শেক্সপীয়রের Merry Wives of Windsor, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ, অমৃতলালের ডিসমিস প্রভৃতি নাটকের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটিকাটিতেও উমা ও অবিনাশের মধ্যে যে সাময়িক কুয়াশা জমে উঠেছিল তার তৃপ্তিজনক দূরীকরণে কাহিনীর পরিণতি ঘটেছে। জাঁদরেল ডিটেকটিভ অবিনাশ কত পলায়িত স্বদেশকর্মীকে ধ'রে সরকারের কাছে সুনাম ও পদোন্নতি পেল সেই যে কিরূপ অন্যায় ও অমূলক সন্দেহের ছায়ার পিছনে ধাবিত হ'য়ে ব্যর্থ হয়েছে তাই দেখে আমরা বিশেষ মজা বোধ করি। আর এক দিক দিয়ে অবিনাশ চরিত্রটির পরিবর্তন নাট্যকাহিনীর পরিণতিতে দেখা যায়। The Rising of the Moon নাটকের সার্জেণ্ট যেমন শেষকালে বিদ্রোহী লোকটির পলায়নে সাহায্য করেছিল সরকারের চির-অনুগত ডিটেকটিভ কর্মচারী অবিনাশও অবশেষে সত্য গোপন ক'রে অশোকের পলায়নে সহযোগিতা করেছে। নাটিকাটির সংলাপ ক্ষিপ্র উক্তি-প্রত্যুক্তিতে দীপ্তিময় এবং ঘনীভূত নাট্যোৎকণ্ঠা ও পরপর সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির মধ্যে নাট্যরস জমে উঠেছে।

আধুনিক নবীন নাট্যকারদের মধ্যে একাঙ্ক নাটক রচয়িতারূপে শ্রীগিরিশংকরের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শেষ সংলাপের একাঙ্কিকাগুলি প্রত্যক্ষ সমাজবাস্তবতায় যেমন সত্য, সুনিপুণ নাট্যকলাকৌশল প্রয়োগে তেমনি সার্থক। **একচিলতে** তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একাঙ্কিকা। মহানগরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের একচিলতে নাটিকাটির মধ্যে চিত্রিত হয়েছে—ফুটপাথের

ধূলা ও আবর্জনার মধ্যে পথ চলতে যাদের আমরা দেখতে পাই। তাদের দেখে ঘৃণায় আমরা নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দ্রুত চ'লে যাই বটে, কিন্তু হয়তো তাদের জীবনেও এক টুকরো আকাশ ও এক মুঠো মাটি একদিন ছিল। যেমন ছিল ধনঞ্জয়, বুড়ো ও বাতাসীর জীবনে। মানুষের অত্যাচারই তাদের নিয়ে এল এই নির্মম পাষাণপুরীর অভিশপ্ত পথে। তাদের উদরের ক্ষুধা ধরল ভিক্ষার পথ আর তাদের বিকৃত জীবনতৃষ্ণা আদিম কামনার কলুষিত সুড়ঙ্গ পথই বেছে নিল। কিন্তু এত গ্লানি ও বিকারের মধ্যেও বোধ হয় মানুষের স্বপ্ন একেবারে শুকিয়ে যায় না। পাঁক হোক, তবুও তো শতদল তাতেই ফোটে। ধনঞ্জয় ও বাতাসীর স্বপ্ন-শতদলও বুঝি মিথ্যা নয়।

সকাল বেলায় একঘণ্টা নাটিকাটির কাহিনী একটি বাস দুর্ঘটনা কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। অমূলক আশঙ্কা যদি কখনো মনের মধ্যে একবার স্থান পায় তা হ'লে আস্তে আস্তে তা' কিভাবে ডালপালা ছড়িয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে তার কৌতুকজনক রূপ ফুটে উঠেছে নাটিকাটির মধ্যে। বলাই পাইকপাড়ায় গিয়ে ফিরে আসেনি। সুতরাং পাইকপাড়ার পথে যে বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে তাতে নিশ্চয়ই সে ছিল এবং খুব সম্ভবত তারও চরম কোনো অমঙ্গল ঘটেছে। এই আশঙ্কা মা, বাপ, বোন সকলকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। কোনো যুক্তি ও বিচারের মধ্য দিয়ে এটা কেউ বুঝতে চাইল না যে তাদের আশঙ্কা অমূলকও হতে পারে। দীনেশবাবুর আগমনে ও তিনিও এই পারিবারিক আশঙ্কাটি মেনে নেবার ফলে পরিস্থিতি আরো করুণ হ'য়ে উঠল। ভবতোষ এসে এমন কিছু বলল যাতে সকলের আশঙ্কাই দূরীভূত হ'য়ে যেতে পারত. কিন্তু তখন আশঙ্কাটি এমন ভাবে সকলের মনে গেঁথে গেছে যে বিপরীত কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না। অবশেষে বলাইয়ের সশরীরে আবির্ভাবের ফলে সম্মিলিত ভয় ও শোক সব আচমকা আঘাতে সরিয়ে দিয়ে একটি পরম স্বস্তির কৌতুকবোমা হঠাৎ যেন ফেটে পড়ল। নাট্যকার যে ভাবে প্রকৃত ঘটনাটি চেপে রেখে বিভিন্ন চরিত্রের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মধ্য দিয়ে কাহিনীটি টেনে নিয়ে গেছেন তাতে তাঁর সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর কৌতুকজনক পরিণতি সত্ত্বেও এতে আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা ও ব্যর্থতার একটা আভাস ফুটে উঠেছে এবং তাই নাটকের তরল সুরকে মাঝে মাঝে ভাবগম্ভীর করে তুলেছে।

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি চরম পরীক্ষার ঘটনা রূপায়িত হয়েছে **একটি রাত্রি** নামক নাটিকায়। বিদ্যাসাগর সমাজের বহু কঠিন বাধা

ও প্রতিরোধ অগ্রাহ্য ক'রে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন। অনাত্মীয় লোকেদের সঙ্গে যখন তিনি বিধবা নারীর বিবাহ ঠিক ক'রে দিতেন তখন তাঁর উদারতা ও প্রগতিবাদী মতের পরিচয় পাওয়া যেত বটে, কিন্তু তাঁর সংস্কারমুক্ত মহত্ত্বের পরিপূর্ণ নিদর্শন তখনও হয়তো বাকি ছিল। কিন্তু যেদিন তিনি নিজের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে এক বিধবা পাত্রীর বিবাহ দিতে উদ্‌যোগী হলেন সেদিনই প্রকৃতপক্ষে তাঁর অকপট মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের জীবনে আপন ও পরের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না, তাঁর প্রচারিত মত ও আচরিত জীবনধারার মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। তাঁর সমগ্র সত্তার মধ্যে একটি অবিভাজ্য অকৃত্রিমতা ছিল ব'লেই তিনি সকলের মনে এক অনন্য ভক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে আছেন। আলোচ্য নাটিকায় পুত্রের বিধবা বিবাহে তিনি কিভাবে সাগ্রহ সম্মতি দিয়েছিলেন তারই বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু তাঁর এই সম্মতি ধরা পড়ল নাটিকাটির একবারে শেষ ভাগে এবং সেজন্য নাটিকাটির মধ্যে একটা চমৎকার সংশয়িত কৌতূহল গ'ড়ে উঠেছে। বোধ হয় তিনি পরিবারের সকলের মন স্পষ্টভাবে পরীক্ষা করবার জন্যই প্রথমত একটু দ্বিধা ও অমত ব্যক্ত করেছেন। পরিশেষে তাঁর আবেগোচ্ছ্বসিত ভাষায় আমরা জানতে পারলাম যে এই বিবাহ তাঁর কতখানি আকাঙ্ক্ষিত। বজ্রকঠিন পিতার চোখ দিয়ে টপ টপ ক'রে আশীর্বাদের অশ্রু ঝ'রে পড়ছে, এ-দৃশ্য ভোলা যায় না।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে শ্রীকিরণ মৈত্রের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সমাজের নানা সমস্যা সম্বন্ধে গভীর চেতনা, মানুষের দুঃখদুর্গতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রভৃতি যে গুণগুলি তাঁর অন্যান্য নাটকে দেখা যায় সেগুলি **কোথায় গেল** একাঙ্কিকার মধ্যেও পরিস্ফুট হয়েছে। নাটিকাটির মধ্যে মাত্র দু'টি চরিত্র, কিন্তু চরিত্র দু'টির ভাবাবেগের বিচিত্র পরিবর্তন ও ক্ষিপ্রগতি সংলাপের মধ্য দিয়ে ঘনীভূত নাট্যরস জমে উঠেছে। নিমাই ও অতুল সমাজের দু'টি বহুধিক্কৃত হতভাগ্য চরিত্র। অনেক আঘাত, অনেক বঞ্চনার ফলে তারা সমাজের সুস্থ ও নৈতিক জীবনের উপর আস্থা হারিয়েছে। তারা আলোকিত সমাজের ঘৃণিত কলঙ্ক, পরিষ্কৃত ভদ্র প্রাঙ্গণের নিক্ষিপ্ত আবর্জনা। কিন্তু তারা দু'জনে এক ভাগ্যসূত্রে বাঁধা, নিবিড় ঘনিষ্ঠতার মধ্যে তারা তাদের দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা করে চলে। কিন্তু রিক্ততার মধ্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে ঘনিষ্ঠতা গ'ড়ে ওঠে সম্পদের সম্ভাবনাতেই বুঝি তা তিরোহিত হ'য়ে যায়। অর্থই সকল অনর্থের মূল, একথা যে কত সত্য তার পরিচয় আর একবার

পেলাম এই নাটিকাটিতে। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত যে দুই বন্ধু পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত ছিল নোটের বাণ্ডিল নিয়ে তারাই নারকীয় হিংস্রতা নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করল। যাক, নোটগুলি জাল ছিল ব'লে শেষ পর্যন্ত তারা রক্ষা পেল। তারা ভাগ্যের আলোক থেকে বঞ্চিত হ'ল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের অন্ধকারের মধ্যে পুনরায় দু'জনকে ফিরে পেল।

শ্রীরমেন লাহিড়ীর **মনোবিকলন** একখানি সুলিখিত একাঙ্ক নাটক। মনোবিকলনবিদ্ নিশীথ নিজের মনোবিকলন বিদ্যার যথেষ্ট গর্ব ক'রে কিভাবে নিজের স্ত্রীর মনোবিকলন করতেই ব্যর্থ হল এবং কিভাবে তার প্রচারিত তত্ত্ব—সব মানুষই বদ্ধ পাগল—অতি মর্মান্তিকভাবে সত্যে পরিণত হ'ল তার সরস শ্লেষবিদ্ধ কাহিনী নাটিকাটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। নাটিকাটির মধ্যে বিভিন্ন চরিত্রের পরপর মানসিক বিপর্যয়ের যে রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং দিব্যেন্দু ও বিনতার সম্বন্ধ গোপন রেখে তাদের ঘনিষ্ঠ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে নাট্যরস বিশেষ জমে উঠেছে। অবশেষে দিব্যেন্দু ও বিনতার প্রকৃত সম্বন্ধ ব্যক্ত হবার ফলে সব ঘনীভূত ঈর্ষা ও সন্দেহ এক মুহূর্তে উপভোগ্য কৌতুকময়তায় পরিণতি লাভ করল।

পরিশেষে যে সব নাট্যকার এই সংকলন-গ্রন্থের জন্য তাঁদের নাটক প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই সংকলনের যে অভাব ও ত্রুটি রয়ে গেল সে-সব সম্বন্ধে আমরা সচেতন। আগামী সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করবার আশা রইল। যে সব নাট্যামোদী সহৃদয় বন্ধু এই সংকলনের জন্য অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মৌলিক একাঙ্ক নাটক আরো অধিক সংখ্যায় বাংলা সাহিত্যে লিখিত হোক, আরো ব্যাপকতর ভাবে একাঙ্ক নাটকের অভিনয় দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ুক, জনসাধারণের চিত্তে এই বিশিষ্ট ধরনের নাটক সম্বন্ধে কৌতূহল ও অনুরাগ বর্ধিত হোক, এই আশাই আমাদের এই সংকলনের দিকে চালিত করেছে। আমাদের সেই আশা যদি কিছু মাত্রও পূর্ণ হয় তবেই এই সংকলনের পরম সার্থকতা বিবেচনা করবো।

খ্যাতির বিড়ম্বনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[উকিল দুকড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন। ভয়ে ভয়ে খাতা-হস্তে কাঙালিচরণের প্রবেশ]

দুকড়ি ॥ কী চাই ?

কাঙালি ॥ আজ্ঞে, মশায় হচ্ছেন দেশহিতৈষী—

দুকড়ি ॥ তা তো সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী ?

কাঙালি ॥ আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

দুকড়ি ॥ ক'রে ওকালতি ব্যাবসা চালাচ্ছি তাও কারও অবিদিত নেই—কিন্তু তোমার বক্তব্যটা কী ?

কাঙালি ॥ আজ্ঞে, বক্তব্য বেশী নেই।

দুকড়ি ॥ তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো-না।

কাঙালি ॥ একটু বিবেচনা করে দেখলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে 'গানাৎ পরতরং নহি'—

দুকড়ি ॥ বাপু, বিবেচনা এবং স্বীকার করবার পূর্বে যে কথাটা বললে তার অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক। ওটা বাংলা করে বলো।

কাঙালি ॥ আজ্ঞে বাংলাটা ঠিক জানি নে। তবে মর্ম হচ্ছে এই, গান জিনিসটা শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

দুকড়ি ॥ সকলের ভালো লাগে না।

কাঙালি ॥ গান যার ভালো না লাগে সে হচ্ছে—

দুকড়ি ॥ উকিল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত।

কাঙালি ॥ আজ্ঞে, অমন কথা বলবেন না।

দুকড়ি ॥ তবে কি মিথ্যে কথা বলব ?

কাঙালি ॥ আর্যাবর্তে ভরত মুনি হচ্ছেন গানের প্রথম—

দুকড়ি ॥ ভরত মুনির নামে যদি কোনো মকদ্দমা থাকে তো বলো, নইলে বক্তৃতা বন্ধ করো।

কাঙালি ॥ অনেক কথা বলবার ছিল—

দুকড়ি ॥ কিন্তু অনেক কথা শোনবার সময় নেই।

কাঙালি ॥ তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে 'গানোন্নতিবিধায়িনী'-নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মহাশয়কে—

দুকড়ি ॥ বক্তৃতা দিতে হবে?

কাঙালি ॥ আজ্ঞে না।

দুকড়ি ॥ সভাপতি হতে হবে?

কাঙালি ॥ আজ্ঞে না।

দুকড়ি ॥ তবে কী করতে হবে বলো। গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ দুটোর কোনোটা আমার দ্বারা কখনো হয় নি এবং হবেও না—তা আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।

কাঙালি ॥ মশায়কে ও দুটোর কোনোটাই করতে হবে না।

[খাতা অগ্রসর করিয়া]

কেবল কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি ॥ (ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া) চাঁদা! আ সর্বনাশ! তুমি তো সহজ লোক নও হে—ভালমানুষটির মতো মুখ কাঁচুমাচু করে এসেছ—আমি বলি বুঝি কী মকদ্দমার ফেসাদে পড়েছ। তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি—নইলে ট্রেস্‌পাসের দাবি দিয়ে পুলিস-কেস আনব।

কাঙালি ॥ চাইলুম চাঁদা, পেলুম অর্ধচন্দ্র! (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জব্দ করব।

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[দুকড়িবাবু কতকগুলি সংবাদপত্র হস্তে]

দুকড়ি ॥ এ তো বড়ো মজাই হল! কাঙালিচরণ বলে কে একজন লোক ইংরেজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে, আমি তাদের 'গানোন্নতিবিধায়িনী' সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল—এতে আমার ব্যাবসার পক্ষে ভারি সুবিধে।

তাদেরও সুবিধে, লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েছে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারি ভারি চাঁদা আদায় হবে। যা হোক, আমার অদৃষ্ট ভালো।

[কেরানিবাবুর প্রবেশ]

কেরানি ॥ মশায় তবে গানোন্নতি-সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন ?

ডুকড়ি ॥ (মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া) আ—ও একটা কথার কথা। শোন কেন ? কে বললে দিয়েছি ? মনে করো যদি দিয়েই থাকি, তা হয়েছে কী ? এত গোলের আবশ্যক কী ?

কেরানি ॥ আহা, কী বিনয় ! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য ॥ নীচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েছে।

ডুকড়ি ॥ (স্বগত) দেখেছ ! এক দিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের উপরে নিয়ে আয়—আর পান-তামাক দিয়ে যা।

[প্রথম ব্যক্তির প্রবেশ]

ডুকড়ি ॥ (চৌকি সরাইয়া) আসুন—বসুন। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। ওরে—পান দিয়ে যা।

প্রথম ॥ (স্বগত) আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি। এঁর কাছে কামনাসিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে !

ডুকড়ি ॥ মশায়ের কী অভিপ্রায়ে আগমন ?

প্রথম ॥ আপনার বদান্যতা দেশবিখ্যাত।

ডুকড়ি ॥ ও-সব গুজবের কথা শোনেন কেন ?

প্রথম ॥ কী বিনয় ! কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিলুম, আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।

ডুকড়ি ॥ (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়। বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশ্যে) তা মশায়ের কী আবশ্যক ?

প্রথম ॥ দেশের উন্নতি-উদ্দেশ্যে হৃদয়ের—

ডুকড়ি ॥ আজ্ঞে, সে-সব কথা বলাই বাহুল্য—

প্রথম ॥ তা ঠিক। মশায়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি যাঁরা ভারতভূমির—

তুকড়ি ॥ সমস্ত মানছি মশায়, অতএব ও অংশটুকুও ছেড়ে দিন।
তার পরে—

প্রথম ॥ বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে, নিজের গুণানুবাদ—

তুকড়ি ॥ রক্ষে করুন মশায়, আসল কথাটা বলুন।

প্রথম ॥ আসল কথা কী জানেন—দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে—

তুকড়ি ॥ সে কেবলমাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না জানার দরুন।

প্রথম ॥ আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে—

তুকড়ি ॥ (সকাতরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া) বলে যান।

প্রথম ॥ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে দিনে নিমজ্জমানা—

তুকড়ি ॥ (কাতর স্বরে) মশায়, বুঝতে পারছি নে।

প্রথম ॥ তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

তুকড়ি ॥ (সানন্দে সাগ্রহে) সেই ভালো।

প্রথম ॥ ইংরেজেরা লুঠ করছে।

তুকড়ি ॥ এ তো বেশ কথা। প্রমাণ সংগ্রহ করুন, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।

প্রথম ॥ ম্যাজিস্ট্রেটও লুঠছে।

তুকড়ি ॥ তবে ডিস্ট্রিক্ট্ জজের আদালত—

প্রথম ॥ ডিস্ট্রিক্ট্ জজ তো ডাকাত।

তুকড়ি ॥ (অবাক্‌ভাবে) আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

প্রথম ॥ আমি বলছি, দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।

তুকড়ি ॥ দুঃখের বিষয়।

প্রথম ॥ তাই একটা সভা—

তুকড়ি ॥ (সচকিত) সভা!

প্রথম ॥ এই দেখুন না খাতা।

তুকড়ি ॥ (বিস্ফারিতনেত্রে) খাতা!

প্রথম ॥ কিঞ্চিৎ চাঁদা—

তুকড়ি ॥ (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা! বেরোও—বেরোও—বেরোও—

[তাড়াতাড়ি চৌকি-উল্‌টায়ন, কালি-ফেলন, প্রথম ব্যক্তির বেগে প্রস্থানোদ্যম, পতন, উত্থান, গোলমাল]

[দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ]

হুকড়ি ॥ কী চাই ?

দ্বিতীয় ॥ মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা—

হুকড়ি ॥ ও-সব হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—নতুন কিছু থাকে তো বলুন।

দ্বিতীয় ॥ আপনার দেশহিতৈষিতা—

হুকড়ি ॥ আ মোলো—এও যে সেই কথাটাই বলে !

দ্বিতীয় ॥ স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ—

হুকড়ি ॥ এ তো বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বলুন।

দ্বিতীয় ॥ একটা সভা—

হুকড়ি ॥ আবার সভা !

দ্বিতীয় ॥ এই দেখুন-না খাতা।

হুকড়ি ॥ খাতা ! কিসের খাতা ?

দ্বিতীয় ॥ চাঁদা আদায়—

হুকড়ি ॥ চাঁদা ! (হাত ধরিয়া টানিয়া) ওঠো, ওঠো, বেরোও, বেরোও—প্রাণের মায়া থাকে তো—

[দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান। তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ]

হুকড়ি ॥ দেখো বাপু, আমার দেশহিতৈষিতা বদান্যতা বিনয় এ-সমস্ত শেষ হয়ে গেছে—তার পর থেকে আরম্ভ করো।

তৃতীয় ॥ আপনার সার্বভৌমিকতা—সার্বজনীনতা—উদারতা—

হুকড়ি ॥ তবু ভালো। এ কিছু নতুন ঠেকছে বটে। কিন্তু মশায়, ওগুলোও থাক্—ভাষায় কথা আরম্ভ করুন।

তৃতীয় ॥ আমাদের একটা লাইব্রেরি—

হুকড়ি ॥ লাইব্রেরি ? সভা নয় তো ?

তৃতীয় ॥ আজ্ঞে, সভা নয়।

হুকড়ি ॥ আ, বাঁচা গেল। লাইব্রেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যান।

তৃতীয় ॥ এই দেখুন-না প্রস্‌পেক্টস—

হুকড়ি ॥ খাতা নেই তো ?

তৃতীয় ॥ আজ্ঞে না—খাতা নয়, ছাপানো কাগজ।

হুকড়ি ॥ আ !—তার পরে।

তৃতীয় ॥ কিঞ্চিৎ চাঁদা।

দুকড়ি ॥ (লাফাইয়া) চাঁদা! ওরে, আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে! পুলিসম্যান পুলিসম্যান।

[তৃতীয় ব্যক্তির উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন। হরশংকরবাবুর প্রবেশ]

দুকড়ি ॥ আরে, এসো এসো হরশংকর এসো। সেই কালেজে এক সঙ্গে পড়া—তার পরে তো আর দেখা হয় নি—তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হল সে আর কী বলব!

হরশংকর ॥ তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা আছে ভাই—সে-সব কথা পরে হবে, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

দুকড়ি ॥ (পুলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শুনি নি ভাই—বলো, শুনে কান জুড়োক।

[শালের মধ্য হইতে হরশংকরের খাতা বাহির-করণ]

ও কী ও, খাতা বেরোয় যে!

হরশংকর ॥ আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা—

দুকড়ি ॥ (চমকিত হইয়া) সভা!

হরশংকর ॥ সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্যে—

দুকড়ি ॥ চাঁদা! দেখো, তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের প্রণয়—কিন্তু ওই কথাটা যদি আমার সামনে উচ্চারণ কর তা হলে চিরকালের মতো চটাচটি হবে তা বলে রাখছি।

হরশংকর ॥ বটে! তুমি কোথাকার খড়গেছের 'গানোন্নতি' সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করতে পার, আর বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে আর পদার্পণ করে?

[সবেগে প্রস্থান। খাতা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ]

দুকড়ি ॥ খাতা? আবার খাতা? পালাও, পালাও।

খাতাবাহক ॥ (ভীত হইয়া) আমি নন্দলালবাবুর—

দুকড়ি ॥ নন্দলাল ফন্দলাল বুঝি নে, পালাও এখনি।

খাতাবাহক ॥ আজ্ঞে সেই টাকাটা।

দুকড়ি ॥ আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও।

[খাতাবাহকের পলায়ন]

কেরানি ॥ মশায়, করলেন কী? নন্দলালবাবুর কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেছে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চলবে না।

ঢুকড়ি ॥ কী সর্বনাশ! ওকে ডাকো ডাকো।

[কেরানির প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ]

কেরানি ॥ সে চলে গেছে, তাকে পাওয়া গেল না।

ঢুকড়ি ॥ বিষম দায় দেখছি।

[তম্বুরা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ]

কী চাও?

তম্বুরা ॥ আপনার মতো রসজ্ঞ কে আছে? গানের উন্নতির জন্য আপনি কী না করছেন? আপনাকে গান শোনাব।

[তৎক্ষণাৎ তম্বুরা ছাড়িয়া গান—ইমনকল্যাণ]

জয় জয় ঢুকড়ি দত্ত,
ভুবনে অনুপম মহত্ত্ব—ইত্যাদি—

ঢুকড়ি ॥ আরে, কী সর্বনাশ। থাম্ থাম্!

[তম্বুরা হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ]

দ্বিতীয় ॥ ও গানের কী জানে মশায়? আমার গান শুনুন—

ঢুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য,
তব মহিমা কে জানিবে অন্য—

প্রথম ॥ জয়-অ-জ-অ-অ-অ-অ-অ—

দ্বিতীয় ॥ ঢু-উ-উ-উ-উ-উ কড়ি-ই-ই—

প্রথম ॥ ঢুক-অ-অ-অ—

ঢুকড়ি ॥ (কানে আঙুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম!

[বাঁয়া-তবলা লইয়া বাদকের প্রবেশ]

বাদক ॥ মশায়, সংগত নেই গান! সে কি হয়!

[বাদ্য আরম্ভ। দ্বিতীয় বাদকের প্রবেশ]

দ্বিতীয় বাদক ॥ ও বেটা সংগতের কী জানে? ও তো বাঁয়া ধরতেই জানে না।

প্রথম গায়ক ॥ তুই বেটা থাম্!

দ্বিতীয় ॥ তুই থাম্-না!

প্রথম ॥ তুই গানের কী জানিস?

দ্বিতীয় ॥ তুই কী জানিস?

[উভয়ে মিলিয়া ওড়ব খাড়ব প্রণব নাদ উদারা তারা লইয়া তর্ক—অবশেষে তম্বুরায় তম্বুরায় লড়াই]

[দুই বাদকের মুখে মুখে বোল-কাটাকাটি 'ধ্রেকেটে দেধে যেনে গেধে যেনে'—অবশেষে তবলায় তবলায় যুদ্ধ। দলে দলে গায়ক বাদক ও খাতা-হস্তে চাঁদাওয়ালার প্রবেশ]

প্রথম ॥ মশায়, গান—

দ্বিতীয় ॥ মশায়, চাঁদা—

তৃতীয় ॥ মশায়, সভা—

চতুর্থ ॥ আপনার বদান্যতা—

পঞ্চম ॥ ইমনকল্যাণের খেয়াল—

ষষ্ঠ ॥ দেশের মঙ্গল—

সপ্তম ॥ সরি মিঞার টপ্পা—

অষ্টম ॥ আরে, তুই থাম্-না বাপু—

নবম ॥ আমার কথাটা বলে নিই, একটু থাম-না ভাই!

[সকলে মিলিয়া দুকড়ির চাদর ধরিয়া টানাটানি, 'শুনুন মশাই, আমার কথা শুনুন মশাই' ইত্যাদি]

দুকড়ি ॥ (সকাতরে কেরানির প্রতি) আমি মামার বাড়ি চললুম। কিছুকাল সেখানে গিয়ে থাকব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না।

[প্রস্থান]

[গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক-বাদকের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।
বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন]

(মাঘ ১২৯২)

রাজধানীর রাস্তায়

শচীন সেনগুপ্ত

[কলিকাতা শহরের অন্ধকার-প্রায় রাস্তার চৌমাথা। বিলাসী আর মোহিনী সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। শীর্ণ চেহারা, মলিন বেশ। চরণ ক্লান্ত, দৃষ্টিতে শঙ্কা ও উদ্বেগ।]

বিলাসী ॥ অত করে বনু পা চালিয়ে চল, আঁধারে কিছু ঠাওর হবেনি। শুন্‌লিনে। এখন বল্, কোন পথে যাই।

মোহিনী ॥ অচেনা ঠাঁই বলে মনে হয় মাসি।

বিলাসী ॥ থাক্ দাঁড়িয়ে হেথায়।

মোহিনী ॥ হেই মা চণ্ডী, পথ দেখিয়ে দাও মা। আমার ছেলেপুলেরা না খেয়ে রয়েছে।

[তাহাদের পিছনে একটি লে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার নাম হারাধন]

বিলাসী ॥ চাল আঁচলে রয়েছে, এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে কর ছেলেপুলেরা পেটভরে খাচ্ছে।

মোহিনী ॥ পথ দেখিয়ে দাও মা, পথ দেখিয়ে দাও।

হারাধন ॥ কোন্ পথ খুঁজছ তোমরা?

বিলাসী ॥ ঘুঘুড্যাঙার পথ গো!

হারাধন ॥ ঘুঘু কখনো দেখেছ?

বিলাসী ॥ কে রে মিন্সে এলো মস্করা করতে?

হারাধন ॥ আরে চট কেন? পথের সাথী তোমরা একটু হাসি-ঠাট্টাও করব না?

মোহিনী ॥ বলে দাও না বাছা কোন্ পথে যাব ঘুঘুড্যাঙায়?

হারাধন ॥ আঁচলে ও ঝুলছে কি?

মোহিনী ॥ ও সের খানেক চাল। তিনটে অবধি লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পেনু।

হারাধন ॥ পেলে তাহ'লে!

মোহিনী ॥ কাল পাইনি আজ পেনু।

বিলাসী ॥ কি বক্ বক্ করছিন্ অচেনা একটা মানুষের সঙ্গে।

হারাধন ॥ অচেনা বলছ কি গো! এই ত চিন-পরিচয় হয়ে গেল। তোমরাও চাল খোঁজ, আমিও চাল খুঁজি।

বিলাসী ॥ চাল খুঁজিস ত কনট্রোলে যা। আমাদের কাছে কি?

হারাধন ॥ তোমাদের কাছেই যে রয়েছে চাল।

মোহিনী ॥ এ ত আমরা আনলাম।

হারাধন ॥ এনেছ বেশ করেছ, এইবার ছেলের কোঁচড়ে ঢেলে দাও।

বিলাসী ॥ আমার ছেলেপুলে খাবে কি!

হারাধন ॥ আমিও ত চাইছি আমার ছেলেপুলের জন্যে। তারাও না খেয়ে রয়েছে।

মোহিনী ॥ তুমি পুরুষ মানুষ যা-হোক করে যোগাড় কর।

হারাধন ॥ এই তো যাহোক করেই যোগাড় করছি। দাও আঁচল খুলে ঢেলে দাও।

মোহিনী ॥ ও মাসি, এ বলে কি!

বিলাসী ॥ তখুনি বলেছিনু শহর-ঠাঁই, সন্ধ্যেয় গুণ্ডো বেরোয়। এখন পনু এই গুণ্ডোর হাতে।

হারাধন ॥ গুণ্ডো বল, ষণ্ডা বল, গরু বল, সব সইব—শুধু ওই চাল ক'টা ঢেলে দাও।

বিলাসী ॥ হ্যাঁ, দোব বৈকি! বাপের ঠাকুর এলে দোব না, তা তোকে দোব! দূর হ! দূর হ এখান থেকে!

হারাধন ॥ তবে রে মাগী!

আঁচলের চালের পুঁটুলী চাপিয়া ধরিল]

বিলাসী ॥ ওরে বাবা গো, মেরে ফেললে গো, ডাকাত গো! চাল কেড়ে নিলে গো!

হারাধন ॥ চুপ! চুপ! অমন করে চেঁচাসনে!

মোহিনী ॥ মা চণ্ডী রক্ষে কর! মা চণ্ডী রক্ষে কর!

[হারাধনের টানাটানিতে বিলাসীর আঁচলের গেরো খুলিয়া চাল পড়িয়া গেল]

বিলাসী ॥ পথে ছড়িয়ে দিলি!

হারাধন ॥ তুই আর চেঁচাসনে। আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি।

[বসিয়া কুড়াইতে লাগিল]

বিলাসী ॥ আমার ছেলেপুলেরা খাবে কি ?

[হারাধন মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল]

হারাধন ॥ তারা কি সত্যিই না খেয়ে আছে ?

বিলাসী ॥ সকালে কিছু খেতে পাবে না।

হারাধন ॥ আর আমার ছেলেমেয়েরা কাল সকাল থেকে কিছু খায়নি। আমি খালি হাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি। তাইত এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কোন্ পথে পা বাড়াব। তোমরা এলে, একটা উপায় হোলো। এই নিলাম সব কুড়িয়ে। এখন বাড়ি ফিরতে পারব।

বিলাসী ॥ ফেরাচ্ছি তোকে ঘাটের মড়া !

[বলিতে বলিতে একখানা ইঁট তুলিয়া লইয়া হারাধনের মাথায় মারিল]

হারাধন ॥ মেরে ফেল্লে রে ! মেরে ফেল্লে ! মেরে ফেল্লে !

[বলিয়া হারাধন মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল]

মোহিনী ॥ তুমি খুন করলে মাসি !

[মনোহর আগাইয়া আসিল]

মনোহর ॥ শহরের চৌরাস্তায় খুনো-খুনী করছ কারা হে তোমরা ?

মোহিনী ॥ হেই বাবু, চেয়ে ছাখ কি করতে কি হয়ে গেল !

মনোহর ॥ আরে ! তোমার মাথা দিয়ে যে রক্ত পড়ছে।

হারাধন ॥ অন্ধকারে গ্যাসপোস্টে ঘা লেগেছে বাবু ! রক্ত মাথায় উঠেছিল, বেরিয়ে যাচ্ছে।

মনোহর ॥ এখানে গ্যাসপোস্ট কোথায় ?

হারাধন ॥ যাও, যাও আর কৈফিয়ৎ চেয়ো না। আমরা জলচি আমাদের জালায়।

বিলাসী ॥ দেখি বাছা কোথায় লেগেছে।

[হারাধনের পাশে বসিল]

হারাধন ॥ আর একটু জোরে মারলে না কেন মাসি ? মরে বাঁচতাম।

মনোহর ॥ তোমরা মেয়েছেলে এখানে কি করছ ?

মোহিনী ॥ আমরা বাপু পথ চিনতে পারছি না।

মনোহর ॥ কোথায় যাবে ?

মোহিনী ॥ ঘুঘুড্যাঙায়।

মনোহর ॥ ঘুঘুড্যাঙায় যাবে তা এখানে এসেছ কেন ?

মোহিনী ॥ কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে ?

মনোহর ॥ ডাইনে এসে পড়েছ যেতে হবে বাঁয়ে।
মোহিনী ॥ ও মাসি শুনচিস।
বিলাসী ॥ শুনছি মা।
মোহিনী ॥ ওঠ, চল!
বিলাসী ॥ লোকটা যে উঠছে না! এ আমি কি করলাম রে মোহিনী!
মনোহর ॥ কি গো! তুমি অমন করে কেঁদে উঠলে কেন? হয়ত দু'তিন দিন না খেয়ে ছিল, চাল পেয়ে আনন্দে কাঁসি হারিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, খেল গ্যাসপোস্টে ধাক্কা, ঠিকরে এসে পলো এখানে। যেমন পলো তেমনিই মলো। এম্নি রোজই ওরা মরে।
বিলাসী ॥ ওকি! তুমি চাল কুড়িয়ে নিচ্ছ কেন?
মনোহর ॥ রক্তমাখা বলছ? তা হোক্। ওকে ত বাঁচাতে পারব না, চালগুলো রেখে দিলে অপর কাউকে বাঁচতে পারব।
বিলাসী ॥ তুমি বলচ কি!
মনোহর ॥ বাছা ঘুঘুড্যাঙায় যাবে ত বাঁদিকে সোজা চলে যাও। বাড়ি পৌছুতে রাত ভোর হয়ে যাবে।
বিলাসী ॥ তা আমার চাল দিয়ে দাও।
মনোহর ॥ মরা লোকে কথা কয় না জেনে চাল দাবী করছ। কিন্তু জেনো, মিছে কথা বললে ভূতে ঘাড় ভাঙবে!
মোহিনী ॥ চলে আয় মাসি, চলে আয়। আমার এই চালের আধা ভাগ তোকে দোব।
মনোহর ॥ তোমার কাছেও চাল আছে নাকি!
মোহিনী ॥ সের খানেক পেয়েছি আজ।
মনোহর ॥ দিয়ে যাও।
মোহিনী ॥ বাঃ রে! তোমাকে দেব কেন?
মনোহর ॥ দেবে আমি চাইছি বলে।
মোহিনী ॥ তোমাকে ভয় কি? তুমি ত গুণ্ডো নও, ভদ্দর লোক।
মনোহর ॥ ভুল করছ হে।
মোহিনী ॥ গায়ে জামা, পায়ে জুতো, ভুল কেন করব? হেই মাসি, ওঠ্, চল্।
বিলাসী ॥ কিন্তু এ লোকটা যে ওঠেও না, নড়েও না।
মনোহর ॥ দাও গো দাও, চালগুলো দিয়ে দাও, নইলে পুলিস হাঙ্গামায় পড়বে।

মোহিনী ॥ না, বাবা পুলুস ডেকোনি বাবা, পুলুস ডেকোনি। মাসির দোষ নেই, আমারও দোষ নেই।

মনোহর ॥ চাল দাও। সব দোষ ঢাকা পড়বে।

মোহিনী ॥ এই নাও বাবু। দু'দিনের চেষ্টায় যোগাড় করেছিলাম। তোমাকেই ঢেলে দিলাম।

[মনোহর থলে ধরিল, মোহিনী তাহার আঁচলের চাল তাহাতে ঢালিয়া দিল এবং বলিল]

চলে আয় মাসি।

[হারাধন মুখ তুলিয়া চাহিল]

হারাধন ॥ একটু দাঁড়াও মাসি।

বিলাসী ॥ এই যে বাছা আমার কথা কয়েছ।

হারাধন ॥ দাঁড়াও মাসি, একটু দাঁড়াও।

[অতি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। টলিতে টলিতে মনোহরের কাছে গিয়া কহিল]

এই বাবু, ওদের চাল দিয়ে দাও।

মনোহর ॥ কাদের চাল ?

হারাধন ॥ এই মেয়েছেলে দুটোর।

মনোহর ॥ মাইরি আর কি ! আপিস থেকে আমি রেশন নিয়ে এলাম।

হারাধন ॥ চোট্টা শালা। দে ওদের চাল ফিরিয়ে।

[মনোহরের জামার কলার চাপিয়া ধরিল]

বিলাসী ॥ না বাবা, তুমি আর ঐ নিয়ে মারধোর করতে যেওনি। বড় দুব্‌লা হয়ে পড়েচ !

মোহিনী ॥ তুই চলে আয় মাসি, ওরা মরুক মারামারি করে।

মনোহর ॥ এই জামা ছিঁড়ে যাবে, ছেড়ে দে বলছি।

হারাধন ॥ তুই শালা আগে চাল ফিরিয়ে দে !

মনোহর ॥ মাতলামো করবার আর যায়গা পাওনি।

হারাধন ॥ মাতলামো করতে হলে মদ খেতে হয়। ভাত জোটে না, মদ খেয়ে মাতলামো করব ! দাও ওদের চাল।

মনোহর ॥ দাঁড়াও আগে তোমাকে চালান দি, তারপর ওদের চাল দোব।

[মুখে আঙ্গুল দিয়া সিটি দিল]

হারাধন ॥ পুলিস ডাকচ ?

মোহিনী ॥ তুই কি যাবিনি মাসি ?

বিলাসী ॥ বাছা, তুমি উঠে দাঁড়িয়েচ, এইবার আমরা চললাম। চাল

আমাদের ছেলেমেয়েদের ভোগে লাগল না, পার ত তোমার ছেলে-মেয়েদের মুখে তুলে দিয়ো। বললে, কাল সকাল থেকে তারা না খেয়ে রয়েছে!

হারাধন ॥ দাঁড়াও না মাসি, একটুখানি দাঁড়াও না।

[অন্ধকার হইতে দু'টি লোক বাহির হইয়া আসিল, কানাই আর পরেশ]

কানাই ॥ সংকেতি-সিটি কে দিলিরে।

মনোহর ॥ এদিকে আয়রে কানাই।

কানাই ॥ কিরে মোনা?

মনোহর ॥ আরে দ্যাখনা ভাই, একশালা মাতালের পাল্লায় পড়িচি। আপিস থেকে চাল নিয়ে চলিচি, আর ও বলে কিনা ও-চাল ওই মেয়ে দুটোর।

পরেশ ॥ মার না শালাকে!

হারাধন ॥ তোমরা ভদ্দরলোক, আমার কথা শুনবে না। এই মেয়েছেলে, দু'টি চাল নিয়ে যাচ্ছিল···

বিলাসী ॥ না বাবারা আমাদের চাল নয়।

মনোহর ॥ শুনলিরে শালা!

কানাই ॥ মার শালাকে! একদম মেরে ফ্যাল্।

[হারাধনকে ঘুসি মারিল। হারাধন পড়িয়া গেল]

পরেশ ॥ মেরে ফেললি নাকিরে!

কানাই ॥ ধুপ করে পড়ে গ্যাল ধুমসো ব্যাটা। গায়ে এতটুকু জোর নেই!

মনোহর ॥ হয়ত ক'দিন না খেয়ে আছে।

কানাই ॥ চল্ সরে পড়ি।

মনোহর ॥ দূর দূর সরে পড়তেই বা হবে কেন? সবাই বুঝবে পথে যখন পড়ে আছে, না খেয়েই মরেছে নির্ঘাৎ। এখন কার গোয়ালে কেই বা ধোঁয়া দেয়।

পরেশ ॥ তাহ'লে মোনা, চালটা এবার ছাড় ভাই।

মনেহর ॥ ছাড়ব বলেই ত ধরিচি। কত দিবি বল।

পরেশ ॥ আছে কত।

মনোহর ॥ সের দুই।

পরেশ ॥ কনট্রোলের দরে ছেড়ে দে।

মনোহর ॥ খুব যে দরাজ হাত তোর!

পরেশ ॥ দিয়ে দে ভাই, ঘরে আজ চাল নেই।

মনোহর ॥ তাহ'লে দর বাড়া। শ্রীমন্ত সাধুখাঁ শুনলাম কনট্রোলের দরের ওপর দু'আনা বেশি ধরে দিচ্ছে। তাকেই দিয়ে আসব।

পরেশ ॥ শ্রীমন্ত সাধুখাঁর বয়ে গেছে দু'সের চাল কিনতে।

মনোহর ॥ তাই নাকি!

পরেশ ॥ কি বলিসরে কানাই?

কানাই ॥ আরে দু'সের করেই যে দু'দশ মণ হয়ে যায়। আজ সকালে পাড়ার পাঁচটা ছোঁড়াকে টিকিট দিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম, সবাইকে বিড়ি খেতে দিলাম একটা করে পয়সা, আর এক পয়সা দিলাম ফুলুরি কিনতে—এই ছাখ থলেয় আমার পাঁচ সের চাল!

পরেশ ॥ আমায় ওথেকে দু'সের দে না ভাই। চাল না নিয়ে আমার ঘরে ফেরা দায় হবে।

কানাই ॥ মাপ করতে হচ্ছে। শ্রীমন্ত সাধুখাঁর সরকারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, পাড়ার ছেলেদের দিয়ে এমনি যত চাল আমি কনট্রোল থেকে যোগাড় করব, সব সে কিনে নেবে সের পিছু দশ পয়সা বেশি দিয়ে।

পরেশ ॥ আরে আমি যে চাইছি নিজের বাড়ির জন্যে।

কানাই ॥ তা ঐ মোনার ঠেঁয়ে নিয়ে যা।

পরেশ ॥ ও শালাও যে মুনাফা ছাড়া দিতে চায় না।

কানাই ॥ কেন দেবে? এই যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা মুনাফা করবে না!

পরেশ ॥ তোরা বন্ধুলোক মুনাফা খাবি?

মনোহর ॥ ওরে শালা, ভাই বন্ধু এখন কিছুই নেই। তুই যেদিন বাগে পাবি, নিস্ আমার ঘাড় ভেঙে। দেখিস্ আমি কথাটিও কইব না।

পরেশ ॥ শোন্ শালার যুক্তি।

কানাই ॥ যা, যা, বক্ বক্ করিসনে।

[পরেশ খপ করিয়া মনোহরের হাত চাপিয়া ধরিল]

পরেশ ॥ দে শালা চাল দে।

কানাই ॥ ছেড়ে দে পরেশ, মোনার হাত ছেড়ে দে বলছি। দলের লোক হয়ে কেন মার খাবি?

পরেশ ॥ আমি আর তোদের দলের নই। ঘরে চাল নেই, দলের লোক ব'লে তোদের যদি দরদ না থাকে, চাই না দলে থাকতে। ধরিচি যখন চাল আমি নোবই।

মনোহর ॥ চাল তুই নিবিই!

পরেশ ॥ নোবই।

[ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিল]

মোহিনী ॥ তুই কি আজ যাবিনি মাসি ?

বিলাসী ॥ উঠতে পারচি না মা। আমার মাথা ঘুরচে।

মোহিনী ॥ ক্ষিধেয় ?

বিলাসী ॥ না মা ক্ষিধে কোথায় ? ভাবছি, কেন মরতে এয়েছিলাম কনট্রোলে। এক সের চেলের লেগে এই মারামারি কাটাকাটি !

পরেশ ॥ তুই আমায় মারলি কানাই।

পরেশ ॥ ও চাল আমি নোবই।

কানাই ॥ দে মোনার চাল ছেড়ে।

[একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নাম চাটুজ্যেমশাই]

চাটুজ্যে ॥ এই যে বাবা পরেশ। গলা পেয়ে ছুটে এলাম। দাও বাবা চাল দাও। গিন্নি হাঁড়িতে জল চাপিয়ে বসে আছে বাবা।

পরেশ ॥ শালারা যে দিতে চায় না চাটুজ্যেমশাই।

চাটুজ্যে ॥ দিয়ে দাও বাবারা, দিয়ে দাও। এক আনা করে বেশি ধরে দোব। পরেশকে রোজ তাই দি।

মনোহর ॥ এই শালা পরেশ ! তুই যে বললি চাল তোর নিজের বাড়ির জন্যে দরকার ?

চাটুজ্যে ॥ তা বাবা আমার বাড়ি ওর নিজেরই বাড়ি। আমার মিনু যে পরেশ-দা বলতে অজ্ঞান !

কানাই ॥ দে মোনা, চাটুজ্যে মশাইকে চাল দিয়ে দে।

মনোহর ॥ কনট্রোলের দরের ওপর দু' আনা বেশি দিতে হবে !

চাটুজ্যে ॥ মরে যাব বাবারা, মরে যাব। সের প্রতি সাত আনা দোব, পরেশকে যা দিয়ে থাকি !

মনোহর ॥ সাড়ে সাত আনা দিন।

চাটুজ্যে ॥ কেন, সাড়ে সাত আনা কেন ? হকের পয়সা বেহক যাবে।

মনোহর ॥ না দেবেন ত সরে পড়ুন।

চাটুজ্যে ॥ পড়লাম আর কি সরে ! এ-আর-পিডা কব না ? পুলিস ডাকব না ?

কানাই ॥ শুনুন শুনুন, চাটুজ্যেমশাই। আর দুটো করে পয়সা ধরে দিন।

চাটুজ্যে ॥ এক পয়সাও না।

কানাই ॥ এই শালা মোনা !

[মনোহরকে টানিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া চাপা গলায় কহিল]

চাটুজ্যেকে ঘাঁটাসনি। দিয়ে দে। আর তুই ত শালা দাম দিয়ে কিনিসনি।

মনোহর ॥ বন্ধুলোক বলছিস। দিই দিয়ে।

কানাই ॥ নিন চাটুজ্যেমশাই।

চাটুজ্যে ॥ দেবেই ত! সোনার ছেলে তোমরা বাবারা। তোমরা থাকতে কি পাড়ার লোক আমরা না খেয়ে মরব? কাঁকর মেশানো নেই ত বাবা! একি হ্যা? চাল যেন ভিজে মনে হচ্ছে।

মনোহর ॥ ও কিছু নাঃ! ছটাক কয়েক রক্ত হয়ত পড়েছিল।

চাটুজ্যে ॥ রক্ত বলছ কি হে!

মনোহর ॥ আরে মশাই আপনার ত লাভ হয়ে গেল! টাটকা রক্তে যা ফল হবে মাছ মাংসে তা হোত না। এক সঙ্গে আহার আর ওষুধ দুই-ই।

কানাই ॥ বেশ বলিচিসরে শালা। নিয়ে যান চাটুজ্যেমশাই, নিয়ে যান।

চাটুজ্যে ॥ কিসের রক্ত তা না জেনে…

[আঁধার হইতে হারাধন অতি কষ্টে কহিল]

হারাধন ॥ গোরক্তও বলতে পার কত্তা।

চাটুজ্যে ॥ গোরক্ত! নারায়ণ! নারায়ণ!

হারাধন ॥ গোরক্ত হারাম হলে, শেয়াল-কুকুরেরও ভাবতে পার।

চাটুজ্যে ॥ আঁধারে থেকে তুমি কে কি বলছ হে!

হারাধন ॥ আজ্ঞে ঠিকই বলচি কত্তা, তোমরাই বোঝ না মানুষ, গরু, শেয়াল, কুকুর সব আজ একাকার। কিছু তফাৎ নেই।

মনোহর ॥ শালা মরছে তবু বুকনি ঝাড়তে ছাড়চে না।

কানাই ॥ চল্ শালার থোতা মুখ ভোঁতা করে দি!

[ক্যাঁচর করিয়া মোটর ব্রেকের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে হেঁই হেঁই শব্দ]

পরেশ ॥ মোলো ব্যাটা মোটরের তলে।

কানাই ॥ চলে আয় মোনা, চলে আয় পরেশ, মোটরওয়ালাকে ধরি।

[মোটরের মালিক তখন নামিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নাম ধনেশবাবু]

ধনেশ ॥ একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তায় পায়ে পায়ে লোক শুয়ে থাকবে।

কানাই ॥ তাই বলে লোকগুলোকে আপনি মোটর চাপা দিয়ে মেরে ফেলবেন?

ধনেশ ॥ ও ত মরেই পড়ে ছিল!

মনোহর ॥ মরেই পড়ে ছিল!

ধনেশ ॥ ছিল না? চোখ চেয়ে পথ চল যদি, দেখবে খেতে না পেয়ে যেখানে সেখানে লোক মরে পড়ে আছে।

কানাই ॥ পথ চলে চলে আমাদের পা ক্ষয়ে গেল, আর আপনি মোটর থেকে মাটিতে পা দিয়েই বলছেন পথের খবর আমরা রাখি না!

ধনেশ ॥ থাম থাম ছোকরা, জ্যাঠামো করো না। স্টার্ট দাও ড্রাইভার।

পরেশ ॥ স্টার্ট দেবে কি মশাই! লোকটার কোন ব্যবস্থা করবেন না?

ধনেশ ॥ এই ছ্যাখ, কিচ্ছু তোমরা জান না। পথের মড়া ঘাটের মড়া নয় যে চট করে চিতেয় চাপিয়ে দেওয়া যায়। থানায় খবর যাবে, ডাক্তারি পরীক্ষা হবে, গবর্নমেণ্টে রিপোর্ট যাবে লোকটা ক'দিন না খেয়ে ছিল, কতটুকু ফ্যাট প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট পেটে থাকলে ও মরত না—তারপর ত হবে ওর সংকারের ব্যবস্থা। তুমি ছেলেমানুষ, এ-সবের বোঝ কি!

[চাটুজ্যেমশায় আগাইয়া আসিয়া কহিলেন]

চাটুজ্যে ॥ ছেলে-ছোকরা ওরা হয়ত বোঝে না। কিন্তু আমাকে বাজে ধাপ্পায় ভোলাতে পারবে না। চল থানায় চল!

ধনেশ ॥ কেন, থানায় যাব কেন?

চাটুজ্যে ॥ শুধু খবরটা দেব যে, চৌরাস্তায় একটা লোক না খেয়ে মরে আছে।

ধনেশ ॥ খবর দিতে হয় আপনারাই যান। জলদি চলো ড্রাইভার! বাড়ী পৌঁছেই আবার ভবেশকে পাঠাতে হবে শ্রীমন্ত সাধুখাঁর দোকানে।

কানাই ॥ শ্রীমন্ত সাধুখাঁর দোকানে কি হচ্ছে মশাই?

ধনেশ ॥ কি হচ্ছে?

মনোহর ॥ মহোচ্ছব হচ্ছে নাকি?

ধনেশ ॥ গোলমাল না করে এখুনি যদি আমায় যেতে দাও, খবরটা তোমাদের দিয়ে যাই।

পরেশ ॥ বলুন মশাই। শ্রীমন্ত সাধুখাঁর সঙ্গে আমাদের কারবার আছে।

ধনেশ ॥ কারবার আছে ত এখানে দাঁড়িয়ে জটলা করচ কেন? গুদোম যে সে সাবাড় করছে।

কানাই ॥ শ্রীমন্ত সাধুখাঁ!

ধনেশ ॥ কারবারি লোক সে ! চালের দাম বেঁধে দেওয়া হবে শুনেই চাল সে ছেড়ে দিচ্ছে।

কানাই ॥ আপনি নিয়ে এলেন নাকি !

ধনেশ ॥ ছ'বস্তা আনলাম বৈকি ! বাড়ি গিয়ে গাড়ী দিয়ে ভবেশকে পাঠাব। ভবেশ ফিরে গিয়ে রমেশকে পাঠাবে ; রমেশের পর নরেশ, নরেশের পর সুরেশ, সুরেশের পর দ্বিজেশ। বাস্ সেই শেষ !

চাটুজ্যে ॥ মহাশয়ের নাম।

ধনেশ ॥ ধনেশ। ছ'ভাই রাতারাতি ছ'বস্তা করে নিলে বারো ছগুণে চব্বিশ মণ। ঘরে পুরতে পারলে জাপানী হাঙ্গামাটা কাটিতে দেওয়া যাবে। দাও দাদারা এবার আমাকে যেতে দাও।

কানাই ॥ কিন্তু আপনার ছ'বস্তা চাল ?

ধনেশ ॥ দেখছ না ক্যারিয়ারে বাঁধা আছে।

কানাই ॥ এই মোনা, গাড়ী আটক কর। পরেশ, চাটুজ্যেমশাইকে নিয়ে ক্যারিয়ার থেকে বস্তা খুলে নামা। আমি এই থান ইট নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবুর কাছে—পালাতে চাইবে কি চেঁচাবে, দোব মাথা ফাঁক করে।

ধনেশ ॥ তোমরা ডাকাতি করবে না কি !

কানাই ॥ ডাকাতি কি ! পাড়ার ভেতর দিয়ে চাল নিয়ে চলে যাবেন ? চালাকি পেয়েছেন ? খুলছিস রে শালা পরেশ।

পরেশ ॥ খুলছি রে শালা।

কানাই ॥ মোনা, ড্রাইভার শালা যেন না স্টিয়ারিঙে হাত লাগায়।

ধনেশ ॥ জোর করে তোমরা চাল নেবে ?

কানাই ॥ নইলে আমাদের ফ্রী-কিচেন চলবে কি করে ?

ধনেশ ॥ ফ্রী-কিচেন ! তোমরাও আবার ফ্রী-কিচেন করেছ নাকি ?

কানাই ॥ আমাদের ফ্রী-কিচেন আজকার নয়, অনেক দিনের।—চাকরি বাকরি কস্মিনকালেও করি না, কিন্তু নিত্য তিন বেলা হাঁড়ি চড়ে। বনিয়াদী ফ্রী-কিচেন। নামিয়েছিস রে বস্তা !

পরেশ ॥ হ্যাঁ রে শালা, নামিয়েছি !

কানাই ॥ এই ড্রাইভার, গাড়ী ঘুরিয়ে খালের ধার দিয়ে চলে যাও। উঠুন মশাই, অনেকক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে আছেন, গাড়ীতে উঠুন।

ধনেশ ॥ থানায় চল ড্রাইভার।

কানাই ॥ যাবেন না, যাবেন না। বিপদে পড়বেন। আপনার গাড়ীর নম্বর আমি টুকে নিয়েছি। ক্রিমিন্যাল ঠুকে দেবো। মানুষ চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছেন। সাক্ষী আমরা আর ওই মেয়ে-ছেলে দুটি, ওদেরি পথের সাথী।

ধনেশ ॥ ড্রাইভার খাল ধার দিয়েই শ্রীমন্ত সাধুখাঁর দোকানে চল বাবা। ডাকাতি, রাহাজানি যাই হোক, চাল নিয়ে বাড়ি ফিরতেই হবে।

[মোটরের হর্নের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল]

কানাই ॥ রাতের আয়টা মন্দ হোলো না; চাটুজ্যেমশাই কতটা নেবেন? নগদ টাকা দিতে হবে মনে রাখবেন কিন্তু।

চাটুজ্যে ॥ টাকা কি হে! আমিও যে হাত লাগালাম। আমার বখরা?

কানাই ॥ এ কারবারে আমরা বখরাদার রাখিনে।

মনোহর ॥ এই কানাই, তর্ক করে সময় নষ্ট করিসনি, লোকজন এসে পড়বে।

পরেশ ॥ আড্ডায় নিয়ে চল্। ভাগ-বাঁটোয়ারা সেখানেই হবে।

কানাই ॥ তুই শালা চাটুজ্যেমশাইয়ের মিস্থর জন্যে বখরা আদায় করে ছাড়বি ত?

পরেশ ॥ তা চাটুজ্যেমশাই হাত লাগিয়েছিলেন ত।

চাটুজ্যে ॥ বোঝ বাবা, এই বুড়ো বয়েসে—শুধু দু'মুঠো চালের জন্যে।

মনোহর ॥ আর খুব জোর গলায় লোকটাকে ধমকেও দিয়েছিলেন।

চাটুজ্যে ॥ বল, বাবা, বল। লোকটা কেমন ভড়কে গেল।

কানাই ॥ চলুন চাটুজ্যেমশাই, বখরা আপনিও পাবেন।

চাটুজ্যে ॥ তোমাদের জয়জয়কার হোক্ বাবা, জয়জয়কার হোক্।

কানাই ॥ ওরে মোনা, চাল যখন পাওয়া গেল, তখন একটা ভালো কাজ করেই যা। মেয়েছেলে দুটোকে তাদের চালগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যা।

পরেশ ॥ সারারাত ওইখানে পড়ে রয়েচে।

মনোহর ॥ চাটুজ্যেমশাই, এই নিন আপনার পয়সা; দিন চাল ফিরিয়ে।

চাটুজ্যে ॥ নাও বাবারা, রক্তমাখা এই চাল।

কানাই ॥ মোনা, শিগ্গির দিয়ে আয় চালগুলো ফিরিয়ে, তারপর বস্তাগুলো ধর। আসুন চাটুজ্যেমশাই, আয় রে পরেশ। তোমরা কে হে? পথ রুখে দাঁড়িয়েছ?

উত্তম ॥ আমরা সিভিক গার্ড।

কানাই ॥ আমাদের বস্তা নিচ্ছ কেন?

উত্তম ॥ আমরা নিয়েই থাকি।
পরেশ ॥ খুব যে নবাবের মতো কথা কইছ।
মধ্যম ॥ আমরা কয়েই থাকি।
কানাই ॥ বাঃ রে বস্তা ঠ্যালায় তুলচ কেন ?
উত্তম ॥ কনট্রোলে নিয়ে যাব। চাল চাও যদি, লাইনে গিয়ে দাঁড়াও।
কানাই ॥ তুমি ত আচ্ছা লোক হে! আমাদের কেনা চাল তোমরা জোর করে নিয়ে যাবে কনট্রোলে!
উত্তম ॥ বস্তা ত কনট্রোলে যাবেই, বেশী বাড়াবাড়ি করলে তোমাদের নিয়ে যাব থানায়।
কানাই ॥ খুব যে লম্বা লম্বা কথা কইছ। তোমার নাম কি ?
উত্তম ॥ উত্তম সরকার।
মধ্যম ॥ আর আমি মধ্যম মালো।
পরেশ ॥ দে রে কানু, ব্যাটাদের উত্তম-মধ্যম দিয়ে দে।
উত্তম ॥ সে কিন্তু বে-আইনী কাজ!
কানাই ॥ আমাদের কেনা চাল নিয়ে যেতে চাও কোন্ আইনের জোরে ?
মধ্যম ॥ শোন হে। চাল যে তোমাদের কেনা নয়, তা আমরা জানি।
কানাই ॥ তোমারই নাম না বললে মধ্যম মালো ?
মধ্যম ॥ হ্যাঁ।
কানাই ॥ তাই ঐ কথা তুমিই বললে।
মধ্যম ॥ খুব ভালো প্রস্তাব করিচি ভাই। একটু সরে এসে শোন।

[মনোহর ফিরিয়া আসিল]

মনোহর ॥ দিয়ে এলাম মেয়েছেলে দুটোকে তাদের চাল ফিরিয়ে। বসে থেকে হয়রান হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। সাড়া দিলে না! তাই থলেটাই রেখে এলাম।
পরেশ ॥ মরে যায়নি ত রে!
মনোহর ॥ তাও যেতে পারে।
পরেশ ॥ ওরে এত রাতে এ-দিকে-মড়া, ও-দিকে মড়া—শহর কি শ্মশান হয়ে গেল!
মনোহর ॥ চাটুজ্যেমশাই!
চাটুজ্যে ॥ কে বাবা!

মনোহর ॥ পৈতে আছে আপনার। আমাদের ছুঁয়ে দাঁড়ান। ওরে শালা কানু তোদের পরামর্শ শেষ হোল ?

কানাই ॥ এই ! এই ! ঠ্যালা নিয়ে ছুটে চলেছে যে !

উত্তম ॥ এই ঠ্যালাওলা ! থামকে ! থামকে রে শালা !

মনোহর ॥ আমাদের বস্তা নিয়ে যায় যে রে।

কানাই ॥ চোর ! চোর ! পাকড়ো ! উত্তম-মধ্যম সিভিকরা ছুটে চল দাদারা, হাতে তোমাদের ব্যাটম আছে। আয় মোনা, আয়রে পরেশ, চাটুজ্যে-মশাই আসুন।

চাটুজ্যে ॥ যেয়োনি বাবা পরেশ। এখুনি পুলিস আসবে, মারধর চলবে।

পরেশ ॥ চেয়ে দ্যাখরে মোনা। কালো কালো মানুষের সারি পিল পিল করে ঠ্যালা ঘিরে দাঁড়িয়েচে।

[দূরে অস্ফুট কোলাহল]

ওই দ্যাখ রে মোনা, ঠ্যালাওলারা বস্তার মুখ খুলে আঁজলা ভরে চাল তুলে তুলে ওদের বিলিয়ে দিচ্ছে। জয় হোক্ ওদের, জয় হোক্।

মনোহর ॥ তুই কি পাগল হয়ে গেলি রে পরেশ !

পরেশ ॥ চ্যাঁচানারে শালা।

[দূরে ঘন ঘন পুলিসের বাঁশী]

মনোহর ॥ এইরে পুলিস এসে পড়েছে। ব্যাটা মলো এইবার।

চাটুজ্যে ॥ পালিয়ে আয় বাবা পরেশ। পালিয়ে আয় আমার মিন্টু যে পরেশ-দা বলতে অজ্ঞান।

পরেশ ॥ পালিয়ে আর রে মোনা।

মনোহর ॥ ওই মেয়েছেলে দুটোর কাছ থেকে চালের থলেটা নিয়ে যাব না ?

পরেশ ॥ ওরে শালা ! ধরা পড়বি, মারা পড়বি। পালিয়ে চল, আসুন চাটুজ্যেমশাই !

[তাহারা চলিয়া গেল। দূরে কোলাহল চলিতে লাগিল]

মোহিনী ॥ মাসি, ফর্সা হয়ে এল।

বিলাসী ॥ হ্যাঁ, ফর্সা হয়ে এল।

মোহিনী ॥ চল বাড়ি যাবি।

বিলাসী ॥ যাবার ডাকও শুনতে পাচ্ছি।

মোহিনা ॥ মিন্সেগুলো আমাদের চাল ফিরিয়ে দিয়ে গেছে মাসি।

বিলাসী ॥ তাদের ভালো হোক্।

মোহিনী ॥ চল তবে উঠি !

বিলাসী ॥ তুই আমায় নিয়ে যেতে পারবি ?

মোহিনী ॥ ফেলে যাই কেমন করে ?

[বিলাসী খানিকটা উঠিয়া বসিল]

বিলাসী ॥ ওটা কি রে ! ওইখানে পড়ে।

মোহিনী ॥ সেই মানুষটা, যার মাথায় তুই ইঁট মেরেছিলি।

বিলাসী ॥ কেন মেরেছিলাম রে !

মোহিনী ॥ চাল কেড়ে নিতে চেয়েছিল যে।

বিলাসী ॥ বলেছিল কাল সকাল থেকে ওর ছেলেপুলে না খেয়ে আছে।

মোহিনী ॥ সে মিছে কথা।

বিলাসী ॥ মিছে কথা খামোকা কেনই বা কইবে। চলত ওর কাছে।

মোহিনী ॥ চল। আবার যেন না মাথায় ইঁট মারিস। এখন ফর্সা হয়ে গেছে। লোকজনে দেখে ফেলবে।

বিলাসী ॥ না, না, ইঁট মারবার জোর আর নেই।

মোহিনী ॥ তোর পা কাঁপছে। তুই আর চলতে পারবি নে।

বিলাসী ॥ ওইটুকু পারব।

মোহিনী ॥ তোকে বাড়ি নিয়ে যাব কেমন করে ?

বিলাসী ॥ যাবার সময় হলে নিয়ে যাবার লোক হাজির হবে। শুনিসনি, সময়ে তারা দেখা দেয় ? এই যে বাছা এইখানেই পড়ে রয়েছে। ওরে মোহিনী !

মোহিনী ॥ কি হোলো মাসি ?

বিলাসী ॥ এ যে আমার কামারপাড়ার বোন-পো হারাধন ! হারাধন, বাবা, আঁধারে ঠাহর করতে না পেরে, এই সর্বনাশ আমি করিচি। ওঠ বাবা, ওঠ। চাল নিয়ে ঘরে যা ! হারাধন ! হারাধন !

[অতিকষ্টে চোখ মেলিয়া হারাধন কহিল]

হারাধন ॥ কে ?

বিলাসী ॥ আমি তোমার মাসি বাবা।

হারাধন ॥ মাসি ! কি বলছ মাসি ?

বিলাসী ॥ চাল নিয়ে ঘরে যা বাবা।

হারাধন ॥ চাল ? দেখি চাল কেমন !

[কম্পিত হাত বাড়াইয়া দিল। বিলাসীও কম্পিত হস্তে থলি হইতে একমুঠো চাল তুলিয়া তাহার হাতে দিল। হারাধন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেই চাল দেখিতে লাগিল। নবোদিত সূর্যের রশ্মি আসিয়া তাহার মুখে পড়িল। তাহার কম্পিত হাত হইতে চাল গলিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল। তিন চারিটি লোক দৌড়াইয়া আসিল, একজন কহিল]

প্রথম ॥ এই যে এখানে একথলে চোরাই চাল নিয়ে এরা বসে আছে।

দ্বিতীয় ॥ পাকড়ো, পাকড়ো, পুলিসে দাও, পুলিসে দাও!

বিলাসী ॥ নিয়ে যাবার লোক এসেছে মোহিনী, তোকে আর বোঝা বইতে হবে না।

[লোক তিনটি তিনজনকে ধরিল, কিন্তু দেখিল দুইজন তাহাদের হাতেই ঢলিয়া পড়িল—বিলাসী আর হারাধন। মোহিনী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাছের একটা দোকানে লাউডস্পীকার রেডিও যন্ত্রে ধ্বনিয়া উঠিল]

বেতার বাণী ॥ সার এডওয়ার্ড বেন্থল আশ্বাস দিয়েছেন, এখন হইতে প্রতিদিন কলিকাতায় ৯১০ ওয়াগন ভরতি খাদ্য আমদানী হইবে। উহার ফলে ত্রিশ লক্ষেরও অধিক লোক প্রত্যহ দুই বেলায় আড়াই পাউণ্ড পুষ্টিকর খাদ্য উদরস্থ করিবার সুযোগ পাইবে; তাহা ছাড়া সুজলা সুফলা দেশমাতৃকার বুকের দান ত আছেই। সুতরাং অন্নাভাব কল্পনা করিয়া কেহ যেন না দুঃখকে বরণ করিয়া লন।

একজন ॥ আহা! মরবার আগে যদি এরা কথাগুলো শুনতে পেত, খুসি হয়ে মরতে পারত!

[যাহারা চোরাই চালসহ চোর ধরিতে আসিয়াছিল তাহারা বিলাসীর আর হারাধনের প্রাণহীন দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। ট্রাম, বাস, লরী, গাড়ীর শব্দে রাজধানীর রাস্তায় জীবনের সাড়া জাগিল।]

দেবী

তুলসী লাহিড়ী

[স্থান—সোনাবাঁক ডাকবাংলোর বারান্দা। কাল—সন্ধ্যা। ঐ বাংলোতে রাত্রি বাসের জন্য উঠেছেন খুদিয়া কয়লাখাদের ম্যানেজার নিতাই বাবু। বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বিশ্রাম করছেন এবং বন্দুকটি নাড়াচাড়া করছেন।]

নিতাই ॥ চৌকীদার!

[নেপথ্য থেকে উত্তর এল "যাচ্ছি সাহেব"]

অন্ধকার হয়ে এল যে। আলো নিয়ে এস।

[এক হাতে লণ্ঠন অপর হাতে একটা টাঙ্গি নিয়ে প্রবেশ করল ডাকবাংলোর চৌকীদার গোবর্ধন। চেহারা শক্ত পোক্ত, রং মিশ্ কালো। লণ্ঠনটি বারান্দায় রেখে ঘরের দিকে এগোতেই নিতাই বাবু বললেন।]

কি হে কোথায় যাচ্ছ?

গোবরা ॥ আঁইগা কামরার বাতিটো জ্বাইলে দিব।

নিতাই ॥ তাও ভাল। টাঙ্গি হাতে করে যে রকম রোয়াব করে চলেছ।

গোবরা ॥ [লজ্জিত ভাবে] আঁইগা! দেবী আইসেছেন—চাইর দিনে তিন জনকে লিয়েছেন। কাইল্ সইন্ধার সময় হাঁই সাঁওতাল ঘরের একটো ছেইলাকে টাইনে লিছিলেন। তা উয়ারা সোর গোল কইরে ভালা টাঙ্গি কাঁড় লিয়ে বিরাইল। যখ্মী ছেইলাটো লিয়ে আজ হাজারীবাগ গেঁইছে উয়ারা।

নিতাই ॥ দেবীটি কে?

গোবরা ॥ বাঘ বটে। বাঘিন্।

নিতাই ॥ ও! তাই দেবী বলছ। তা বাঘিন জানলে কি করে?

গোবরা ॥ আঁইগা ডাক শুইনে বুইঝ্তে পারি যে। যে ডাক ডাইক্ছে এখন দ্যাব্তা দু'চাইর দিনে আইস্বেক্।

নিতাই ॥ তা ত হল। এখন আমাদের দেবতাটি যে এসে পৌছালেন না, তার কি হবে।
গোবরা ॥ কে দ্যাব্তা বটে ?
নিতাই ॥ আরে তোমাদের ছোট পুলিশ সাহেব। সন্ধ্যার আগেই পৌছে যাবেন কথা ছিল।
গোবরা ॥ কোনও কাজে ফাঁইসেছেন বটে।
নিতাই ॥ তাতো ফাঁইসেছেন—এখন খাওয়া দাওয়ার কি হবে? তিনি খাবার আনবেন কথা ছিল।
গোবরা ॥ হুজুর বইল্লেন খাবেন নাই!
নিতাই ॥ তা ত বলেছিলাম। কিন্তু এখন কিছু খেতে ত হবে? মুরগী টুরগী কিছু যোগাড় কর।
গোবরা ॥ দিনে বইল্লে সব হইত আঁইগা। রাইত্ হয়ে গেল যে!
নিতাই ॥ লণ্ঠনটি নিয়ে টাঙ্গি কাঁধে করে বীর পদভরে চলে যাও।
গোবরা ॥ টিলা হইতে লাইম্‌তে হবেক্ যে, শাল বনের ভিতর দিয়ে।
নিতাই ॥ এমন ভীমের মত চেহারা আর তুমি এমন ভীতু হে!
গোবরা ॥ জোওয়ান কি হবেক্ হুজুর। দ্যাব্তার সাথে পাইর্‌বার যোটি নাই যে—কুথা হইতে আইসে এক ঝাপটে পাটাশে দিবে।
নিতাই ॥ তা সারা রাত কি না খেয়ে থাকব?
গোবরা ॥ আগে বইল্লেন নাই হুজুর। দেখি ঘরে মুড়ীটুড়ী কিছু যদি থাকে।
নিতাই ॥ মুড়ী! Nonsense। ও সব চলবে না। যাও fowl-curryর বন্দোবস্ত কর। না কর ত তোমার নামে report করব।
গোবরা ॥ করুন গা কেনে। জান থাইক্‌লে বহুৎ চাকরী পাওয়া যাবেক্।

[নিতাইবাবু রেগে তার দিকে কট্‌মটিয়ে চেয়ে রইলেন। গোবরা সেটা লক্ষ্য করে দেখে বলল]

গোবরা ॥ হুজুর! অনেক কয়টো প্যাট্ চালাইতে হয় যে। আপন জান বাঁইচ্‌লে—
নিতাই ॥ [রাগত ভাবে] যা যাঃ! কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।
গোবরা ॥ আঁইগা—ছেইলা পুইলা বহু বিটি লিয়ে এগারটি।
নিতাই ॥ একটাও ত দেখলাম না।
গোবরা ॥ বিটি ছেইলা লিয়ে কি এখানে থাকা যায়। সব ঘরে র'ইয়েছে।
নিতাই ॥ বিটি ছেইলা নিয়ে থাকা যায় না কেন?

গোবরা ॥ কত রকমের সাহেব লোক সব আসা যাওয়া কইচ্ছেন। মদ টদ খাইছেন, কত রকম হুকুম কইচ্ছেন।

নিতাই ॥ যা যাঃ !

গোবরা ॥ মদে বেঁহুস হইয়ে কত কাণ্ড করেন কি বইল্‌ব। ঐ ত রা কইচ্ছে —সাহেব আইলেন বুঝি। [দূরে চেয়ে দেখল]

নিতাই ॥ সে গাড়ীতে আসবে।

গোবরা ॥ ঐ ত টর্চ বাতি মাইর্‌ছে। হাঁই দেখেন আঁইগা।

[নিতাই উঠে দাঁড়াল এবং বাহিরের দিকে দেখতে লাগল]

নিতাই ॥ কি কাণ্ড মিঃ ভোস ! আমি চারটে থেকে wait কচ্ছি।

[খাকী-পরা বন্দুক-হাতে মিঃ ভোস—সঙ্গে শুখনী নামে একটি বাউরী মেয়ে। তার মাথায় হোলড্ অল, হাতে একটি টিফিন কেরিয়ার।]

ভোস ॥ গাড়ী বিগড়েছে। বহু চেষ্টা করা গেল। শেষ পর্যন্ত driverকে রেখে চলে এলাম। যা শুখনী—ওগুলো ঘরে নিয়ে রাখ।

নিতাই ॥ টিফিন কেরিয়ারে—আছে ত কিছু ?

ভোস ॥ Snack আছে কিছু। তুমি খাবারের order দাও নি ?

নিতাই ॥ এখানে দেবীর আবির্ভাব হ'য়েছে। তোমার জন্য পথ চেয়ে ছিলুম, তাই order দেওয়া হয় নি। এখন নাকি দেবীর দাপটে কিছু করা সম্ভব নয়।

ভোস ॥ ঐ শুখনীও তাই বলছিল। লোক জোটান গেলনা—নইলে গাড়ী এইখানেই ঠেলে আনতাম।

নিতাই ॥ যা আছে খেয়ে ত নিই। পেট না ভরে, তখন চৌকীদার গোবর্ধনের ঘরের মুড়ীর stock capture করা যাবে।

ভোস ॥ এই চৌকীদার—টিফিন কেরিয়ার থেকে বের করে সব লাগাও একটা tea-poyএর উপর। আমি হাত মুখ ধুয়ে নিই। চলো শুখনী—ওটা ঘরে রেখে দাও। আরে আলোই জ্বালে নি যে !

গোবরা ॥ এই দিছি হুজুর।

[বেগে ঘরের ভিতরে গেল। মিঃ ভোস ও শুখনী তার পর গেল। ঘরে আলো জ্বলল। শুখনী ফিরে এল, তার পর এল tea-poy নিয়ে গোবর্ধন]

নিতাই ॥ এই মাঝান—

শুখনি ॥ [বাধা দিয়ে হাসি মুখে বলল] আমি বাউরী বটে। সাঁওতাল নই।

নিতাই ॥ [সুগঠিত তন্বশ্রী লক্ষ্য ক'রে] গড়ন পেটন দেখে আমি সাঁওতাল ভেবে ছিলাম।

[গোবর্ধন কাজ করতে করতে চোখ বেঁকিয়ে চাইলো। শুখনী নারীসুলভ সঙ্কোচের সঙ্গে গায়ের কাপড় টেনে হাসি মুখে বলল]

শুখনি ॥ ই বাবা! সাঁওতাল কি এমন বাংলা বইল্‌তে পারে? উয়ারা বইল্‌তে গেলে বইল্‌বে—[সাঁওতাল অনুকরণ করে] মার্ তুদের মত আমরা বাংলা বইল্‌তে নারি গো।

[জাত্যাভিমানের সূক্ষ্ম ক্রিয়া কত বিচিত্র ভাবে মানুষের মনের উপর প্রভাব করে তা দেখে নিতাই বাবু হেসে বললেন]

নিতাই ॥ তাতে হ'ল, এখন ঘরে যাবে কি করে?

শুখনি ॥ কেনে? রাস্তা দিয়ে চইলে যাব। বেশী দূর লয় ত।

নিতাই ॥ দেবী এসেছে যে—ভয় করবে না।

শুখনি ॥ আসুক—ত! অত ডর্ কইল্লে চলে গরীবের।

নিতাই ॥ শুনছ গোবর্ধন?

গোবরা ॥ আঁইগা।

নিতাই ॥ সন্ধ্যা হতে না হতে তুমি ত টাঙ্গি নিয়ে ঘুরছ। আর এ বলছে অত ডর্ কইল্লে চলে।

গোবরা ॥ উ বিটি-ছেইলাটো—ডান্ বটে।

শুখনি ॥ [রেগে গিয়ে] হঁ হঁ! রিষের জালায় বইল্‌ছে সাহেব।

গোবরা ॥ [রুখে দাঁড়াল] তবে বইল্‌ব সব কথা?

শুখনি ॥ বলগা ত। কত জনে কত বইল্‌ছে। কথা বইল্‌তে সবাই পারে —খাইতে দিতে নারে।

গোবরা ॥ কি বইল্‌ব হুজুর। ই বিটি-ছেইলাটোর স্বভাব ভাল লয়।

শুখনি ॥ হঁ রে।

গোবরা ॥ সাঙ্গা বইন্‌লি না কেনে? মরদ ত মইরেছে দুই বছর।

শুখনি ॥ ছোট ছেইলা দুটা—বুঢ়ীটা কি খাবেক্—কে খাওয়াবেক্? সবাই অমনি নিতে খুঁইজ্‌ছে। যে দিন হঁইয়েছে, চাইরটা প্যাটের খোরাকী চালাইতে মুরাদ নাই কারও।

গোবরা ॥ [প্রায় পরাস্ত হ'য়ে] তুই ত সব জানিস্।

শুখনি ॥ হঁ রে জানি—সব জানি—বলে

যৌবন বড় দায়
এ চায় ও চায় না পাইলে হায়—
অমনি জইলে যায় ॥

গোবরা ॥ [ধমক দিয়ে] দেখুন হুজুর কেমন বেহায়া বটে। খবরদার ডাক-বাংলায় আইলে ভাল হবেক্ নাই বইলে দিচ্ছি।

শুখনি ॥ আমাকে সাহেব ডাইকে আইনেছে তবে আইসেছি—

[মিঃ ভোস ভিতর থেকে এলেন]

ভোস ॥ গরম গরম গলার আওয়াজ পাচ্ছি।

গোবরা ও শুখনি ॥ [একসঙ্গে] দেখুন সাহেব—এই নষ্টা বিটি-ছেইলাটা—আপনি মাল নিয়ে আইসতে বইল্‌লেন তাথেই আইলাম।

ভোস ॥ আঃ চুপ্।

শুখনি ॥ কি বইল্‌ছেন বিচার কইরে বইলে দেন।

ভোস ॥ আরে এই সাহেব খাদের ম্যানেজার—ওঁকে বল্।

নিতাই ॥ এই সাহেব পুলিশের কত্তা—ওঁকেই বল্।

শুখনি ও গোবরা ॥ আইজ্ঞা আমাকে বইল্‌ছে—বেহায়া নষ্ট বিটি-ছেইলা—সাহেবের সামনে আইজ্ঞা—এমন কইচ্ছে।

ভোস ॥ আচ্ছা—এখন থাম, ওসব বিচার পরে করা যাবে। এখন নাও এই টর্চটি নিয়ে ওকে বাড়ী পৌছে দিয়ে এস।

গোবরা ॥ আমি পারব নাই হুজুর।

শুখনি ॥ আমি একাই যাব সাহেব। কিছু হইলে আমাকে ঠেইলে দিয়ে উ ত আগে পালাবেক্।

নিতাই ॥ তাইত! আচ্ছা একটু দাঁড়াও। আমরা কিছু খেয়ে নিই। তারপর বন্দুক নিয়ে আমরাই পৌছে দেব।

শুখনি ॥ দেব দেবী কেউ আমাকে লিবেক্ নাই হুজুর! আমাকে নিলে চাইর্‌টা অবল অবলাকে কে খাওয়াবেক্। [বিনীত ভাবে] সায়েব আমাকে কিছু দিবেন আঁইগা।

ভোস ॥ চৌকীদার চার আনা পয়সা দিয়ে দাও ত ওকে!

শুখনি ॥ চার আনা আমি লিব নাই।

ভোস ॥ বটে কত চাই?

শুখনি ॥ দুটো টাকা হইলে হইতো।

নিতাই ॥ দুটাকা!

ভোস ॥ ঐ মোট তার মজুরী দুটাকা!

শুখনি ॥ আমি ত আরও কাজ দিব বইলছি। দুটো টাকা হইলে—

ভোস ॥ যা যা, এখন ভাগ্, খেতে দে আমাদের। অন্য সময় আসিস্।

শুখনি ॥ অন্য সময় ?

ভোস ॥ হাঁ হাঁ, অন্য সময়। চৌকীদার টর্চটা জেলে দেখাও, ও যাক্।

শুখনি ॥ অন্য সময় আইস্‌ব তো ?

গোবরা ॥ দেখুন হুজুর কেমন ট্যাটা বিটি-ছেইলা। [শুখনি হাসিমুখে গোবর্ধনকে মুখ ভেঙ্গিয়ে বলল]

শুখনি ॥ যাছি বেহ্লাই। আবার অন্য সময় আইস্‌ব। হুকুম দিয়া দিলেন হুজুর আইস্‌তে—

[হেসে চলে গেল। নেপথ্য থেকে গান শোনা গেল—

"বেহাই আমার কাল কুহুলী,

ও বেহাইকে ঘইসে মেইজে কইর্‌ব গলার মাহুলী

বেহাই আমার কাল কুহুলী।"

গানের স্বর ক্রমে দূরে গেল। সাহেবরা খেতে খেতে হাসিমুখে শুনল।]

নিতাই ॥ মেয়েটার নাম কি চৌকীদার ?

গোবরা ॥ শুখনি।

ভোস ॥ সুখ ত ওদের চারদিকে।

গোবরা ॥ আঁইগা সে সুখ লয়। শুকুর বারে হইয়েছে তাই শুখনী, মঙ্গলবারে হইলে মংলী, বুধবারে বুধনী এইসব।

নিতাই ॥ কিন্তু কিরকম বেপরওয়া চলে গেল অন্ধকারে শালবনের ভিতর দিয়ে।

গোবরা ॥ আঁইগা। চাঁদ উঠল যে—একটুক্ মুখ আঁধারী রাইত। আর শুখনি বড় কঠিন বিটি-ছেইলা বটে।

ভোস ॥ কঠিন ?

গোবরা ॥ হঁ হুজুর কঠিন। উদিন্‌কে কাবলী আগা সাহেবকে তাইড়েছিল।

নিতাই ॥ কাবুলীরা কি ওদেরও ধার দেয় ?

গোবরা ॥ না আঁইগা, মাল-কাটা, খাদে-খাটা, ব্যাপারী-হাট-করা ইয়াদের দেয়। তবে শুখনি দেইখ্‌তে ভাল, তাথেই দিয়েছিল।

[নিতাই বাবু ও মিঃ ভোস খেতে খেতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।]

তার পর যে তাড়া কইল্ল শুখনি। হঁ কঠিন বিটি-ছেইলা বটে। মুড়ী আইন্‌তে হবেক্ হুজুর ?

নিতাই ॥ না। আজ রাতটা এতেই চালিয়ে নেব। কাল তোমার রান্নার কেরামতি দ্যাখা যাবে। কি বল ?

ভোস ॥ কাল কি করতে থাকব ? সকালে উঠে গাড়ীটায় হাত লাগিয়ে ঠিক করে নেব।

নিতাই ॥ দেবী দেখে যাবেনা ?

ভোস ॥ দেবী !

নিতাই ॥ যিনি আবির্ভাব হয়ে রোজ একজন করে নিচ্ছেন। আজ রাতে যদি kill হয় তবে কাল একটা chance না নিয়েই যাবে ?

ভোস ॥ তুমিও যেমন ! এদের কথা বিশ্বাস কর ?

গোবরা ॥ আইজ রাইতে—ডাক শুইনে লিবেন হুজুর। রোজদিন আমরা শুনছি। ঐ শুনুন কেনে দূরে ফেউ ডাইক্‌ছে।

[কান পেতে শুনে]

নিতাই ॥ সত্যিই ত ?

ভোস ॥ ওসব false ফেউ। বারমাস ওরকম শোনা যায়।

গোবরা ॥ আজ কাকেও লিবেন। কাল সাঁওতালদের ছেইলাটা মুখ হইতে ছুইটে গেল। আজ কি ভোগ না লিবেন ?

ভোস ॥ গরু ছাগল মারে নি ?

গোবরা ॥ নামা কুলীতে ৫।৬ দিন আগে ধইরে ছিল। সবাই হুঁসিয়ার হইল। দিন থাইক্‌তে সব ঘরে তুইল্‌ছে। খালি মানুষ তিনজন লিয়েছেন। খাইতে পারেন নাই। তাতে পাইছেন আর মাইর্‌ছেন।

নিতাই ॥ খেলেন না কেন ?

গোবরা ॥ সোর গোল হইছে—সব মানুষ হাতিয়ার নিয়ে আউগাইছে যে—

ভোস ॥ তবে আজ রাতেও দেখা পাওয়া যেতে পারে।

গোবরা ॥ দেখার কথা বইল্‌তে পাইর্‌ব নাই। তবে ডাক শুইন্‌তে পাবেন আঁইগা।

নিতাই ॥ ব্যস আমরা শব্দভেদী বাণ চালিয়ে দেব। নাও এখন এসব তুলে রাখ। কাল খুব সকালে চা চাই।

[গোবরা tea-poy ও খাবার বাসন সরাতে সরাতে]

গোবরা ॥ আমি হুজুর ভোর হইতে চা দিয়ে দিব।

[ঘরের ভিতরে ঐ সব নিয়ে গেল]

নিতাই ॥ দেবীদর্শন হতে পারে, কি বল ?

ভোস ॥ বন্দুক দুটো বুলেট পুরে ready করে রাখি।

[উঠে ঘরে গেল। গোবরা বাহিরে এল]

গোবরা ॥ তা হইলে ছুটির হুকুম দিয়ে দেন হুজুর। আমি গোসল ঘরের খিল দিয়ে দিয়েছি। ঘরে যাঁইয়ে বসেন আঁইগা।

নিতাই ॥ কেন? দেবী এসে টেনে নেবেন?

গোবরা ॥ ঠাট্টা লয় কো। সব পারেন উয়ারা।

[ভোস দুটি বুলেট্ ও বন্দুক নিয়ে বাহিরে এল]

নিতাই ॥ ঐ ত দেবীপূজার উপচার এসে গেল। তুমি যাও।

ভোস ॥ খাবার জল রাখা আছে ত?

গোবরা ॥ ঠিক আছে হুজুর। রাইতে ঘর হইতে বাইরে বিরাইবেন না। আর বাতিটো জালা রইতে দিবেন। আর ঘরে যাঁইয়ে বইন্‌লে হইত হুজুর।

ভোস ॥ [বন্দুকে গুলি পুরিয়া] তুমি গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়। আমরা দেবীদর্শনের আশায় রইলাম।

[ভক্তিভরে হাত জোড় করে প্রণাম করে গোবর্ধন চলে গেল।]

নিতাই ॥ অতিভক্তি।

ভোস ॥ ডাকবাংলোর চৌকীদার অনেক রকম যজমান যজায়।

নিতাই ॥ তাই পরিবার নিয়ে থাকেনা। তা এমন নির্জন যায়গা চারদিকে— জন্তু জানোয়ার আর জংলী মানুষ। পরিবেশের প্রভাবে অনেক মানুষের আদিম মনটা জেগে ওঠে।

ভোস ॥ তোমারও জাগছে নাকি?

নিতাই ॥ জেগেছে তোমার। তাই ওই ছুঁড়ীকে জুটিয়ে এনেছ।

ভোস ॥ ওর **contour** লক্ষ্য করে দেখেছ? ঘষে মেজে সাধনা করে সাজান সহুরে রূপ বড্ড একঘেয়ে হয়েছে—

নিতাই ॥ [বিদ্রূপের ভঙ্গীতে হেসে]

নিত্য পোলাও কোর্মা আহার
বল ভাল লাগে কাহার
প্রত্যহ উর্বশী দেখে
তাতেও মন আর টলে না।

ভোস ॥ [হেসে] যা বলেছ। এখন চল ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়া যাক।

নিতাই ॥ চমৎকার জোস্না উঠছে। বসনা একটু। দেবীদর্শন যদি হয়।

ভোস ॥ পাগল। আজ রাতে যদি কোনও kill হয় তখন কাল চেষ্টা করা যাবে।

নিতাই ॥ ঐ শাল গাছগুলোর তলায় তলায় আলো ছায়ার খেলাটা দেখতে বেশ ভাল লাগছে।

ভোস ॥ তোমার আদিম মন জাগছে নিতাই, লক্ষণ ভাল নয়।

নিতাই ॥ আর একটু বস না।

ভোস ॥ Long journey—car নিয়ে হাঙ্গামা—রাত জাগা আজ সম্ভব নয়। কাল দেখা যাবে চল।

[ওঁরা উঠে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মাঝে মাঝে দূরে কেউ ডাকে—কুকুরের কান্না—আর একঘেয়ে ঝিঁঝির ডাক ঐ নির্জন পরিবেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে লাগল। একটু পরে শুখনি এসে চৌকীদারের ঘরের দিকে বেশ করে চেয়ে দেখে বারান্দায় উঠল। তারপর পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে খড়খড়ির উপর আঙ্গুল দিয়ে অল্প অল্প শব্দ করতে লাগল। ভিতরে সাড়া পেয়ে সে সরে এসে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। ভিতরে খুট খাট শব্দ ও ফিস্ ফিস্ করে কথা শুনে তার মুখ হাসিতে ভরে গেল। পাশের জানালার খড়খড়ি ফাঁক হতেই সেদিকে চেয়ে দেখে হাসিমুখে দেহ থেকে কাপড়ের আঁচল সরিয়ে নিয়ে আঁচলটা জানালার দিকে ছুঁড়ে দিয়েই টেনে নিল। দুম করে বন্দুকের গুলি হল। শুখনি খিল খিল করে হেসে উঠে ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে বলল]

শুখনি ॥ আইস্‌তে বইলে—অখুন গুলী কইচ্ছ সাহেব।

[দরজা খুলে ওঁরা বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলেন। শুখনিকে দেখে রাগত ভাবে ভোস বললেন]

ভোস ॥ হারামজাদী! তুই পাগল না খ্যাপা!

শুখনি ॥ [হেসে] ক্ষেপী বটে।

নিতাই ॥ Kick her out. গুলী লাগলে কি কাণ্ড হত বল ত!

ভোস ॥ এত রাতে কি করতে এয়েছিস্?

শুখনি ॥ [বিব্রত ভাবে] আইস্‌তে বইল্লেন আপনি।

ভোস ॥ কি! আমি আসতে বলেছি?

শুখনি ॥ বইল্লেন অন্য সময় আসিস্।

[গোবর্ধন লণ্ঠন নিয়ে টাঙ্গি হাতে এল]

গোবরা ॥ কি হঁইয়েছে হজুর। গুলীর আওয়াজ কেনে?

নিতাই ॥ এই rascal মেয়েমানুষটা—এসে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করছে। শব্দ পেয়ে—আমরা বাঘ মনে করে—

গোবরা ॥ বড়া নষ্ট বিটি-ছেইলা। গুলী খাইত ত ঠিক হইত।

শুখনি ॥ হঁ রে!

গোবরা ॥ কেনে আইয়েছিস্ তুই ?

শুখনি ॥ আইস্তে বইলেছে তাথে আইসেছি।

গোবরা ॥ [ভ্যাংচাইয়া] আইস্তে বইলেছে !

শুখনি ॥ টাকা দিবে বইলেছে।

গোবরা ॥ টাকা লিতে—বিহানে আইলে কি হইত ?

শুখনি ॥ বিহানে আইস্তে বলে নাই। অইন্য সময় আইস্তে বইলেছে।

নিতাই ॥ কি dangerous মেয়ে দ্যাখ।

ভোস ॥ সত্যি dangerous. তোর ভয় ডর্ কিচ্ছু নেই।

গোবরা ॥ উ রাইত চরা ডাইনী বটে।

ভোস ॥ যাক—ভুল আমার হয়েছে। সকালে টাকা নিতে এলে অমনি মালপত্তর গুলো—ওকে দিয়েই গাড়ীতে নিয়ে যাবো ভেবে—

নিতাই ॥ বিদেয় কর। বিদেয় কর।

[ভোস ঘরের ভিতরে গেলেন]

সাধে কি বলে ছোট জাত। লজ্জা সরম মান অপমান কিচ্ছু বোধ নেই।

শুখনি ॥ আমার মত হইতেন ত আপনাদেরও উ সব থাইক্‌ত নাই।

নিতাই ॥ কি !

শুখনি ॥ বাবু। একা বিটি-ছেইলা চাইরটা প্যাট-খোরাকী চালাইতে হয়।

নিতাই ॥ খেটে খেতে পারিস না ?

শুখনি ॥ খাদে কামিনের কাজ করি ত।

নিতাই ॥ তবে ?

শুখনি ॥ ৭॥৹ টাকা হপ্তা।

নিতাই ॥ সস্তায় চাল ডাল ত পাস্।

শুখনি ॥ খালি চাল ডাল হইলে হবে? আনাজ পাতি হুন তেল: কাপড় চোপড়? ছেইলা গুলার পিরান নাই। বুঢ়ী হপ্তায় আট আনার বিড়ি খায়। বাবু রোজ একটা ম্যাচবাতি গেল এক টাকা। ই বার পোষ পরবে একদিন পিঠা দিতে পারি নাই ছেইলাদের। উয়ারা কুথা পাবেক্। মা বটি ত, আমাকেই দিতে হবেক্।

[ভোস এলেন—হাতে মানি ব্যাগ—একটা আধুলী বের করে দিয়ে বললেন]

ভোস ॥ এই নে আট আনা নিয়ে যা।

শুখনি ॥ সাহেব—দুটা টাকা দ্যান।

নিতাই ॥ এদের পেট কেউ ভরাতে পারবেনা। একটা মোট এনে দুটাকা—
চাইতে লজ্জা করে না তোর ?

শুখনি ॥ তাথে ত রাইতে আইলম্।

নিতাই ॥ রাইতে আইলম্! দিওনা আর এক পয়সাও। নিতে হয় নে, না
হয় চলে যা।

শুখনি ॥ আমি বুঢ়ীকে বইলে আইসেছি কাল ভাগা কিনব।

ভোস ॥ কি কিনবি ?

গোবরা ॥ আঁইগা পাঁঠার ভাগা।

নিতাই ॥ দ্যাখ কি লালচ। এদের সবার ঐ রকম। লোভের শেষ নেই।

শুখনি ॥ বাবু মানাইতে নারি যে। বুঢ়ী বলে আমাকে ভাল মন্দ খাইতে
দিতে হবেক্। আমি বলি কুথা পাব মা। উ তখন বলে "যখন ছুট ছিলি
তখন পিঠা দে—গুড় দে—মাছ দে বইলে যে কান্দতিস্ তখন আমি কুথা
পাব তা ভাইবেছিন্ ? এখন তুই কুথা পাবি আমি কেনে ভাইব্‌ব বল্ ?"
একে বুঢ়ী অবুঝ তার উপর দুইটা অবুঝ ছেইলা। আমি কি কইর্‌ব।

গোবরা ॥ তা ধার করগা কেনে। ভাল মানুষ পাইয়ে সাহেবের কাছে
জুলুম কইরে দুটাকা লিবি ?

শুখনি ॥ ধার কইরে ত মইরেছি হুজুর। সুদ দিছি দুই টাকা মাসে।

ভোস ॥ এই নে এক টাকা নিয়ে যা।

শুখনি ॥ হুজুর আপনে কত টাকা কামাইছেন। এক টাকায় কি হবেক্
আপনার। একটা দিন ত ছেইলাগুলাকে খুসী হইয়ে হাইস্‌তে দেখি।
একটা দিন ত বুঢ়ীর গাইল্ শুনা বন্ধ থাকুক্। কি বইল্‌ব সাহেব! ছেইলা
গুলাকে কে বাঁচাবেক্—বুঢ়ীটা জীবন ভর খাইটেছে, আইজ না খাইয়ে
মইর্‌বেক তাথেই। তা না হইলে বিবাগী হইয়ে ঘর ছাইড়ে চইলে
যাইতাম্। [গলার স্বর গাঢ় হয়ে এল]

ভোস ॥ আচ্ছা এই নে দুটো টাকা। [টাকা দিলেন]
গোবর্ধন চল ত লণ্ঠন নিয়ে—ওকে শালবনটা পার করে দিয়ে আসি।

শুখনি ॥ [হাসি মুখে] লণ্ঠন কি হবে হুজুর! ভগবান চাঁদের আলো দিয়েছেন।
সে সকলকে সব সমান দেন—ছুট বড় তার কাছে নাই। যাছি—আমার
হাতে ইটো আছে। [ছুরী দেখিয়ে দিল]

[শুখনি চলে গেল]

ভোস ॥ কি নিতাই। একেবারে গুম হয়ে গেলে যে।

নিতাই ॥ ভোগা দিয়ে দুটাকা নিল তাই দেখলাম। ওরা মিছে কথা বলার ওস্তাদ। কুলীদের কাঁদুনী হরদম্ শুনছি ত।

গোবরা ॥ তা আমি যাচ্ছি হুজুর।

ভোস ॥ আচ্ছা যাও। [গোবর্ধন চ'লে গেল।] নিতাই, পুলিসের চাকরী এত দিন করে এইটুকু বেশ ভাল করে বুঝেছি, যে সুরুচি-সুনীতি-আদর্শবাদ সব কিছু নির্ভর করে আর্থিক সচ্ছলতার উপর। Born criminal খুব কম—economic pressure-এ লড়তে লড়তে হয়রান হয়ে শেষে অমানুষ হয়।

[দূরে আর্তনাদ ও গর্জন শুনে ওঁরা চমকে উঠলেন !]

কি হ'ল ?

নিতাই ॥ মেয়েটা'কে বাঘে ধরল নাকি।

ভোস ॥ চলত—চলত—

[ভোস এগোলেন বন্দুক নিয়ে]

নিতাই ॥ গোবর্ধন—গোবর্ধন আলো নিয়ে এস ত !

[নিতাইবাবুও বন্দুক নিয়ে চলে গেলেন। আলো নিয়ে টাঙ্গি হাতে গোবর্ধন এল। শব্দ সেও শুনেছে। তাই বুঝতে পেরেছে যে শুখনি দেবীর হাতে পড়েছে। উত্তেজনার মাথায় বারান্দা থেকে নেমে তারপর সে আবার পিছিয়ে এল ও আলোটি রেখে টাঙ্গিটা বাগিয়ে ধরে উবু হয়ে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল। দূরে দুম্ দুম্ করে দুবার বন্দুকের শব্দ হল। গোবর্ধন তড়াক্ করে উঠে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে এল। ওঁরা উচ্চৈস্বরে ডাকতে লাগলেন "চৌকীদার—চৌকীদার"। অগত্যা টাঙ্গি বাগিয়ে ধরে বাঁহাতে লণ্ঠনটি নিয়ে গোবর্ধন এগিয়ে গেল। নিতাইবাবু ও ভোস ধরাধরি ক'রে রক্তাক্ত শুখনিকে নিয়ে এলেন। ওকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হল।]

ভোস ॥ ঘরে নিয়ে গেলেই হত।

নিতাই ॥ Senseless হয়ে গেছে। Open airই ভাল।

ভোস ॥ এই খানেই first aid যে টুকু সম্ভব দেওয়া যাক্।

নিতাই ॥ কি করা যাবে। গাড়ী ত অচল !

ভোস ॥ আছে কিছু সঙ্গে ?

নিতাই ॥ Iodine থাকতে পারে। দেখি—এঃ জামা কাপড় সব গেছে রক্তে নষ্ট হয়ে—

[নিতাইবাবু ভিতরে গেলেন]

ভোস ॥ [অস্থির হয়ে দুবার ঘুরে একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলেন] গোবর্ধন। গোবর্ধন !

[নেপথ্য থেকে "আঁইলম হুজুর" বলে সে ছুটতে ছুটতে এল।]

ভোস॥ কি কচ্ছিলে ওখানে?

গোবরা॥ আঁইগা—বাঘটো মইরেছে তাই তার কটা মোছ লিয়ে আইলম। বড ওষুধ হয়।

ভোস॥ এই তোমার মোছ নেবার সময় হল! মেয়েটা মরে—

গোবরা॥ অনেক লোক আইসে গেল। উয়ারা সব মোছ ছিঁড়ে লিবে।

ভোস॥ ধেৎ তেরি মোছের কিছু বলেছি! ডাক্তার আছে কাছাকাছি?

গোবরা॥ উ সেই গোবিন্দপুর।

ভোস॥ যাও ডেকে নিয়ে এস গিয়ে।

গোবরা॥ এত রাইতে আইসবেন্ কেনে?

ভোস॥ আরে দেবী ত তোমাদের মরেছে—এখন আর ভয় কি?

গোবরা॥ আরও ত থাইক্‌তে পারে।

ভোস॥ যা যাঃ! তা বলে মেয়েটা বিনা চিকিৎসায় মরবে?

গোবরা॥ উ মইর্‌বেক নাই আঁইগা। উয়াকে ঝাপট্ মারার আগে উ দেবীকে মাইরে দিয়েছে। সহজ বিটি-ছেইলা লয় উ।

[নিতাইবাবু শিশি ও কাপড় হাতে বাইরে এলেন]

ভোস॥ আমরা মরার উপর গুলী করেছি। শুখনির ছুরীর ঘায়েই শেষ হয়েছে, নইলে অমন করে পড়ে থাকে।

নিতাই॥ তা হবে। কিন্তু টিংচার আয়োডিন অতি সামান্য আছে যে।

ভোস॥ তুমি থাক। আমি চৌকীদারকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনি। চল চৌকীদার।

[নিতাই শুখনির কাছে গেলেন]

নিতাই॥ বোধ হয় জল খেতে চাইছে। একটু খাবার জল নিয়ে এস ত চৌকীদার।

[গোবর্ধন ঘরে গেল। নিতাইবাবু উঠে এসে ভোসকে বললেন]

নিতাই॥ ডাক্তার আসুক বোস, গরম জল নেই—তার উপর এই সব unsterilized ন্যাকড়া। হিতে বিপরীত হতে পারে।

ভোস॥ কতটা যখম?

নিতাই॥ সর্ব অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কোনটা কতখানি সে ত wash না করে বলা মুস্কিল।

[গোবর্ধন জল নিয়ে শুখনিকে খাওয়াতে গেল]

গোবরা ॥ কি বইল্‌ছে হুজুর।

[ওঁরা এগিয়ে গেলেন। অস্ফুট স্বরে শুখনি কি বল্ল। তার বাঁহাত থেকে টাকা দুটো মাটিতে পড়ল। গোবরা মুখের কাছে কান নিয়ে শুনে বলল]

হুজুর—বইল্‌ছে ভাগা কিনার কথা। [আবার শুনে বলল] ছেইলাগুলাক্‌ ডাইক্‌ছে। বুঢ়ীকে ডাইক্‌ছে।

[হঠাৎ দেহ মুচড়ে উঠে শুখনি নিশ্চল হয়ে গেল।]

গোবরা ॥ [সচকিত ভাবে] হুজুর। [উঠে দাঁড়াল]

[ভোস নিচু হয়ে নাকের কাছে হাত ধরে বুকে হাত দিয়ে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ালেন। নিতাই বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কি ব্যাপার ?"]

ভোস ॥ শুখনির ছুটি হল। Life's fitful fever—finished.

[নিতাইবাবু shocked হয়ে—ইস্‌! বলে বসে পড়লেন]

ভোস ॥ দেবীদর্শন হতে পারে বলছিলে না। নিতাই দেবীদর্শন হল। অতীতের ঋণের বোঝা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের মানুষকে বাঁচানর দায়িত্ব নিয়ে—to the last struggle করে—glorious exit.

[চৌকীদারের লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে একবার শুখনির মুখ ভাল করে দেখতে এগিয়ে গিয়ে ভোস হাত থেকে খসে-পড়া টাকা দুটো দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন]

নিতাই—নিতাই—ত্থাখ ত্থাখ রক্তমাখা টাকা দুটো ওই পড়ে আছে। নিতাই মার যাত্রার কৌটায় ঐ রকম সিঁদুরমাখা টাকা দেখেছি ভাই। মা কত শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকাতেন, আমাদের মাথায় ঠেকাতেন, আমাদের মাথায় ছোঁয়াতেন। এস আমরা ঐ টাকা দুটো মাথায় ছোঁয়াই।

[ভোস টাকা তুলে নিয়ে মাথায় ছোঁয়ালেন। নিতাই এগিয়ে আসতে তাঁর মাথায় ছোঁয়ালেন]

নিতাই ॥ [গাঢ়স্বরে বলে উঠলেন] সত্যই দেবী দর্শন হল আমাদের—দেবীদর্শন হল।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

[অজয়ের তীরে একখানি গ্রামে একটি আখড়া। আম-জাম-কাঁঠালের গাছ। গাছগুলির বয়স দশ-বারো বৎসরের বেশি নয়। গুটি-চারেক নারকেল গাছ। তাল নারকেল গরুতে মুখ না দিলে, পরিচর্যা ভাল হ'লে বারো বছরেই ফল দেয়। গাছে নারকেল এখনও ফলে নি। তবে ফলবে শীঘ্র তাতে ভুল নেই। গাছগুলি সতেজ পুষ্টিতে বেড়ে উঠেছে।

আখড়াটির বয়সই বারো বছর। ঘর-দোরগুলি বারো বছরে খুব পুরানো নয়। তার উপর বারান্দায় কিছুদিন আগে টিন পড়েছে। বাঁধানো হয়েছে। তাতে নতুন বলে মনে হয়। অঙ্গনটি ঝকঝক তকতক করছে। পরিচ্ছন্ন নিকানো। ছোট একটি ধানের মরাই। ওদিকে একটি গোশালা। সামনে একটি ছোট পরিপাটি ঘর। ঘরখানি পূজা-মন্দির।

আখড়ার মালিক কুৎসিতদর্শন গোবিন্দ দাসের বয়স পঞ্চাশ। সবল স্বাস্থ্যবান মানুষ, রূঢ় গঠন। আধপাকা দাড়ি-গোঁফ, আধপাকা লম্বা চুল, কপালে তিলক, নাকে রসকলি, মাথার লম্বা চুলগুলি রাখালচুড়া ক'রে ব্রহ্মতালুতে ঝুঁটি ক'রে বাঁধা। গোবিন্দ দাস দুপুরবেলা দাওয়ায় বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছিল আর আপন মনেই গুনগুনিয়ে গান করছিল—]

মধুর মধুর বংশী বাজে কদমতলে কোথায় ললিতে—
কোন্ মহাজন পারে বলিতে ?
(আমি) পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে,
কোন্ মহাজন পারে বলিতে !
ও পোড়া মন, হায় পোড়া মন !
ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে !
রাই যে আমার রাঙা পায়ে ছাপ গিয়েছে এঁকে—
মনের ভুলে গলিপথে ঢুকলি রে তুই বেঁকে !
পোড়া মন পথ হারালি—পা বাড়ালি
(চন্দ্রাবলীর) কুঞ্জগলিতে।

[প্রবেশ করলে একজন ব্রাহ্মণ]

ব্রাহ্মণ ॥ কি গো বাবাজী, আজ ঘরে ব'সে ?

গোবিন্দ॥ (হেসে বললে) ঘর কৈনু বাহির—বাহির কৈনু ঘর, বাদ আজ থেকে বাবা।

ব্রাহ্মণ॥ কি রকম! হঠাৎ এমন মতি ফিরল?

গোবিন্দ॥ নাঃ, আর ভিক্ষেয় বেরুব না। এইবার ঠিক করেছি, ঘরেই সাধনভজন করব। মন্দিরে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করব, ওই নিয়েই থাকব।

ব্রাহ্মণ॥ বটে বটে! আজ শুনলাম, কৃষ্ণদাস বাবাজীর আখড়ার দখল নিচ্ছে, আদালতের লোক এসেছে। তোমার তরফে কে গিয়েছে?

গোবিন্দ॥ আমার তরফে গিয়েছেন হরি ঘোষ।

ব্রাহ্মণ॥ হরি ঘোষ! হ্যাঁ, সে জাঁদরেল লোক বটে। তা—। তা আখড়া-সম্পত্তি-বিগ্রহ সব নিলেম হয়ে গিয়েছে?

গোবিন্দ॥ হ্যাঁ। সব। কৃষ্ণদাসের বাপ আখড়া করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিল। দেবোত্তর কিছু করে নি। কৃষ্ণদাস পাঁচ শো টাকা ধার নিয়েছিল, সব বন্ধক দিয়ে। মহাজন গাঙুলী ভেবেছিলেন, বিগ্রহ বন্ধক রাখলে টাকাটা যে ক'রে হোক পাবেন। তা কৃষ্ণদাস বাবুগিরি ক'রেই গেল। বৈষ্ণবের আচারও মানে না, বাপ বিগ্রহ ক'রে গিয়েছে, আছে ওই পর্যন্ত। সম্পত্তি মাত্র পাঁচ বিঘে ডাঙা জমি। তাতে কুলোবে কেন? গোকুলে গোবিন্দের মত সুদে আসলে হাজার টাকা হ'ল যখন, তখন নালিশ করতে হ'ল; করলে। কিস্তিবন্দি হ'ল। সে কিস্তি খেলাপ যখন হ'ল, তখন আমি খবর পেয়ে গিয়ে পুরো টাকা দিয়ে ডিগ্রি কিনে জারি করলাম। এইবার দখল।

[ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে]

গোবিন্দ॥ দুঃখ হ'ল না কি ঠাকুরের?

ব্রাহ্মণ॥ দুঃখ? না। দুঃখ কিসের বল?

গোবিন্দ॥ সে তুমিই বলতে পার। আমি কি ক'রে বলব, বল?

ব্রাহ্মণ॥ তোমার আখড়াটি বেশ। অজয়ের একবারে ওপরে। লোকে বলে, অজয়ের জলের ছলছলানির মধ্যে জয়দেব প্রভুর পদ শোনা যায়।

গোবিন্দ॥ ও মহতের কথা মহতে বোঝে। মেঘের কথা ময়ূরে বোঝে; কদমতলায় বাজে বাঁশী—সবার মাঝে রাই উদাসী! বলে লোকে শুনি! যার কান আছে সে শুনতে পায়।

ব্রাহ্মণ॥ তুমি! তুমি নিশ্চয় শুনতে পাও।

গোবিন্দ॥ হরিবোল, হরিবোল! ঠাকুর, কালাতে বাদ্যি শুনতে পায় একমাত্র ঢাকের, কানাতে ফুল দেখে সর্ষের, খোঁড়াতে নাচ দেখে ঢেঁকির। আমি বাবা কানা খোঁড়া কালার দলে। অজয়ের জলে আমি গ্রীষ্মকালে শুনি—কুল কুল, কুল কুল। আর বর্ষায় শুনি, কুল ভাঙ্‌ কুল ভাঙ্‌! জোড় হাত ক'রে অজয়কে বলি—আমার ঘর বাদে বাবা, আমার ঘর-বাদে। (একটু হেসে) আমাকে তোষামোদ ক'রে ফল হবে না ঠাকুর। আমি জানি তুমি কৃষ্ণদাস বাবাজীর চর। তুমি ওর সঙ্গে গাঁজা খেতে, একসঙ্গে যাত্রার দলে অ্যাকটো ক'রে বেড়াতে। আমি জানি।

ব্রাহ্মণ॥ কঞ্জুষ বোরেগী কোথাকার, আমি চর?

গোবিন্দ॥ কঞ্জুষ বললে রাগ করব না। বোরেগী? হ্যাঁ, তাও আমি বটেই, কিন্তু তুমি বামুন—কেষ্ট বোষ্টমের চর। ওর মাথা তুমিই খেয়েছ।

ব্রাহ্মণ॥ খবরদার বলছি, মুখ সামলে কথা বলবে। তোমার দফা আমি নিকেশ ক'রে দোব।

গোবিন্দ॥ তা দেবে। তবে আমি তার আগে হিসেব না ক'রে ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, (খপ ক'রে হাত চেপে ধরলে) এই নদীর ধারে আখড়াতে আমি বারো বছর কাটিয়ে আসছি। বোষ্টম হ'লেও গান গেয়ে ভিক্ষের সময় ছাড়া হরিনামের সময় হয় না আমার। একা কোদাল চালিয়ে জমি করেছি, এই ঘর করেছি। আমার চালের বাতায় ওই দেখ হেঁসো আছে। বল তো ঠাকুর, তোমাকে কে পাঠিয়েছে? কোনকালে হাঁটো না, তুমি যাত্রার দলের রাণীমা সেজে বেড়াও, হঠাৎ আজ সংক্রান্তি-পুরুষের মত এখানে কেন বল। নইলে হাতখানি ছাড়ব না।

ব্রাহ্মণ॥ ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও বলছি।

গোবিন্দ॥ না। বল আগে।

ব্রাহ্মণ॥ এইবার আমি চেঁচাব।

গোবিন্দ॥ তবু ছাড়ব না। শোন ঠাকুর, মাথার আমার গোলমাল আছে। আমি পাগল হয়েছিলাম এক সময়। আমার ঘর ছিল, ঘর-আলো-করা স্ত্রী ছিল, ভগবানে মতি ছিল। হঠাৎ পাগল হয়ে গেলাম। কাঁদতাম। শুধু কাঁদতাম। চার বছর কেঁদে বেড়িয়েছি পথে পথে। তার পরে ভাল হলাম। এখানে এসে আখড়া বাঁধলাম। শোন, আমার সেই মাথার গোলমাল এখনও মধ্যে মধ্যে ওঠে। এখানকার লোক জানে, আমি

রাত্রে পাগলের মত ঘুরি উঠোনে। তুমিও জান। আমার সেই রোগ তুমি উঠিয়ো না। ঠাকু—র!

[ব্রাহ্মণ ভয় পেলে এবার। গোবিন্দের চোখ ছুটো লাল হয়ে উঠেছে। তার দেহ যেন ফুলছে। শরীর তার সত্যই যেন পাথরের]

ব্রাহ্মণ॥ আমি বলছি। আমি বলছি।

গোবিন্দ॥ বল।

ব্রাহ্মণ॥ পাঠিয়েছে আমাকে কৃষ্ণদাসের স্ত্রী।

গোবিন্দ॥ কৃষ্ণদাসের স্ত্রী? কৃষ্ণদাস জানে না?

ব্রাহ্মণ॥ তার জানা আর না-জানা? জান তো, সে এখন একটা ছোটজাতের মেয়ে নিয়েই উন্মত্ত। আহ্লাদী তার নাম।

গোবিন্দ॥ জানি। আহ্লাদীকে জানি না? রাত্রির অন্ধকারে সে সর্বনাশী মোহিনী? তাকে জানি না? কৃষ্ণদাসের সঙ্গে তার প্রেমও জানি।

ব্রাহ্মণ॥ সেই। তার বাড়িতেই এক রকম থাকে সে। খায় শোয়—সব সেইখানে। আজকাল আবার গুলি খেতে শিখেছে।

গোবিন্দ॥ বলহরি, বলহরি! তার পর? কি বলেছে কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী? কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমীর তো এককালে রূপসী ব'লে খ্যাতি ছিল গো! এখনও তো তার রূপ আছে, বয়সও তো বেশি নয়। তিরিশ। আমি একদিন গান গাইতে গিয়েছিলাম ও-আখড়ায়। বেশ রূপসী, তাতেও কেষ্টদাসের এই মতি?

ব্রাহ্মণ॥ তবু তার এই মতি। কি বলব বল বাবাজী! আমিও পাপের ভাগী। এককালে তখন আমাদের প্রথম যৌবন। কেষ্টদাসের বাপের কিছু পয়সা ছিল, কেষ্ট সেই পয়সায় নতুন ফুর্তি করতে লেগেছে। যাত্রার দলে ঢুকেছি। জয়দেবের মেলা গেলাম; সেখানে দেখা এক বামুনের মেয়ের সঙ্গে। নতুন বউ। রূপ যেন ফেটে পড়েছে। গোবিন্দ মন্দির থেকে বেরিয়ে এল, মনে হ'ল সাক্ষাৎ রাধা। কেষ্টদাসেরও তখন নতুন বয়স, তারও রূপ তখন লোকে দাঁড়িয়ে দেখে। যাত্রার দলে সে সাজত অভিমন্যু। অভিমন্যু বধ হ'ত, লোকে ঝরঝর করে কাঁদত তার ওই রূপের জন্যে।

গোবিন্দ॥ তার পর?

ব্রাহ্মণ॥ পরের দিন অজয়ের ঘাটে দেখা। মেয়েটি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইল কেষ্টদাসের দিকে।

গোবিন্দ ॥ তার পর ?

ব্রাহ্মণ ॥ তার পর আর কি ? মেয়েটি গিয়েছিল বাপের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে। স্বামী সঙ্গে ছিল না। পর পর তিন দিন কেষ্টর সঙ্গে দেখা হ'ল মেলায়। তিন দিনের দিন কাউকে কোনও কথা না ব'লে কেষ্ট হ'ল উধাও। মেয়েটিকেও আর দেখলাম না। দলে গণ্ডগোল শুনলাম। কেউ বললে কিছু, কেউ বললে কিছু। আমি সব বুঝলাম। বাড়ি ফিরলাম, দেখলাম, কেষ্ট তাকে বউ সাজিয়ে বাড়ি এনে তুলেছে।

গোবিন্দ ॥ তার পর ?

ব্রাহ্মণ ॥ তার পর আর কি বল ?

গোবিন্দ ॥ কি বলেছে কেষ্টদাসের বউ, তাই বল ?

ব্রাহ্মণ ॥ বলেছে, জোড়হাত ক'রে বলেছে, জমি নাও, থালা-বাসন আর নাই কিছু, তবে যা আছে তাই নাও, শুধু ঘরটুকু আর ওই বিগ্রহ ঠাকুর, এই দুটি ছেড়ে দাও।

গোবিন্দ ॥ বটে !

ব্রাহ্মণ ॥ বলেছে—বামুন ঠাকুরপো, তুমি ব'লো, ঘর নিলে আমি দাঁড়াব কোথায় ? আর ঠাকুর নিলে আমি কি নিয়ে থাকব।

গোবিন্দ ॥ হুঁ। মেয়েটি রসিকা বটে ! বামুনের ঘরে জন্ম, বৈষ্ণবের প্রেমে দীক্ষা, রসিকা হওয়ারই তো কথা। কিন্তু কি জান ঠাকুর, টাকার কারবারে রস নেই, ও হ'ল শুকনো কারবার। আমি গাঙুলী মহাজনকে খরচা সমেত বারো শো টাকা গুনে দিয়েছি। আর এই টাকা বারো বছর ভিক্ষে ক'রে একটি একটি পয়সা ক'রে জমিয়েছি।

ব্রাহ্মণ ॥ সে তা বলেছে।

গোবিন্দ ॥ বলেছে ! কৃষ্ণদাসের বোষ্টুমী তো শুধু রসিকাই নয়, সন্ধানীও বটে। অনেক সন্ধানী। কি বলেছে শুনি ?

ব্রাহ্মণ ॥ বলেছে, সবই জানে সে। জেনে শুনেই বলেছে, ভিক্ষে চাইছে। দিলে তোমার ধর্ম হবে। প্রভুর রাজ্যে এখানে দয়া করলে সেখানে পায়, এখানে যা পেলে না সেখানে তা পাবে।

গোবিন্দ ॥ ভাল, আমার উত্তর শোন। আমি বোষ্টম হয়েও সুদী কারবারী। ভক্তিপথের মহাজনি আমার নয়, দেনা-পাওনার মহাজনি আমার ; আমার হ'ল ডান হাতে নাও, বাঁ হাতে দাও। ফেল কড়ি মাখ তেল। বুঝেছ ঠাকুর ! আমি যে দিন এখানে আসি সেই দিন থেকে ওই ঠাকুর আখড়া

গোবিন্দ ॥ কি ? (গোবিন্দ যেন এখনও ঠিক ধারণা করতে পারলে না)

নেপথ্য ॥ কলসী – একটা কলসী !

গোবিন্দ ॥ (এবার সপ্রতিভ হয়ে উঠল) কেষ্ট দাসের বোষ্টমী ?

[নারকেল গাছের আড়াল থেকে ২৯।৩০ বছরের একটি সুশ্রী তরুণী আধ-ঘোমটা টেনে সামনে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা গেল না—তবু বোঝা গেল]

গোবিন্দ ॥ (আবার বললে) কৃষ্ণ-ভা-মিনী ! গরবিনী !

ভামিনী ॥ না। আমি সতী।

গোবিন্দ ॥ সতী ? বল কি ? সতী ?

ভামিনী ॥ হ্যাঁ, কলঙ্কিনী সতী। তুমি কুসুমপুরের গাইয়ে কালো গোস্বামী, তোমার স্ত্রী কলঙ্কিনী সতী।

গোবিন্দ। না না। তুমি কৃষ্ণদাসের কৃষ্ণভামিনী। বড় ভাল নাম নিয়েছ। একেবারে প্রেমে ডগমগ ? ত্রিলোক সংসারে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী সুখী। কিন্তু কি ভিক্ষে চাইতে এসেছ বললে ? কলসী ? না ?

ভামিনী ॥ হ্যাঁ, কলসী।

গোবিন্দ ॥ আমার গান শুনেছ বুঝি ? "যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না।"

ভামিনী ॥ শুনেছি। শুনেই চাইলাম। নইলে—

গোবিন্দ ॥ নইলে, কি চাইতে ? বল তো শুনি ? কি চাইতে এসেছিলে ? দাঁড়াও, দাঁড়াও।

ভামিনী ॥ আমি তোমার কাছে—

গোবিন্দ ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। সবুর কর। আগে—

ভামিনী। কি ?

গোবিন্দ ॥ সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে কখন। আলো জ্বালা হয় নি। মনের ভুল দেখ দেখি !

ভামিনী ॥ কি দরকার ?

"চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবনে নীল মানিকের আলো জ্বলে ;
রাধার কুঞ্জ আঁধার সেথা রাধা ভাসে নয়নজলে।"

—এ তো তোমারই গান। যেদিন এখানে এসে আমার সন্ধান পেয়ে আমাদের আখড়ায় গিয়েছিলে, সেদিন এই গানটাই শুনিয়ে এসেছিলে। রাধার কান্না দেখে কি করবে ? আলো থাক্।

গোবিন্দ ॥ তুমি কি আমাকে সেই দিনই দেখে চিনেছিলে ? গোঁফ, দাড়ি, চুল—

ভামিনী ॥ তবু চিনেছিলাম। তোমার কপালের ওই দাগ দেখে চিনেছিলাম।

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ। ফুলশয্যার রাত্রে—

ভামিনী ॥ হ্যাঁ। আমি ধরা দিতে চাই নি, তুমি জোর ক'রে টেনেছিলে, আমি হাত ছুঁড়েছিলাম, আমার হাতের বালায় তোমার কপালে, ডান ভুরুর উপরে লম্বা হয়ে কেটে গিয়েছিল।

গোবিন্দ ॥ আমি কালো, কুৎসিত, আমার বয়স বেশি ব'লে তুমি কেঁদেছিলে। তুমি রূপসী—

ভামিনী ॥ হ্যাঁ, আমি রূপসী ছিলাম। রূপ আমার ছিল। আজও আছে। তুমি কুৎসিত, কালো, তোমার নাকের ডগায় ওই আঁচিল। সেদিন চোদ্দ বছরের রূপসী মেয়ে সতী তোমাকে দেখে কেঁদেছিল; তোমাকে তার পছন্দ হয় নি। সেদিন ওই তোমার কপালের দাগ দেখেই তো শুধু চিনি নি, ওই আঁচিলটা দেখেও চিনেছিলাম।

গোবিন্দ ॥ ওঃ! সাক্ষাৎ সতী! ষোল বছরেও আমার মূর্তি তোমার হৃদয়পটে এতটুকু মলিন হয় নি!

ভামিনী ॥ ছেলেবেলায় পট দেখিয়ে গান করতে আসত পটুয়ারা; তারা যমদূতের ছবি দেখাত, নরকের ছবি দেখাত, তাও হৃদয়পটে তেমনি আঁকা আছে গোঁসাই।

গোবিন্দ ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। আলোটা জ্বালি, কথায় কথায় ভুলেই যাচ্ছি।

ভামিনী ॥ আলো থাক্ গোঁসাই, আলো থাক্।

গোবিন্দ ॥ লজ্জা! (হা-হা ক'রে হেসে উঠল) সূর্য-চন্দ্র আকাশে আছে চিরকাল। যে দিন তোমার আমার বিয়ে হয়েছিল, সে দিন তাদের সাক্ষী মেনেছিলাম। তারা আজও আছে। এখানে অন্য কেউ তোমার পরিচয় না জানুক, তারা তো জানে। তাদের সামনে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় না তোমার?

ভামিনী ॥ না। লজ্জা আমার নাই। ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়। গোঁসাই, যাত্রার আসরে অভিমন্যুকে দেখে মনে হ'ল, আমি জন্ম-জন্মান্তরের উত্তরা। পরদিন দেখা হ'ল ঘাটে; কুল ভাবলাম না, জাত ভাবলাম না, ঝাঁপ দিলাম। লজ্জা ঘেন্না সব ভাসিয়ে দিলাম অজয়ের জলে। অজয়ের ঘাটে কোনদিন আমি চান করি না। ভয়ে করি না গোঁসাই। যদি আবার সেগুলো অজয় ফিরে দেয়! লজ্জা আমার নাই।

গোবিন্দ ॥ তবে ?

ভামিনী ॥ তোমারও লজ্জা নাই, কিন্তু মনে তোমার ঘা আছে, সেই ঘায়ে আবার ঘা খাবে। বুকের ভেতরটা তোমার রক্তারক্তি হয়ে যাবে। আমি এখন আরও রূপসী হয়েছি গোঁসাই। সে দেখলে—

গোবিন্দ ॥ দেখেছি। দেখেছি।

ভামিনী ॥ সেও বারো বছর আগে। বারো বছরে রূপ আমার আরও বেড়েছে। বয়স আমার যত বাড়ছে গোঁসাই, রূপ আমার তত ফুটছে। আমাকে দেখে যদি আয়নাতে তোমার চোখ পড়ে গোঁসাই, তবে তুমি আবার পাগল হয়ে যাবে।

গোবিন্দ ॥ তাই যাব। তবু তোমাকে দেখব।

ভামিনী ॥ ভাল। জ্বাল তবে আলো।

গোবিন্দ ॥ (হাত ধরলে ভামিনীর) ঘরে এস।

ভামিনী ॥ ঘরে? কিন্তু আর তো আমি তোমার ঘরণী নই।

[গোবিন্দ কথার উত্তর দিলে না, জোর ক'রেই যেন টানলে।]

ভামিনী ॥ জোর ক'রে নিয়ে যাবে ঘরে? চল। কিন্তু মানুষ পাখী নয় গোঁসাই, খাঁচায় পাখী পুষলে, পাখী শেখানো বুলি ব'লে শিষ দেয়। মানুষ দেয় না। মানুষকে বাঁধাও যায় না, কেনাও যায় না।

[কথা বলতে বলতেই সে গোবিন্দ দাসের সঙ্গে ঘরের মধ্যে গেল ও একটি আলো জেলে আনল]

গোবিন্দ ॥ তা জানি। তোমাকে আমি হাজার টাকা পণ দিয়ে কিনে বিয়ে করেছিলাম। এক দুই তিন ক'রে গুণে—

[বলতে বলতে সে আলোটা তুলে ধরলে। এবং আলোর ছটা ভামিনীর মুখের উপর পড়তেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। এমন রূপ এমন শ্রী এই ভ্রষ্টা দুঃখিনী মেয়েটির! স্তব্ধ হয়ে সে দেখতে লাগল।]

ভামিনী ॥ কি গোঁসাই, কি হ'ল?

গোবিন্দ ॥ (চোখ তার ঝকমক ক'রে উঠল) আমাদের কুল ছিল না; কন্যাপণ দিতে হ'ত।

[সে আলোটা নামালে।]

ভামিনী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। এক দুই তিন চার পাঁচ ক'রে বিয়ের আসরে তুমি আমার বাবাকে এক হাজার টাকা পণ দিয়েছিলে; সে আমার মনে আছে; বিয়ের সময় আমার বয়স ছিল চোদ্দ বছর; শিশু ছিলাম না, মনে আছে সে কথা।

গোবিন্দ॥ (দরজার কাছে গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে) সেই এক হাজার টাকার আজ শোধ নেব।

[ভামিনীর ঠোঁটে বিচিত্র হাস্যরেখা ফুটে উঠল। সে উত্তর দিলে না।]

গোবিন্দ॥ বাল্যাবধি আমি কুৎসিত—মনে মনে তার দুঃখ, কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের অন্ধকারের দুঃখের মতই গভীর ছিল আমার। দরিদ্র শুক্র-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ-ঘরের সন্তান, বিয়ের সংকল্প আমার ছিল না। এক সান্ত্বনা ছিল—সম্পদ ছিল—কণ্ঠস্বর, গুণী ওস্তাদ গলা শুনে ছেলে বয়সেই আমাকে কাছে টেনেছিলেন, গান শিখিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন--বাবা, ব্রহ্মচর্য যদি রাখতে পার তবে ভগবান মিলবে। বয়স হ'ল, নাম হ'ল, খ্যাতি হ'ল, পয়সার মুখ দেখলাম। বিয়ে করি নি, মেয়েদের মুখের দিকে চাই নি। পঁচিশ বছর, তিরিশ বছর, তেত্রিশ বছর কাটল, চৌত্রিশ বছর বয়সে তোমাকে দেখলাম। শিবরাত্রিতে বক্রেশ্বরে মহাদেবকে গান শোনাতে গিয়েছিলাম। রাত্রে দেখলাম, চুল এলো ক'রে লালপেড়ে শাড়ি পরনে, কপালে সিঁদুরের টিপ, কুমারী মেয়ে, গলায় আঁচল দিয়ে, শিবের সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে পূজো করছে। মনে হ'ল, সাক্ষাৎ গৌরী—উমা। পরদিন আবার দেখলাম দিনের আলোতে। আমি গুরুর উপদেশ ভুললাম, ভগবান পাওয়ার সংকল্পে জলাঞ্জলি দিলাম, তোমাকে পাবার জন্যে পাগল হলাম। তোমার বাবার কাছে লোক পাঠালাম; পাঁচ শো, সাত শো, আট শো, হাজার—। একদিন যা বললে তোমার বাবা, পরের দিন বললে, না, ওতে হবে না, আরও চাই। তাই—তাই দোব। হাজার টাকা—তাই দিতে চাইলাম। শুধু তাই নয়। আমার পুরনো ভাঙা ঘর, নতুন ক'রে সাজালাম। টিন দিলাম, মেঝে বাঁধলাম, দেওয়ালে কলি দিলাম, উঠানে তোমার পায়ে ধূলো-কাদা লাগবে ব'লে উঠান বাঁধালাম। তার পর তোমাকে বিয়ে ক'রে ঘরে আনলাম।

ভামিনী॥ গোঁসাই, এক কথা বিশবার শুনতে ভাল লাগে না। ওসব আমি জানি, তা ছাড়া ও-কথা আজ নিয়ে তোমার তিনবার বলা হ'ল। ফুলশয্যার রাত্রে—তুমি কুৎসিত, তুমি কালো, তোমার নাকে আঁচিল ব'লে আমি কেঁদেছিলাম। আমার রূপ দেখে তুমি ভগবান ভুলেছিলে; তোমার দেহে রূপ ছিল না ব'লে আমি যদি কেঁদে ভগবানকে ডেকে থাকি, ব'লে থাকি—আমার কপালে তুমি এই লিখেছিলে, তবে সেটা কি আমার খুব অপরাধ হয়েছিল?

গোবিন্দ ॥ না, তোমার অপরাধ হয় নি ; অপরাধ হয়েছিল আমার।

ভামিনী ॥ হয়েছিল। হাজার বার। হয় নি? লোকে বলত, আমি রাজরাণী হব, রাজপুত্র এসে আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে। তার বদলে তুমি এলে। অপরাধ হয় নি?

গোবিন্দ ॥ নিশ্চয়। কিন্তু তোমার বাবা টাকা নিয়ে—

ভামিনী ॥ টাকা! টাকা! টাকা! বাবা টাকা নিয়েছিল, বাবার মুখে কালি লেপে দিয়ে চ'লে এসেছি। তুমি টাকা দিয়ে কিনেছিলে, তোমার বুকে আগুন জেলে দিয়ে চ'লে এসেছি। গোঁসাই, ফুলশয্যার রাত্রে কেঁদেছিলাম ; কিন্তু পরে হয়তো বুঝতাম, অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিতাম, তোমার এমন গান—ওই গান শুনেও তোমাকে ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে এই কথা, যে কথাটা আজ নিয়ে তিনবার বলা হল। বলেছিলে, হাজার টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ তুমি। আমার দাম হাজার টাকা গোঁসাই? আমি হাজার টাকায় বিক্রী হই?

গোবিন্দ ॥ ভুল হয়েছিল। তোমার দাম একটা কানাকড়ি।

ভামিনী ॥ না। রূপ। যা দেখে তুমি ভগবানকে কানাকড়ির মত ফেলে দিয়েছ, যার জন্যে চার বছর পাগল হয়ে ঘুরেছ, যার সন্ধান পেয়ে ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত দিয়ে বোষ্টম হয়ে আখড়া বেঁধে একটি একটি ক'রে পয়সা জমিয়ে—কেষ্টদাসের আখড়া কিনেছ, বিগ্রহ কিনেছ, সেই রূপ। আমার দাম নাই। টাকায় হয় না। তাই ওই রূপের পায়ে আমার রূপ বিলিয়ে দিয়েছি। আমি পেয়েছি। তুমি পাও নি। পেলে না।

গোবিন্দ ॥ বলছ কি? পেলাম না? না? (উচ্চহাসি হেসে উঠল)

ভামিনী ॥ হাসছ গোঁসাই? হাস। হাসি তোমার মিথ্যে।

গোবিন্দ ॥ মিথ্যে? (হাসি তার থেমে গেল) না, মিথ্যে নয়। এবার পেয়েছি। আজ পাব।

ভামিনী ॥ ভাল, কি দেবে আমাকে?

গোবিন্দ ॥ কি দেব? এত দিয়েছি—

ভামিনী ॥ কি দিয়েছ? বল?

গোবিন্দ ॥ আবার তুমিই সেই টাকার কথা তুলছ। আমি টাকা ছাড়া কিছু বুঝি না। আমি দিয়েছি টাকা, এক হাজার টাকা—

ভামিনী ॥ সে দিয়েছ আমার বাবাকে। বারো শো চোদ্দ শো টাকা খরচ

করেছ—বিগ্রহ আখড়া উপলক্ষ্য, সে আমি জানি। লক্ষ্য আমি। কিন্তু সে টাকাও পেয়েছে কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব। আমি কি পেয়েছি? কি দেবে আমাকে বল?

গোবিন্দ ॥ সব—সব। আমার যা আছে সব।

ভামিনী ॥ না। ও চাইতে আমি আসি নি। আমি যা চাইব তা দেবে বল?

গোবিন্দ ॥ বল, কি নেবে?

ভামিনী ॥ চাইতে এসেছিলাম বিগ্রহ। এসে আখড়ার পিছন দিক দিয়ে আখড়ায় ঢুকছি, শুনলাম তুমি গাইছ "সাধের কলস গলায় বেঁধে যমুনায় ডুব দিয়ে আর উঠব না"। শুনে তোমাকে এসে চেয়েছি কলসী। দুটোর যা হয় দিয়ো। বিগ্রহ যদি পাই তবে তোমার সঙ্গে বাসর সেরে তাঁর পায়ে বিলিয়ে দেব নিজেকে। না হ'লে ওই কলসীটা নিয়ে নামব গিয়ে অজয়ের কলঙ্কিনীর দহে।

গোবিন্দ ॥ শোন সতী। আমি তোমার জন্য তপস্যা করেছি।

[ভামিনী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।]

গোবিন্দ ॥ হেসো না সতী, হেসো না। শোন।

ভামিনী ॥ ভাল, আর হাসব না, বল।

গোবিন্দ ॥ আজ আমিও বৈষ্ণব, তুমিও বৈষ্ণব। গৃহস্থ নই, আখড়াধারী। আমাদের প্রথা যখন আছে, তখন তুমি ফিরে এস। কৃষ্ণদাসকে ছেড়ে আমার ঘরে এস। এ ঘর—এ আয়োজন সব তোমার জন্যে। সতী!

ভামিনী ॥ না।

গোবিন্দ ॥ সতী!

ভামিনী ॥ না—না। তা ছাড়া আমি আমি আর সতী নই, আমি ভামিনী —কৃষ্ণভামিনী।

গোবিন্দ ॥ তবে তুমি বিগ্রহ পাবে না ভামিনী। কলসীই তোমাকে নিতে হবে।

ভামিনী ॥ তাই দিয়ো। তা হ'লে বাসর পাত। আলো···

[আলোটার শিখা এতক্ষণ বিশেষ উজ্জ্বল ছিল না, এবার উজ্জ্বল ক'রে দিলে ভামিনী। গায়ে একখানি চাদর জড়ানো ছিল। চাদরখানি খুলে ফেললে সে। গোবিন্দের মুখের দিকে চেয়ে হাসলে।]

শপথ ভাঙতে পাবে না। কলসী আমাকে দিতে হবে।

[গোবিন্দ ভামিনীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এতক্ষণ অনুজ্জ্বল আলোর মধ্যে উত্তেজনাবশে মুখের দিকে তাকিয়েই কথা বলছে। এবার উজ্জ্বল আলোয় তার দিকে তাকিয়ে আপাদমস্তক দেখে চমকে উঠল। চাপা গলায় ব'লে উঠল, ভামিনী !]

ভামিনী ॥ কি ? কি হ'ল ?

গোবিন্দ ॥ তুমি মা হবে ? তোমার কোলে—

ভামিনী ॥ হ্যাঁ। আমার কোলে চাঁদ আসবে। .

গোবিন্দ ॥ ভাগ্যবান কৃষ্ণদাস। এতকাল পরে পথের ভিক্ষুক হয়ে—

ভামিনী ॥ না—না—না। সে দুর্ভাগা তুমি। কালো গোঁসাই, তুমি।

গোবিন্দ ॥ ভামিনী ! বাহবা !

ভামিনী ॥ বাহবা নয় গোঁসাই, বাহবা নয়। সাক্ষী আছে আহ্লাদী।

গোবিন্দ ॥ (চমকে উঠল) আহ্লাদী ?

ভামিনী ॥ হ্যাঁ। গোঁসাই, আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু ঠকাই নি। বিয়ের প্রথম দিন থেকে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ঠকিয়েছ নিজে নিজেকে। গোঁসাই, টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ ভেবে তুমি নিজেকে নিজে ঠকিয়েছিলে। গোঁসাই, তার পর এখানে এসে জাত দিয়ে টাকা জমিয়ে ভেবেছিলে, আমার তপস্যা করছ। অন্তত তাই তুমি বললে। সত্যি হ'লে নিজেকে নিজে ঠকিয়েছ। তুমি আক্রোশ মেটাবার জন্যে তপস্যা করেছিলে। আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে সুখ পাবে। সম্ভব হ'লে এই ভাবে আমাকে ধূলোয় ফেলে লাথি মেরে সুখ পাবে। গোঁসাই, তুমি আহ্লাদীর নেশায় পড়েছিলে মনে পড়ছে ? বেশি দিন আগে তো নয়, এই মাস সাতেক আগে। বল। লজ্জা তোমার নাই। আর আমার কাছেই বা লজ্জা কি তোমার !

গোবিন্দ ॥ হ্যাঁ। কেনই বা লজ্জা করব ? হ্যাঁ। আহ্লাদীকে আমার ভাল লেগেছিল। আমি তাকে—

ভামিনী ॥ তুমি তাকে বলেছিলে, প্রতি বাসরে দশ টাকা ক'রে দেবে।

গোবিন্দ ॥ বলেছিলাম।

ভামিনী ॥ কিন্তু আহ্লাদী যে আহ্লাদী, সেও তোমার এই কুৎসিত রূপ দেখে বলেছিল—না।

গোবিন্দ ॥ মিছে কথা। টাকায় সব হয়। সে এসেছিল পাঁচ রাত্রি।

ভামিনী ॥ হ্যাঁ, পাঁচ রাত্রি। আহ্লাদীর শয্যায় অন্ধকার ঘরে আলো না-জ্বালার কড়ারে তুমি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলে। আহ্লাদী তোমাকে

বলেছিল, আলো জ্বালালে তোমার মুখ আমার চোখে পড়বে, আমি ঘেন্নায় ম'রে যাব। বল তুমি, এই শর্ত হয়েছিল কি না?

গোবিন্দ॥ হ্যাঁ, হয়েছিল।

ভামিনী॥ আহ্লাদী আমাকে একদিন বললে। কৃষ্ণদাসের তখন কঠিন অসুখ। আহ্লাদী তাকে দেখতে আসত। সেও তার রূপে মজেছিল। বললে, ওই নরকের প্রেতের মতন চেহারা, ওর কথা শোন দেখি দিদি? সে এই বলে। মরণ আমার! জলে ডুবে মরব আমি, তবু না। এই দিন এলে ওকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব। তখন আমার ঘরে কঠিন অবস্থা। মানুষটা হাঁপানিতে যায় যায়। ওদিকে বিগ্রহের সেবা হয় না। কৃষ্ণদাস আমাকে বললে, তুই যা। ওকে যদি হাতে করতে পারিস, সব রক্ষে হবে। কৃষ্ণদাসের অরুচি নাই, ঘেন্না নাই, সে সব পারে। আমার উপর তার নেশাও ছুটেছে। নেশা তার আহ্লাদীর ওপর। রাজী প্রথমটা হতে পারি নি। একদিন বিগ্রহের সেবা হ'ল খুদ রান্না ক'রে। প্রসাদ ক'টি কৃষ্ণদাস খেলে; আমি উপোস করে রইলাম। সন্ধ্যেবেলা বিগ্রহের পায়ে মাথা কুটে কাঁদলাম। তারপর মন বাঁধলাম। আহ্লাদীকে বললাম, লোকটাকে তুই 'হ্যাঁ' বল্। তোর বদলে ঘরে থাকব আমি। তোর তো নামের ভয় নাই! দেখ্ তা হ'লে লোকটা বাঁচে। আমিই শর্ত বলে দিলাম। তুমি রাজী হ'লে। আহ্লাদী রইল কেষ্টদাসের শিয়রে, আমি ব'সে রইলাম আহ্লাদীর ঘরে, তারই শয্যায়। তুমি এলে। আংটিটা চিনতে পার? কার বন্ধকী আংটি তুমি দিয়েছিলে সোহাগ ক'রে? এই দেখ।

[ভামিনী হাত বাড়িয়ে ধরলে]

গোবিন্দ॥ (সভয়ে পিছিয়ে গেল) স-তী!

ভামিনী॥ হ্যাঁ, আমি সতী। তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম; কিন্তু তবু তোমার পাপের ফল আমার গর্ভে। এর পর হয় ওই বিগ্রহ, নয় কলসী ছাড়া আমার আশ্রয় আর কি বলতে পার? তবে বিশ্বাস কর, ওই বিগ্রহকে স্মরণ ক'রেই প্রতি রাত্রির অভিসারে যাত্রা করেছি। প্রণাম ক'রে গিয়েছি। কৃষ্ণদাসের সন্তান ষোল বৎসর হয় নি। এ আমার পঞ্চতপার ফল। এ তোমার সন্তান। প্রভুর দান।

গোবিন্দ॥ আমাকে তুমি মার্জনা কর সতী, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ভামিনী॥ মার্জনা! (হাসলে) আমার কাছে নয়। যার কাছে অপরাধ

তার কাছে চাও। কিন্তু আমি আর পারছি না গোঁসাই। আমি আর পারছি না!

[সে হঠাৎ ঝড়ে-ভাঙা গাছের মত ঘরের শয্যার উপর যেন ভেঙ্গেই পড়ল। তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। গোবিন্দ তার মাথার কাছে বসল। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল]

গোবিন্দ ॥ তুমি আজ সারা দিন কিছু খাও নি, না?

[ভামিনী উত্তর দিল না]

গোবিন্দ ॥ খাওয়া হবে কি ক'রে? আজ আহারের পূর্বেই আমার লোকেরা গিয়ে ঘর দখল করেছে। কিছু খাও সতী।

ভামিনী ॥ (মাথা নাড়লে) না—না।

গোবিন্দ ॥ না, আমার হাতে তোমাকে খেতে হবে না। একদিন উপবাসে মানুষ মরে না। তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও।

[গোবিন্দ মাথায় হাত বুলোতে লাগল, ভামিনী ধীরে ধীরে শান্ত নিথর হয়ে এল।]

গোবিন্দ ॥ সতী! সতী! (উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলে) সতী। (মাথা ধরে নাড়া দিলে)—সতী। একি! তবে কি—মূর্ছিত হয়ে পড়ল!

[একবার মাথায় হাত দিল, উঠে গিয়ে জলের ঘটি নিয়ে মাথায় জল দিতে যেয়ে থমকে দাঁড়াল—কি ভাবতে ভাবতে জলো হাত মাথায় দিল—আরো অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল—চোখে মুখে অদ্ভুত ভাবান্তর]

ভালই হ'ল (অদ্ভুত হাসি দিয়ে গুণগুণ করে গান ধরলে—)

(হঠাৎ) গোলকধাঁধার বাইরে এলাম এলাম কোন পারে
এ-পার ও-পার নাই পারাপার গভীর অন্ধকারে
ও বৃন্দে সখী, বলে দে দিশে
কৃষ্ণ আমার কালী হ'ল (আমি) পূজিব কিসে?
চন্দন সিন্দূর হ'ল শ্মশান বাসর ধারে
এলাম কোন পারে!

[গান থামলেও সুর থামল না, সতীর কাছে তার একবার এগিয়ে গেল, নীচু হয়ে নিঃশ্বাস পরীক্ষা করল—আবার গানের শেষ পংক্তি গাইতে আরম্ভ করল—এবং ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল]

[ধীরে ধীরে সকাল হয়ে এল। পাখীর ডাকে চকিত হয়ে জেগে উঠল ভামিনী। চাদরখানা গায়ে টেনে নিলে]

ভামিনী ॥ গোঁসাই! গোঁসাই! গোঁসাই! আমি চললাম গোঁসাই।

[ভামিনী বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কোলাহল করতে করতে একটি জনতা এগিয়ে এল। সামনেই হরিচরণ ঘোষ। ভামিনী পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল]

হরি ॥ দাঁড়াও। গোবিন্দ দাসের খবর শুনেছ?

ভামিনী ॥ (বিস্মিত ও আতঙ্কিত ভাবে) কেন গোঁসাই তো ঘরেই।

হরি ॥ না, ঘরে সে নেই।

ভামিনী ॥ ঘরে নেই! গোঁসাই—গোঁসাই! (আর্তস্বরে ডাকতে ডাকতে ঘরে গিয়ে আবার ফিরে এল। হতবিহ্বল হ'য়ে পড়ল যেন) না—গোঁসাই ঘরে নেই।

হরি ॥ ঘরে আর সে কোনো দিনই ফিরবে না, ভামিনী। গোবিন্দ দাস তোমাকেই এই সব দিয়ে গিয়েছে। বিগ্রহের সেবায়েত করে গিয়েছে। তোমার পর তোমার ছেলে হবে সেবায়েত। পাগল, কাল তখন অনেক রাত্রি, আমাকে ডেকে তুলে এই সব ব্যবস্থা ক'রে—

ভামিনী ॥ (রাঙা হয়ে উঠল) কিন্তু কোথায় গেল সে? সে কই? গিয়েছে বলছেন, কোথায় গেল?

হরি ॥ আমাকে বললে, বৃন্দাবন যাবে। বললে, এ ভোলে আর নয় ঘোষ মশায়, ভোল পাল্টে ফিরব। তারপর সকালে দেখি, কলঙ্কিনীর দহে তার দেহটা ভাসছে। ওই নিয়ে আসছে।

ভামিনী ॥ গোঁ-সা-ই—(একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল)।

রাজপুরী

মন্মথ রায়

[কোশল-রাজধানী শ্রাবস্তী। রাজা প্রসেনজিৎএর রাজপ্রাসাদ মধ্যস্থ মহাসমারোহে-সজ্জিত উদ্যান-ভবন। বাহিরে পূর্ণিমার জোৎস্না-স্নাত কুঞ্জবীথি। সম্মুখে শ্বেত পাথরের অঙ্গনে ঝর্ণা। কক্ষ মধ্যে সহস্র প্রদীপের পূর্ণদীপ্তি।

চৈত্র মাসের বসন্ত-উৎসব। আজ কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্ম-তিথি বলিয়া বসন্তোৎসবের বিচিত্র গরিমা সমধিক বর্ধিত।

কুঞ্জ-বীথির অন্তরালে, ঝর্ণার চারি পাশে, প্রাসাদকক্ষের মধ্যে আবির কুঙ্কুম ও রং লইয়া রাজান্তঃপুরের নরনারী উৎসবমত্ত।

দৃশ্য-পট উত্তোলিত হইলে দেখা গেল সেই পরিপূর্ণ উৎসবের উন্মত্ত বিশৃঙ্খলা,—আর শোনা গেল অজস্র কণ্ঠের বিচিত্র কলগান। সহসা ভেরী ও দামামা বাজিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ পুরুষগণ "রাজা" এবং নারীগণ "রাণী" "রাণী" বলিয়া চীৎকার করিয়া সকলে কক্ষমধ্যে যথাশীঘ্র সমবেত হইলেন।

কক্ষের তিনটি দরজা। দক্ষিণের ও বামের দরজা দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র···কিন্তু মধ্যের দরজাটি সুবিশাল। মধ্যের এই সুবিশাল দরজাটি ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। এই দরজা দিয়া রাণী বাসবক্ষত্রিয়া তাঁহার তিন বৎসর বয়স্ক শিশু-পুত্র কুমার রাজশেখরকে দুইহস্তে উর্ধ্বে ধারণপূর্বক নাচাইতে নাচাইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই-ছিলেন রাজা প্রসেনজিৎ···তাঁহার হাতে ছিল একটি স্বর্ণ-পেটিকা। রাজা ও রাণী কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেই তাঁহাদের এক পার্শ্বে পুরুষগণ ও অন্য পার্শ্বে নারীগণ রংএর পিচকারী হস্তে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রং-ক্রীড়া করিতে করিতে গান করিতে লাগিলেন।

—গান শেষ হইলে সকলেই আভূমি নত হইয়া রাজা-রাণীকে অভিবাদন করিলেন]

রাজা ॥ [দুই হস্ত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি! [তাহার পর]—উৎসব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তোমাদের জন্যে ভগবান বুদ্ধের শ্রীচরণে আবির কুঙ্কুম নিবেদন ক'রে সেই চরণাশিস এনেছি। রাণী! কুমারকে আমার কোলে দিয়ে তুমি এই চরণাশিসের ডালি নাও···সবার কপালে এই মঙ্গল-ধূলির টিপ্ দিয়ে দাও···

রাণী ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] আমি !

রাজা ॥ হাঁ, তুমি।

রাণী ॥ না রাজা,—তুমিই দাও···চেয়ে দেখ রাজশেখর এই রংএর খেলা দেখে কেমন খুসী হয়ে উঠেছে !···ওর এই পদ্ম-আঁখি ছুটিতে কেমন হাসি ফুটে উঠেছে !—কি চোখ !—কি সুন্দর ! [কুমারের চোখে চুম্বন করিতে লাগিলেন]

পুরুষগণ ॥ দিন্···আমাদের মাথায় ভগবানের চরণ-ধূলি দিন্···

নারীগণ ॥ রাণীমা !—আমাদের কপালে ভগবানের ঐ চরণ-ধূলির টিপ্ পরিয়ে দিন্···

রাজা ॥ রাণী !--কুমারকে আমার হাতে দিয়ে এই ডালি ধর···

রাণী ॥ রাজা !—রাজশেখর আমার পানে চেয়ে আছে !···অপলক চোখে চেয়ে আছে !—চরণধূলি তুমিই বিলিয়ে দাও···শেখর ! আমার সোণা ! আমার মাণিক !

[কুমারকে পুনরায় চুম্বন-বন্যায় ভাসাইয়া দিলেন]

রাজা ॥ কিন্তু রাণী, এ মঙ্গলাশিস তোমার পুণ্য-হস্তেই বিতরিত হয়···স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা !

রাণী ॥ আমার পুণ্য-হস্তে ! [কাঁপিয়া উঠিলেন] [সংযত হইয়া কুমারের পানে অপলক দৃষ্টিতে···] না রাজা ! আমাকে ক্ষমা কর।—আমি পার্ব না···আমার মাণিক আমার পানে তাকিয়ে আছে···আমার একটু তৃপ্তি··· থাক্ না !

রাজা ॥ কিন্তু, তুমি যে রাণী শাক্য-কুল-দুহিতা··· ! ভগবান বুদ্ধের পুণ্য-বংশের পূত-রক্তে তোমার জন্ম ! ভারতবর্ষের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ শাক্য-বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ ব'লে ভগবান বুদ্ধের প্রসাদ বিতরণের জন্য সকলে যে তোমার মুখের দিকেই চেয়ে থাকে !

রাণী ॥ আর এই শেখর !···সে কি আমার মুখের দিকে চেয়ে নেই ?—না রাজা, শেখর ভয় পেয়েছে···সে কেঁপে উঠছে···তার আঁখিতারা ভয়ে মিট্ মিট্ কর্ছে···ও কেঁদে উঠবে !—আমি ওকে নিয়ে বাইরে ঐ ঝর্ণার ধারে চললুম···শেখর !—আমার সোণা ! আমার মাণিক ! আমার লক্ষ্মী !

[তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে অঙ্গনের পথে ঝর্ণার দিকে প্রস্থান]

রাজা ॥ রাণী কুমারকে নিয়েই পাগল। আমি এ চরণাশিস তুলে রাখলুম··· রাণী অন্য সময় তোমাদের এ প্রসাদ দেবেন। চল, আমরা কলা-ভবনে

যাই। কুমারের জন্ম-তিথি উপলক্ষে রাণী কপিলাবস্তু থেকে তাঁর পিতা শাক্যরাজার সভাকবি কবিশেখরকে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন—তাঁর গীতি-কাব্য, তাঁর গান···সুন্দর···অতি সুন্দর। যাও, তোমরা সেই সঙ্গীত-সুধায় স্নান করে ধন্য হয়ে এস···রাণীকে সঙ্গে নিয়ে আমিও এখনি যাবো···

[অঙ্গনের পথে রাজা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

[রাজা ধীরে ধীরে অঙ্গনের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাণীকে ডাকিবেন, কি, নিজে রাণীর নিকট যাইবেন চিন্তা করিতে করিতে রাণীকেই ডাক দিলেন···]

—রাণী!

রাণী ॥ [প্রাঙ্গণ হইতেই] আমায় ডাকছো?

রাজা ॥ ডেকে কি কোন দোষ করলুম? [এমন সময় কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া রাণী রাজার নিকট কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

রাণী ॥ [রাজার প্রতি]—রাগ করেছ বুঝি?—কিন্তু, র'সো···,—মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর সহচরী মল্লিকার প্রবেশ] জলতরঙ্গের বাদ্য এনে বাজা···শেখরের চোখে ঘুমের পরী উড়ে এসে চুমো দিক্···[কুমারকে চুম্বন করিয়া মল্লিকার ক্রোড়ে দিলেন। মল্লিকা তাহাকে লইয়া দক্ষিণের দ্বারপথে পার্শ্বস্থ কক্ষে চলিয়া গেল এবং শীঘ্রই জলতরঙ্গের বাদ্য আরম্ভ হইল। সেই মৃদু সুর-লহরীর মধ্যেই রাজারাণী কথোপকথন করিতে লাগিলেন] খুব রাগ করেছ, না?

রাজা ॥ আমি হয় ত রাগ করিনি···কিন্তু, পুরবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তোমার ঐ কল্যাণহস্তের মঙ্গলস্পর্শ থেকে তাদের বঞ্চিত কর্লে কেন রাণী?

রাণী ॥ রাজা!—আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব।—ঠিক উত্তর দেবে?

রাজা ॥ কি রাণী?

রাণী ॥ আমাকে তুমি কি ভাবো?—আমি মানুষ, না দেবী?

রাজা ॥ তুমি দেবী···স্বয়ং ভগবানের পূত-রক্ত তোমার শিরায়···ধমনীতে প্রবাহিত···

রাণী ॥ এবং সেই জন্যই, বৌদ্ধসঙ্ঘে কৌলিন্য লাভের সহজ পন্থা স্বরূপ তুমি তোমার সামন্ত শাক্যরাজকে তোমার রক্তচক্ষুতে বশীভূত করে আমাকে তোমার সহধর্মিণীরূপে গ্রহণ করেছ,—কেমন?

রাজা ॥ ঠিক্।

রাণী ॥ বেশ। কিন্তু, এই আমি যদি ঐ শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ না করতুম

তবে…আমার এই সাধারণ রূপ-সম্পদ নিয়ে এ জীবনে হয়ত তোমার দৃষ্টিই আকর্ষণ কর্তে পার্তুম না…

রাজা॥ পদ্ম কি তার নিজের রূপ নিজে উপলব্ধি কর্তে পারে?

রাণী॥ ও উত্তরে আর কাউকে ভোলাতে পার…কিন্তু, তোমার সত্যিকার উত্তর আমি বেশ জানি। তবে তোমার এ সংসারে আমার জন্মের ভিত্তি-টুকুর উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। সে জন্যই আমি দেবী…সে জন্যই আমি সহধর্মিণী। কিন্তু, রাজা এমনি করেই কি আমাকে দূরে ঠেলতে হয়?

রাজা॥ তার অর্থ?

রাণী॥ আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবতে পার না? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ…জন্ম আমাদের যা-ই হোক্ না কেন!

রাজা॥ কিন্তু তোমার এই জন্ম-গৌরবের উপরই যে বৌদ্ধ-সঙ্ঘে আমার সকল সম্মানের প্রতিষ্ঠা! আজকে সেই পুরানো কথাটি মনে পড়ছে। ষোল বছর পূর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্ঘে আমি তাঁদের জন্য আহার্য পাঠাতুম। কিন্তু, দেখতুম, তাঁরা তা শ্রদ্ধায় গ্রহণ কর্তেন না। একদিন আমি নিজে স্বয়ং ভগবানের নিকট গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। ভগবান বল্লেন, "বন্ধুত্বের দান ভিন্ন অন্য দান গ্রহণ করি না।" শুনলুম "জ্ঞাতিবন্ধুই শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

রাণী॥ তারপর আমাকে গ্রহণ করে সেই জ্ঞাতিত্ব অর্জন করেছ। কিন্তু রসাতলে যাক্ সেই সমাজ…যে সমাজে বন্ধুত্ব জ্ঞাতিত্বের চোরাবালির উপর নির্ভর করে!

রাজা॥ রাণী! তুমি হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন?

রাণী॥ (রাজার প্রতি অতি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) আমি এখন রাত্রিতে ঘুমুতেও যে পারি না রাজা!

রাজা॥ সে আমি দেখেছি। কিন্তু কেন রাণী?

রাণী॥ আমি ভাবি…সারাক্ষণ ভাবি…! …আমি ভয় পাই…ইচ্ছা হয়… ইচ্ছা হয়—

রাজা॥ কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী॥ আমি হয়ত পাগল হব! হব কি, হয়ত হয়েছি,—না রাজা?

রাজা॥ তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী?

রাণী॥ হাসবে না?

রাজা ॥ হাসবো কেন !

রাণী ॥ কাঁদবে না ?

রাজা ॥ কাঁদবো কেন ! ছিঃ রাণী !

রাণী ॥ রাগ কর্বে না ?

রাজা ॥ (রাণীর হাত তুখানি ধরিয়া) তোমার কি ইচ্ছা হয় রাণী ?

রাণী ॥ (অপ্রকৃতিস্থ ভাবে)—আমি আমার এই বসন ভূষণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব···

রাজা ॥ (হাসিয়া) আমার এক রাজ্যখণ্ড-মূল্যে এর চাইতে সহস্রগুণে গরিমাময় বসন-ভূষণ তোমায় আমি পরিয়ে দেব···

রাণী ॥ না রাজা। সেদিন কাশী থেকে যে নর্তকী এসে আমাদের সম্মুখে নৃত্য করেছিল—নৃত্য কর্তে কর্তে অসম্বৃতা হয়ে পড়েছিল। আমি তার সেই অসভ্যতার জন্য তোমার চোখের সম্মুখেই তার মস্তক মুণ্ডন করে দিতে আদেশ দিয়েছিলুম।—মনে পড়ে ?

রাজা ॥ হাঁ, তুমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা কর্লে না···

রাণী ॥ (নিম্নস্বরে চারিদিক চাহিয়া) এখন আমার ইচ্ছে হয়···আমিই তার মত নাচি···দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলি···আত্মার উলঙ্গ মূর্তি নিয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াই !—রাজা ! রাগ কর্লে ?

রাজা ॥ রাণী !—রাজসভায় চল···তোমার পিত্রালয়ের সভা-কবি কবিশেখর এসেছেন,—তিনি গান কর্বেন···হয়ত আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন।

রাণী ॥ (রাজার মুখে কবিশেখরের নাম শুনিয়াই চমকিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ পূর্বক, সহজ সংযত স্বরে) কবিশেখর ! হাঁ, সে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছে। এসেছে,—না ?—কিন্তু, আমি যে আমার বিরূধকের প্রতীক্ষা করছি···তারও তো কবিশেখরের সঙ্গেই শ্রাবস্তীতে ফিরে আসার কথা ···

রাজা ॥ কুমার বিরূধক আর কবিশেখর একসঙ্গেই কপিলাবস্তু থেকে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু, সৈন্যদলের নদী পার হ'তে একটু বিলম্ব হওয়াতে যুবরাজের পুরপ্রবেশেও একটু বিলম্ব হবে। তবু, খুব সম্ভব সে আজ রাত্রিতেই এসে পড়বে···

রাণী ॥ আমি বিরূধকের সঙ্গে দেখা না করে কোনখানে যেতে পার্ব না···

রাজা ॥ এলেই দেখা হবে···

রাণী ॥ না, কারো সঙ্গে তার দেখা হওয়ার পূর্বে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই···

রাজা ॥ বেশ···তা-ই ক'রো···। এখন চল···

রাণী ॥ না, আমি যাব না। আমি তার সঙ্গে সবার আগে গোপনে দেখা কর্ব···

রাজা ॥ কেন রাণী ?

রাণী ॥ (হাসিয়া) কৌতূহল, শুধু কৌতূহল। ছোটবেলাতে সে এসে আমাকে জ্বালাতন কর্ত "মা, আর সব রাজপুত্রদের মামার বাড়ী থেকে কত উপহার আর উপঢৌকন আসে।—আমার আসে না কেন ?" আমি বলতুম "তোমার মামার বাড়ী, সেই কপিলাবস্তু—কত দূ—র! তাই তোমার দাদামশায় বা দিদিমা কিছু পাঠাতে পারেন না।" তারপর এই যোল বছর বয়সে যুবরাজ হয়েই সে জিদ্ ধরল সে কপিলাবস্তুতে যাবে। আমি বাধা দিতে পারলুম না···

রাজা ॥ বাধা দেবেই বা কেন! তোমার বাবা মা তাকে দেখে না জানি কত খুসী-ই হয়েছেন···কত আদর যত্নই না জানি তাকে করেছেন!

রাণী ॥ সে কথা শোনবার জন্যই তো আমি ছট্‌ফট্ কর্ছি—তুমি যাও রাজা ···রাজশেখর একলাটি ঘুমিয়ে রয়েছে, তাকে ফেলে আমি যেতে পার্ব না···

রাজা ॥ কিন্তু তোমাকে রেখে আমি একলাটি সভায় গেলে কবিশেখরের গান জমবে তো ? [রসিকতার হাসিটুকু হাসিয়া বাম পার্শ্বস্থ দরজা দিয়া প্রস্থান। রাণীও দক্ষিণের দরজা দিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিতেছিলেন এমন সময় সহসা বাহিরে অতি তীব্রভাবে ভেরীবাদ্য হইতে লাগিল। রাণী চমকিয়া দাঁড়াইলেন। জলতরঙ্গের বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল]

রাণী ॥ মল্লিকা···

[মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ মা!

রাণী ॥ [উত্তেজিতভাবে] অকস্মাৎ এই ভেরীবাদ্য কেন ?

মল্লিকা ॥ তা তো জানি না মা···

রাণী ॥ [ভয়-মিশ্রিত চাঞ্চল্য ও উত্তেজনায়]—হয় ত বিরূঢক এসেছে!— নিশ্চয়! নিশ্চয়!

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি ॥ না, সে এখনো আসে নি—

রাণী ॥ [ক্রমে, চেষ্টা করিয়া সংযত ও শান্ত হইয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থভাবে] তবে ও বুঝি তোমারি অভিনন্দন ?

কবি ॥ আমার অভিনন্দন তোমার ঐ দৃষ্টি-প্রসাদে।

রাণী ॥ [অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া] বটে ! হুঁ। [ভেরীবাদ্য] তবে ও কি ?

কবি ॥ যুদ্ধের আশঙ্কা।

রাণী ॥ যুদ্ধ ?

কবি ॥ হাঁ, খণ্ডযুদ্ধ। আজ বসন্তোৎসব আর কুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে নগরবাসী প্রমোদমত্ত জেনে গুপ্ত বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়াবে খবর পাওয়া গেছে। সেনাপতির এই সংবাদে এই মাত্র রাজা স্বয়ং দুর্গে চলে গেলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করবার আর সময় না পেয়ে আমাকে দিয়ে তিনি তোমাকে এ খবর পাঠিয়ে দিলেন—

রাণী ॥ [পরিপূর্ণ ঔৎসুক্যে] শেখর !—আমার বিরূধক ?

কবি ॥ ভয় নেই। সে নিরাপদ। তার কাছে খবর গেছে। নগরের বাইরে সে সুগুপ্তভাবে অবস্থান কর্বে।

রাণী ॥ কিন্তু সে নগরে প্রবেশ করার পর—

কবি ॥ রাজা বলে গেলেন কোনই আশঙ্কা নেই। বিদ্রোহীরা ঐ ভেরীবাদ্যে রাজধানী সতর্ক রয়েছে বুঝতে পেরে খুব সম্ভব আর আত্ম-প্রকাশই করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক—

রাণী ॥ [দারুণ উত্তেজনায়] সম্মুখে বিরূধক…তবু আমি নিশ্চিন্ত ! কবি ! এবার কি শুধু ব্যঙ্গ কর্তেই এসেছ।

কবি ॥ কেন রাণী ?

রাণী ॥ আমি মাঝে মাঝে বিস্মিত হই তোমার স্পর্ধা দেখে…আবার পর-ক্ষণেই তোমার ঐ চোখের দিকে যেই চাই—অমনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ি !

কবি ॥ আমি তোমাকে রাজার খবর দিতে এসেছিলাম, এইবার তবে কলা-ভবনে যাই…

রাণী ॥ দাঁড়াও…

কবি ॥ বল…

রাণী ॥ কাছে এস…আরো কাছে এস…

কবি ॥ [অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে আসিয়া] বল…

রাণী ॥ [চারিদিকে চাহিয়া নিম্ন-স্বরে] বিরূধক কি কিছু জেনে এসেছে ?

কবি ॥ সে পথ তো তুমি আগে থেকেই রুদ্ধ করে রেখেছিলে—

রাণী ॥ তবু…যদি কারো বিন্দুমাত্র অসাবধানতায়—

কবি ॥ না, তা হয় নি।—হ'লে আমি শুনতে পেতুম।

রাণী ॥ কবিশেখর !

কবি ॥ রাণী !

রাণী ॥ আর যে আমি পারি না !—এ যে অসহ্য !

কবি ॥ চল, আমি গান গাইব…তুমি শুনবে…

রাণী ॥ কিন্তু, তার আগে আমার গানখানি শোন…শুনবে…

কবি ॥ গাও…

রাণী ॥ তোমার সেই কালো পাখীটি ভালো আছে ?

কবি ॥ কালো পাখী ?

রাণী ॥ তোমার বৌ…সেই "কোকিল"…

কবি ॥ তার নাম ত কোকিল নয়…

রাণী ॥ ও…তবে, তবে…হাঁ, "কাক" ; না ?

কবি ॥ তার নাম "কাকলী"। আমি চললুম…

[প্রস্থানোদ্যত…]

রাণী ॥ না, না, রাগ ক'রো না। আমি ভুলে গিয়েছিলুম। তা তার চোখ ভালো হয়েছে ?

কবি ॥ সে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ…

রাণী ॥ এখনো তুমি তাকে…তেমনি ভালোবাসো…না ?

কবি ॥ [পরিপূর্ণ বিরক্তিতে চলিয়া যাইতেই সহসা ফিরিয়া] তোমার কি মনে হয় ?

রাণী ॥ আমাকে রক্ষা কর। হাঁ, ভালো কথা, তোমার মেয়ে ভালো আছে ?

কবি ॥ আছে।

রাণী ॥ সে দেখতে কেমন হয়েছে কবি ?

কবি ॥ কালো হলেও সে আমাদের কুটীরখানি আলো করে রেখেছে রাণী !

রাণী ॥ কবি ! আর একটি প্রশ্ন তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ব…রাগ কর্বে না ?

কবি ॥ বল রাণী…

রাণী ॥ তোমার মেয়ে দেখতে কার মত হয়েছে কবি ?

কবি ॥ (একটু ভাবিয়া) কেমন করে বলব !

রাণী ॥ এই ধর, তোমার মতো…কি তার মা কাকলীর মতো…কিম্বা…

কবি ॥ ...কিম্বা—

রাণী ॥ (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) এই আমার মতো...

কবি ॥ তার রং হয়েছে তার মার মতো...আর মুখ হয়েছে বোধ হয় কতকটা আমারি মতো...

রাণী ॥ শেখর! শেখর! আমার মত কি তার কিছুই হয় নি... এতটুকুও না?

কবি ॥ —অপরূপ তোমার রূপ।—সে রূপসী হয় নি রাণী!

রাণী ॥ —হুঁ। তার চোখ দুটি ঠিক তোমারি মত হয়েছে, না?

কবি ॥ —হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু, একরত্তি ঐ মেয়েটির উপর তোমারি বা এত আক্রোশ কেন?

রাণী ॥ ...তোমার ঐ চোখ...ও যে অতুল!...অনুপম!—এখন কি ভাবি জানো?

কবি ॥ —কি ভাব রাণী?

রাণী ॥ প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কবি ॥ কি রকম?

রাণী ॥ আমি তোমার ঐ চোখদুটির পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতুম; কিন্তু তুমি আমার পানে ফিরেও তাকাও নি...আজ তোমার ঐ... কাকলীই তার শোধ নিয়েছে...

কবি ॥ আজ আর সে পুরানো কথা কেন?

রাণী ॥ —আজ নয়ই বা কেন? আজ একটা শেষ বোঝা-পড়া হয়ে যাক্। তোমার ঐ চোখ দুটি আমার বড়ই ভাল লাগতো...মনে করে দেখ সেই কিশোর কালের কথা। আমাদের রাজসভায় তুমি গান গাইতে...আমি কখনো নাচতুম কখনো বা বীণা বাজাতুম।...আমার নৃত্যের তালে তালে তোমার গান অগ্নিশিখার মত খেলতো...আমার সুরের ঝঙ্কারে তোমার চোখে মুখে বিদ্যুৎ চমকাতো...

কবি ॥ —মনে আছে। তুমিই আমার কণ্ঠে সুর দিয়েছিলে, প্রাণে গান দিয়েছিলে...

রাণী ॥ (শ্লেষ হাস্যে)—দিয়েছিলুম,...সত্যি?—কিন্তু তার চাইতেও তো আরো বেশী কিছু দিতে চেয়েছিলুম...তবে আমার সে বরমাল্য প্রত্যাখ্যান কর্লে কেন কবি?...তোমার সেই বালিকা বধূ...সেই গ্রাম্যবালা...সেই দৃষ্টিহীনা কালো বৌ-টি...সে কি...

কবি ॥ —রাণী, ক্ষমা কর,—আমি আসি—

[প্রস্থানোদ্যত]

রাণী ॥ [হঠাৎ আদেশসূচক স্বরে] না, যেতে পার্বে না—দাঁড়াও—

কবি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া—সবিস্ময়ে]—এ কি! ও হাঁ…তুমি রাণী…কি আদেশ ?

রাণী ॥ —হ্যাঁ, আমি রাণীই বটে—কিন্তু, এ মণি-মুকুট আমি চাই নি—আমি চেয়েছিলুম তোমার ভাঙা-ঘরের চাঁদের আলো। আমি তো রাজশক্তির দিব্যদৃষ্টি চাই নি। আমি তোমার ঐ পদ্ম-চক্ষুর দৃষ্টিপ্রসাদ চেয়েছিলুম। তুমি বলেছিলে কাকলী কি মনে কর্বে—আমি বলেছিলুম কাকলী যে আকাশের তলে বাস করে সেই একই আকাশে চাঁদও ওঠে—সূর্যও ওঠে…না ?—বল তুমি…

কবি ॥ —ওঠে। কিন্তু সে ছিল কালো, তার উপর সে ছিল দৃষ্টিহীনা, তারো উপর সে ছিল শিক্ষাশূন্যা। তার এই অনন্ত দৈন্যকে আমি তো একদিনও তার দৈন্য মনে কর্তে দিই নি—সে তাই পরিপূর্ণ আশ্বাসে আমার উপর নির্ভর করে ছিল। রাজকন্যাকে তার পাশে এনে দাঁড় করালে সে মনে কর্ত জীবন তার ব্যর্থ—আমি তার রিক্ততা ঐ রাজকন্যাকে দিয়ে পূর্ণ করে নিলুম –

রাণী ॥ হাঁ, তাকে দয়া করে গেলে, কিন্তু আমাকে দয়া কর্তে তোমার হাত উঠলো না। আমিও প্রতিশোধ নিলুম। তারা যখন জোর করে আমার মাথায় কোশলের রাজমুকুট তুলে দিলে, আমি আপত্তি কর্লুম না। আজ আমি তো সেই রাণী!

কবি ॥ কল্পনাতীত সুখেই তো রয়েছ রাণী!

রাণী ॥ সুখে আছি! আর যদি কেউ এই কথা আমায় বলতো…আমি স্বহস্তে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতুম!

কবি ॥ এ পক্ষপাত আমার উপর না হয় না-ই করলে!

রাণী ॥ তোমার ঐ চোখ…তোমার ঐ চোখ…আমি সব ভুলে যাই। [বলিয়াই যেন লজ্জা পাইলেন। পরে সংযত হইয়া]—আমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছি শেখর ?

কবি ॥ অপ্রকৃতিস্থ হবে কেন রাণী ?

রাণী ॥ আচ্ছা কবি, আমার এই নূতন রূপ দেখে কি বুঝেছ ?

কবি ॥ তুমি বসন্তের রাণী বাসন্তী!

রাণী ॥ রং‌এ লাল হয়েছি, না? মূর্খ! এ রং নয়!...এ রক্ত! তাজা রক্ত! টাট্‌কা রক্ত! এ আমার দৈনন্দিন ক্ষরণ!—আর কত যুদ্ধ কর্ব! আর কতদিনই বা যুদ্ধ কর্তে পারি!...শেখর! আমায় বাঁচাও...আমাকে নিয়ে পালিয়ে চল...আমাকে মুক্তি দাও...আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে চল—

[কবির প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন]

কবি ॥ [বিচলিত হইয়া]—কিন্তু রাণী, সে যে এখন সম্পূর্ণ অন্ধ! আঘাত যদি সে পায়, তবে এখনি সে সব চাইতে বেশী পাবে!

রাণী ॥ [করুণ নেত্রে] শেখর!

কবি ॥ শোন রাণী! জীবনের পুরানো পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলে নূতন পাতায় নূতন পুঁথি লেখ...শান্তি পাবে...মুক্তি পাবে...

রাণী ॥ কিন্তু এখন তা সম্পূর্ণ অসম্ভব! না শেখর, আমার এই প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করে সত্যের সম্মান রক্ষা কর—

কবি ॥ ভুলে যাও...ভুলে যাও রাণী...আমাকে ভুলে যাও...

রাণী ॥ অসম্ভব! অসম্ভব! ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন করে ভুলি! আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছ। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কত দিন ঢেকে রাখতে পারি?

কবি ॥ মনে কর আমি মৃত। আর তা-ও যদি না পারো রাণী,...ঐ হাতে একখানি অস্ত্র এনে দাও...এখনি আমি আমার মৃত্যুর প্রত্যক্ষ সত্যকে তোমার চোখের সম্মুখে ধরি...

রাণী ॥ [কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া] তুমি জান না! তুমি দেখ নি!...তা-ই।...কবি! ক্ষণেক অপেক্ষা কর...আমার কুমার হয়ত জেগে উঠে কাঁদছে...আমি তাকে নিয়ে আসি। তুমি তাকে দেখ নি, না কবি?

কবি ॥ দেখতে আর অবসর পেলুম কই রাণী?

রাণী ॥ এই সময় তার ঘুম ভেঙ্গে যায়...আমি এখানেই তাকে নিয়ে আসি। [প্রাঙ্গণে কে গান গাহিয়া যাইতেছিল...] তুমি ততক্ষণ গান শোন...

কবি ॥ ও কে গাইছে রাণী?

রাণী ॥ ও বলে "ও চৈত্র রাতের উদাসী"...দেখো এখন...এখানেই আসবে...

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান]

[কবি উঠিয়া অঙ্গনের সম্মুখে গেলেন। উদাসী গান গাহিয়া যাইতেছিল...তাহাকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। উদাসী গাহিতে গাহিতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল—গাহিতে

গাহিতেই উদাসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কবি বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিলেন]

[ধীর-পদসঞ্চারে রাণী কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া কবির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন···]

রাণী ॥ কবি !

কবি ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] রাণী !

রাণী ॥ বল দেখি এ কে ! [কুমারকে কবির সম্মুখে ধরিলেন···]

কবি ॥ তোমার কুমার···

রাণী ॥ এ তুমি। এই পরিপূর্ণ দীপালোকে এস···[এক হাত দিয়া কবিকে প্রদীপের সম্মুখে টানিয়া আনিলেন]···এই আমার সন্তান···কিন্তু এ কার মুখ ?—রাজার নয়···আমারও নয়···তোমার। এ কার চোখ ? রাজার নয়, আমার নয়···তোমার। কার মতো এর রং ?—রাজার মতো নয়, আমারো মতো নয়···ঠিক্ তোমার মতো। তোমার ঐ নাক···তোমার ঐ ভ্রূ······পরিপূর্ণভাবে এই মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। তোমার চোখের মধ্য-মণিতে একটি তিল আছে···দেখ এর চোখেও সেটি বাদ যায় নি···

কবি ॥ [দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া] রাণী ! রাণী ! এ আমি কি দেখছি ! এ আমি কি দেখলুম !

রাণী ॥ দেখলে সত্যের নগ্ন-মূর্তি। রাজার সন্তান আমার গর্ভে ছিল···তুমি আমার মনের সকল চিন্তা জুড়ে ছিলে···সে তোমার রূপ ধরে আমার কাছে মূর্তিমান হয়ে এল ! নাম রেখেছি কি জানো ?

কবি ॥ [স্বপ্নাবিষ্ট ভাবে] কি ?

রাণী ॥ "শেখর" ! "রাজশেখর" ! তুমি কবিশেখর···এ আমার রাজশেখর।

কবি ॥ নরক ! নরক ! আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে ! আমার চোখ জ্বলে গেল !

রাণী ॥ আমারো নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে !—আমার হাত ধরো···চল বাইরে চল···

কবি ॥ না রাণী···এ চোখে আর তোমার দিকে চাইবো না···ঐ শিশুর পানে চেয়ে আমার চোখ জ্বলে যাচ্ছে···আমি চললুম···কারো সাধ্যি নেই আমাকে ধরে রাখে !··

[অঙ্গনের পথে দ্রুত প্রস্থান। রাণী আরক্ত চোখে সেই দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে করিতে পাদচারণা করিতে লাগিলেন···অস্ফুট ধ্বনিতে কি সঙ্কল্প আঁটিয়া লইলেন]

রাণী॥ মল্লিকা! [দক্ষিণের দ্বারপথে মল্লিকার প্রবেশ]···কুমার। [মল্লিকার ক্রোড়ে কুমারকে দিলেন ও তাহাকে চলিয়া যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। মল্লিকা চলিয়া গেল] দাসী!—[বামপার্শ্বের দরজা পথে দাসীর প্রবেশ]··· আমার সেই মূক ক্রীতদাস—[দাসী চলিয়া গেল] [পাদচারণা করিতে করিতে] হাঁ, শুধু তার ঐ চোখ দুটি যদি না থাকতো! কি সুন্দর ঐ চোখ দুটি! ঐ পদ্ম-আঁখির মণি-তারা আমার সমস্ত জীবনটাকেই মিথ্যা করে দিয়েছে!···ঐ চোখ দুটি···ঐ চোখ দুটি [ভেরীবাদ্য]···ঐ যুদ্ধ-বাদ্য। প্রতিহিংসার ঐ রুদ্র-আহ্বান।—ক্রীতদাস! ক্রীতদাস! [বামপার্শ্বের দরজা দিয়া বিকট দর্শন কৃষ্ণবর্ণ মূক ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া রাণীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে লুণ্ঠিত হইল। প্রচণ্ড শক্তিমান···ভীতিব্যঞ্জক, অতিকায় তাহার শরীর। এক হস্তে সুদীর্ঘ শাণিত ছুরিকা। রাণী তাহাকে দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ সরিয়া গেলেন···ও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন]···না না, প্রয়োজন নেই···আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে যাও···[ক্রীতদাস উঠিয়া কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল]—যা—ও···[ক্রীতদাস তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া] না, যাক্। বিশ্বের সে এক অপরূপ সৌন্দর্য! অক্ষয় হোক···অমর হোক···[ধীরে ধীরে, আবেগে,] ঐ চোখদুটির পানে কতদিন অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকেছি···তবুও তৃপ্তি পাই নি! [ভেরীবাদ্য—, ভেরীবাদ্য শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন]—ঐ আবার! [বিষম উত্তেজনায় যেন নাচিয়া উঠিলেন] আবার আবার সেই আহ্বান··· [সপদদাপে]—ক্রীতদাস—[পূর্ববৎ ক্রীতদাস ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িল] ওঠো···[ক্রীতদাস উঠিয়া দাঁড়াইল] এসো—[তাহাকে লইয়া প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হইলেন] কিন্তু আবার পা টলে কেন? বুক কাঁপে কেন!—দাসী! [দাসীর প্রবেশ] জলতরঙ্গ বাজাও দেখি দাসী। আমি তার তরঙ্গের তালে তালে অগ্রসর হব··· [দাসী চলিয়া যাইয়াই জলতরঙ্গ বাজাইতে লাগিল] [সহসা ক্রীতদাসের দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া] এইবার এসো তুমি···[তাহাকে লইয়া অঙ্গনের এক কুঞ্জবীথির ধারে গেলেন—এবং নিম্নস্বরে তাহাকে কি আদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রীতদাস ইঙ্গিতে তাঁহার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিবে···আভাস দিয়া পরে তাঁহার চরণধূলি লইয়া দৃপ্তচোখে দৃশ্যের অন্তরালে চলিয়া যাইতেছিল···এমন সময় রাণী ঐ কুঞ্জবীথির পার্শ্ব হইতেই

চাপা গলায়, কিন্তু জোরে বলিয়া উঠিলেন]—চিনেছ ? [ক্রীতদাস ইঙ্গিতে বুঝাইল চিনিয়াছে] তার নাম ? [ক্রীতদাস নাম বলিতে চেষ্টা করিল …কিন্তু পারিল না]—"শেখর"…"শেখর"…যাও— [ক্রীতদাস চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেল। রাণী দৃপ্তচরণে অঙ্গন হইতে কক্ষমধ্যে উঠিয়া আসিলেন এবং ইঙ্গিতে জলতরঙ্গ বাদ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। বামপার্শ্বের দরজা হইতে কে ডাকিল 'মা']

রাণী ॥ কে ? [উত্তর আসিল "প্রতিহারী"]—ভেতরে এস। কি খবর…

প্রতিহারী ॥ মহারাজ খবর পাঠালেন, বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজসৈন্যের খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—তিনি আজ রাত্রি দুর্গে যাপন কর্বেন…

রাণী ॥ উত্তম। যাও—[প্রতিহারী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল] তবে আজ কি প্রলয়ের রাত্রি ! আজ না বসন্তোৎসব ! আজ না রংএর খেলা ! —রংএর খেলা খেলব। জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাটকা রক্তের পিচকারিতে আজকে আমার হোরী-খেলা, হাঃ হাঃ হাঃ [বিকট হাস্য… কিন্তু পরক্ষণেই অঙ্গনের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া যাহাকে দেখিলেন তাহাকে দেখিয়া] এ কি ! কে !—তুমি ! [দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন]

[কবিশেখরের প্রবেশ]

কবি ॥ হাঁ, আমি। তুমি আমার চোখ চেয়েছ রাণী ?

রাণী ॥ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াই রহিলেন]

কবি ॥ যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আমি তোমার এখান থেকে চলে গিয়েই খবর পেলুম, একদল বিদ্রোহী তোমার এই প্রাসাদ-উদ্যানের দিকে গুপ্তভাবে অগ্রসর হচ্ছে—তোমাকে সতর্ক কর্তে ছুটে এলুম…এসে দেখি, আমার পাশের ঐ কুঞ্জবীথিতে তুমি তোমার এক ক্রীতদাসকে আমার এই চোখদুটি উপড়ে নিতে আদেশ দিচ্ছ…আমি থমকে দাঁড়ালুম…সব শুনলুম… দৃষ্টিতে তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিলুম…তার পর তোমার ক্রীতদাস ছুটে চলল …আমার সম্মুখ দিয়েই সে ছুটে গেল…আমাকে দেখ্‌লে—কিন্তু আমাকে চিনতে পার্লে না।…

রাণী ॥ [ছুটিয়া আসিয়া কবির হাত দুখানি ধরিয়া] শেখর ! সে তবে তোমায় চেনে নি ?

কবি ॥ —না, সে আমাকে চিনতে পারে নি…

রাণী ॥ আমি তাকে পূজা কর্ব…আমি তাকে রাজ্য দেব…আমি তাকে—আমি তাকে— [আবেগে আর বাক্যস্ফুরণ হইল না]

কবি ॥ আমি ভাবলুম সে ভুল করেছে…তার সেই ভুল ভেঙে দিতে আমিও তার পশ্চাতে চললুম। গিয়ে কি দেখলুম জানো ?

রাণী ॥ কি শেখর !

কবি ॥ সে তোমার ঐ দক্ষিণের শয়নকক্ষের বাতায়নে উঠেছে…প্রথমে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পার্লুম না…পরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল—তার নামও তুমি শেখর রেখেছ…

রাণী ॥ [আর্তনাদ করিয়া] শেখর ! শেখর !—ঠিক্…ঠিক্…ও-হো-হো… তবে আমি কি করলুম !—এতক্ষণে বুঝি সব শেষ !

[মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন]

কবি ॥ —দাসী—দাসী—[দাসীর প্রবেশ]… রাণী মূর্ছিত…তাঁর জ্ঞানসঞ্চার কর…

[দক্ষিণের দ্বারপথ দিয়া, দ্রুত, শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান]

[দাসী জল আনিয়া চোখে জল দিল ও বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমে রাণীর মূর্ছা ভঙ্গ হইল]

রাণী ॥ না, সরে যাও…আমার কিছু হয় নি…আমি হোরী খেলছি ! জমাট রক্তের আবির দিয়ে, টাট্‌কা রক্তের পিচ্‌কারিতে, আজকে আমার বসন্তোৎসব ! উঃ পিপাসা ! বড় পিপাসা ! রক্তের জন্য আমার জিহ্বা লক্‌লক্ করছে। [দাসী জল দিল] [পানপাত্র সম্মুখে ধরিয়া] এ কি জল ! না রক্ত ? হোক্ রক্ত, আমি খাব। [জল পান করিলেন] উঃ বাঁচলুম…যাও দাসী…আমায় বিরক্ত ক'রো না…আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ! আমি নাচতে পারি…থিয়া তাথৈ…থিয়া তাথৈ…থিয়া তাথৈ…আমি হাসতে পারি…হাঃ হাঃ হাঃ [দক্ষিণের দ্বারে মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা ॥ দাসী !

দাসী ॥ কি ঠাকরুণ !

রাণী ॥ [মূর্ছাভঙ্গে উঠিয়া বসিয়াছিলেন—মল্লিকার স্বর শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একদৃষ্টে মল্লিকার পানে তাকাইয়া রহিলেন]

মল্লিকা ॥ আমি কি এখন রাণীমার সম্মুখে আসতে পারি ?

রাণী ॥ [অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া, সভয়ে] না-না-না কখ্‌খনো না—[মল্লিকার প্রতি এক হস্ত প্রসারিত করিয়া দিয়া অন্য হস্তে তাঁহার চোখমুখ আবৃত করিলেন]

মল্লিকা ॥ —কিন্তু, না এসেও যে পারি না মা…

রাণী ॥ [তদ্রূপ অবস্থাতেই]—দূর হও তুমি···

মল্লিকা ॥ আমি তাকে নিয়ে এসেছি···

রাণী ॥ [বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া বাহিরে তাকাইয়া]—দাসী! শুনে যা [দাসী নিকটে আসিল] শোন্··· [কাণে কাণে কি কহিলেন] [দাসী মল্লিকার পাশে যাইয়া দরজাপথে উঁকি দিয়া কি দেখিল···ও পরক্ষণেই রাণীর নিকট ছুটিয়া গেল···] [পরিপূর্ণ ব্যাকুলতায়] কে ? ও দাসী ?

দাসী ॥ শেখর···

রাণী ॥ [রাগিয়া উঠিয়া, সপদদাপে] কোন্ শেখর··· ?

দাসী ॥ কুমার।

রাণী ॥ তার চোখের দিকে চেয়েছিলি ?

দাসী ॥ হাঁ, সেই পদ্মচক্ষু অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে···

রাণী ॥ [ছুটিয়া মল্লিকাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে কুমারকে তুলিয়া আনিয়া তাহার চক্ষু চুম্বন-বন্যায় ভাসাইতে লাগিলেন]

মল্লিকা ॥ [রাণীর সম্মুখে আসিয়া] ওকে দাসীর কোলে দিন···দাসী ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখুক। বাইরের ঐ ভেরীবাদ্যে কুমার ভয় পাবেন···

রাণী ॥ যাও মাণিক···দাসীর কোলে ঘুমিয়ে পড় ··[দাসীর হস্তে কুমারকে দিলেন। দাসী কুমারকে লইয়া দক্ষিণের দ্বার দিয়া চলিয়া গেল]—কিন্তু মল্লিকা, একটা কথা··· ।—জিজ্ঞাসা কর্তে শিউরে উঠ্‌ছি !

মল্লিকা ॥ কি কথা বলুন মা···

রাণী ॥ [সভয়ে, অতি সন্তর্পণে] সে কোথায় ?

মল্লিকা ॥ কে ?

রাণী ॥ কবিশেখর ?

মল্লিকা ॥ তিনি দেশে চলে গেছেন···

রাণী ॥—চলে গেছে ?

মল্লিকা ॥ হাঁ, আপনাকে তাঁর জন্মের মত বিদায় জানিয়ে চলে গেছেন ··

রাণী ॥ ঘৃণায় হয়তো দেখাটি পর্যন্ত করে গেল না,—না ?

মল্লিকা ॥ ও কথা বলবেন না মা···তিনি দেবতা···আপনার পাপ হবে···

রাণী ॥ হুঁ ।—আর সেই ক্রীতদাস ?

মল্লিকা ॥ তিনি তাকে বধ করে তবেই ত কুমারকে রক্ষা করেছেন···। কুমারকে রক্ষা করে আমার হাতে সঁপে দিয়েই তিনি আপনাকে তাঁর শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করে চলে গেলেন···

রাণী ॥ অর্ঘ্য !

মল্লিকা ॥ হাঁ, অর্ঘ্য। আমি রেখে দিয়েছি।

রাণী ॥ আমি দেখব…আমি এখনি তা দেখব…

মল্লিকা ॥ —আসুন…

[মল্লিকার সঙ্গে রাণী চলিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে অঙ্গনের পথ দিয়া রাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন]

রাজা ॥ রাণী !

রাণী ॥ [চমকিয়া উঠিয়া] কি রাজা !

[অঙ্গনে জনতার বিরাট কোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল]

রাজা ॥ —রাণী ! বাইরে ঐ উন্মত্ত প্রজাসঙ্ঘ। গুপ্ত-বিদ্রোহ দমন করে এসেছি। কিন্তু ওদের দমন কর তুমি…

রাণী ॥ আমি !

রাজা ॥ হাঁ, তুমি। তাদের এক অভিযোগ আছে।

রাণী ॥ কি অভিযোগ…?

রাজা ॥ আর সে অভিযোগ তোমারি বিরুদ্ধে…

রাণী ॥ আমার বিরুদ্ধে !

রাজা ॥ হাঁ, তোমার বিরুদ্ধে।

রাণী ॥ কিন্তু অভিযোগ শোনবার এই কি সময় ?—বেশ ! তবু শুনি…দেনা পাওনা না হয় চুকিয়েই যাই…

রাজা ॥ তারা বলে এ রাজ্যে আজকে এই যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে… এ শুধু আজ রাত্রে এই প্রাসাদে ভগবানের চরণধূলির অমর্যাদা করার দরুণ…

রাণী ॥ কি অমর্যাদা হয়েছে শুনি…

রাজা ॥ তুমি ভগবানের জ্ঞাতিকন্যা হয়েও তাঁর চরণধূলি স্পর্শ করনি…। ভগদ্বংশে তোমার জন্ম…বংশ-গৌরবে তুমি মহামহিমময়ী…! সদাচারের মধ্যে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা…ধর্মক্রিয়ায় তোমার শ্রেষ্ঠ অধিকার—তুমি আমার রাজপুরীর সেই শ্রেষ্ঠ পূজারিণী হয়েও স্বধর্মে অশ্রদ্ধা দেখিয়েছ…

রাণী ॥ —তা আমাকে কি করতে হবে ?

রাজা ॥ সেই চরণধূলি তুমি এখন ঐ উন্মত্ত জনসজ্ঞের ললাটে স্পর্শ করাবে…

রাণী ॥ [ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তাহার পর] কিন্তু তার পূর্বে আমার এক অভিযোগ আছে…তার বিচার কর…

রাজা ॥ আমার আপত্তি নেই। কি তোমার অভিযোগ ?

রাণী ॥ —ব্যভিচারের অভিযোগ।

রাজা ॥ —কার বিরুদ্ধে ?

রাণী ॥ —সুবিচার পাবো ?

রাজা ॥ —কবে না পেয়েছ ?

রাণী ॥ —কিন্তু আজ যার নামে অভিযোগ কর্ছি...সে তোমার এক প্রেয়সী ...তাইতেই আশঙ্কা হয়...

রাজা ॥ আমার বিচারকে পক্ষপাত দোষে কলঙ্কিত করেছি...শত্রুতেও তো এ কথা বলে না...

রাণী ॥ তবে শোন রাজা...এই রাজপুরীতে তোমার এক প্রেয়সী রক্ষিতা অতি গুপ্তভাবে আমাদের এই সুখের সংসারকে তার বিরাট ব্যভিচারে কলঙ্কিত করেছে...সে এক দাসীকন্যা কিন্তু সে কথা গোপন রেখে উচ্চকুলজাত বলে তার পরিচয় দিয়ে তোমার অন্তঃপুরে এসেছিল...পরে সে তোমার প্রীতির জন্য, আমাকে দিয়ে ধর্মানুষ্ঠান যা কিছু করিয়েছ...সে সবই করেছে। ধর্মের, আচারের এত বড় অনিয়ম আমি কিছুতেই সহ্য কর্তে পাচ্ছিনে ...আর সেই জন্যেই আজকে ঐ চরণধূলি বিতরণ করবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আমার হাত ওঠে নি...! রাজা, আমার বিচার কর্তে ছুটে এসেছ...কিন্তু, কর দেখি এইবার তোমার সেই রক্ষিতার বিচার...

রাজা ॥ —কে সে ?

রাণী ॥ —নাম আগে বলব না...আগে দণ্ড উচ্চারণ কর—

রাজা ॥ আমি তার নির্বাসন দণ্ড বিধান করলুম—আজ রাত্রিতেই সে এ নির্বাসন গ্রহণ করুক...

রাণী ॥ রাজবিধান জয়যুক্ত হোক্। আমি এখনি গিয়ে তাকে তার এই দণ্ড জ্ঞাপন করে আসি—[প্রস্থানোদ্যত...]

রাজা ॥ কিন্তু প্রজাসঙ্ঘ ভগবানের চরণধূলির জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে...

রাণী ॥ আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্...শুদ্ধ হোক্...সত্য হোক...তার পর—

[দক্ষিণের দ্বার দিয়া প্রস্থান]

[বাহিরে প্রজাসঙ্ঘ "ভগবানের চরণ-ধূলি", "ভগবানের চরণ-ধূলি" বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল]

রাজা ॥ [একটি আলো লইয়া বাতায়ন পার্শ্বে যাইয়া আলোটি নিজের সম্মুখে ধরিয়া]—প্রজাগণ !

প্রজাসঙ্ঘ ॥ "রাজা" "রাজা" "চুপ্‌ চুপ্‌"—"সকলে চুপ কর" "শোন" ইত্যাদি।

রাজা ॥ প্রসাদের জন্য আর একটু অপেক্ষা কর।

প্রজাসঙ্ঘ ॥ কেন ?

রাজা ॥ আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্‌··

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে]—পবিত্র হোক্‌···

রাজা ॥ শুদ্ধ হোক্‌···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে]—শুদ্ধ হোক্‌···

রাজা ॥ সত্য হোক্‌···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ [সমস্বরে]—সত্য হোক্‌।

রাজা ॥ তোমরা রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে অপেক্ষা কর···আমি রাণীকে নিয়ে যাচ্ছি। ···বুদ্ধের জয় হোক্‌···ধর্মের জয় হোক্‌···সংঘের জয় হোক্‌···

প্রজাসঙ্ঘ ॥ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে দৃশ্যের অন্তরালে প্রস্থান। দুর্গে পুনরায় তিনবার ভেরীবাদ্য]

রাজা ॥ ঐ সেই সঙ্কেত···যুবরাজ পুর-প্রবেশ করেছে। দাসী! [দাসীর প্রবেশ] রাণী এলে তাঁকে বলো আমি এখনি ফিরে আসছি···

[বাম দরজা দিয়া প্রস্থান]

দাসী ॥ কুমার জেগে উঠে দুধের জন্য কাঁদছেন···রাণীমা আসেন না কেন!—ঐ যে—

[দক্ষিণের দ্বারপথে রাণীর প্রবেশ। একমনে অতি সন্তর্পণে তাঁহার হস্তস্থিত স্বর্ণ-পেটিকায় কি দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন। পার্শ্বে মল্লিকা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া আসিতেছিল]

রাণী ॥ [পেটিকা হইতে দৃষ্টি অপসারিত না করিয়াই] এই তার অর্ঘ্য ?

মল্লিকা ॥ হাঁ, ঐ তাঁর অর্ঘ্য।

রাণী ॥ [মল্লিকার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া] পদ্মফুল, না ?

মল্লিকা ॥ [নীরব রহিল]

রাণী ॥ এই পদ্ম দুটি আমি উপ্‌ড়ে নিতে চেয়েছিলুম···পারি নি।—আজ সে তা আমাকে স্বেচ্ছায় দিয়ে গেছে···কেন, কেন মল্লিকা ?

মল্লিকা ॥ জানি না মা···

রাণী ॥ ভালো।—না জানা ভালো। জীবনের এই প্রহেলিকা চিরন্তন হয়ে থাক্। চলে আয়···তুই আমার সঙ্গে চলে আয়···এ চোখের দিকে চাইব পরে···,—আগে পবিত্র করি···শুদ্ধ করি···সত্য করি···[মল্লিকার দেহে ভর দিয়া ধীরে ধীরে বাম দরজা দিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন—এমন সময় দাসী তাঁহাকে ডাক দিল···]

দাসী ॥ মা!

রাণী ॥ [তাহার দিকে না তাকাইয়া] কে মল্লিকা?

মল্লিকা ॥ দাসী···।

রাণী ॥ কি চায়?

মল্লিকা ॥ কি চাস দাসী?

দাসী ॥ কুমার জেগে উঠেছেন, কাঁদছেন—দুধ চান···

রাণী ॥ [হঠাৎ বিকট হাস্য] হাঃ হাঃ হাঃ দুধ—আগে রাজপুরী পবিত্র হোক্—শুদ্ধ হোক্···সত্য হোক্···[বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টবৎ সচকিত হইয়া হঠাৎ মল্লিকার হাত ধরিয়া এক টান দিয়া চকিতে বাম দরজা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

দাসী ॥ [বিস্ময়ান্তে]—এ কি! রাণীমার আজ হয়েছে কি! [বাম দরজা-পথে তাকাইয়া রহিল]

[যুবরাজ বিরূধক সহ প্রাঙ্গণের পথে রাজার প্রবেশ]

রাজা ॥ বিরূধক—তুমি কি অপ্রকৃতিস্থ হয়েছ?

বিরূধক ॥ না পিতা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। মাতামহ আমাকে খুবই সমাদর করে কপিলাবস্তুতে অভ্যর্থনা করে নিলেন। কিন্তু, আমার মাতামহীকে দেখতে পেলুম না—শুনলুম তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন—

রাজা ॥ কই, আমরা তো সে খবর পাই নি—

বিরূধক ॥ আমিও তাঁদের সেই কথাই বললুম···উত্তর পেলুম, মা সে খবর পেলে শোকাতুরা হবেন বলে কোশলে তা গোপন রাখা হয়েছে—

রাজা ॥ তার পর?

বিরূধক ॥ তার পর দেখলুম, রাজপুরীতে আমাকে প্রণাম করবার জন্য আমার বয়ঃকনিষ্ঠেরা কেউ নেই—শুনলুম তারা সপ্তাহকাল পূর্বে মৃগয়ায় গেছে। তখনো আমার মনে কোন সন্দেহ হয় নি—

রাজা ॥ তার পর—

বিরূধক ॥ তার পর কোশলে ফিরে আসবার দিন আমরা হাতীতে উঠেছি—এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আমার শয়নকক্ষে আমার মাতৃ-দত্ত

অঙ্গুরীয় ফেলে এসেছি…কক্ষে ফিরে গিয়ে দেখি…এক বৃদ্ধা দাসী দুধ-জল দিয়ে আমার সেই কক্ষের যাবতীয় আসবাব ধুয়ে ফেলছে…আমি তাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলুম…সে আমাকে চিনতে না পেরে বললো, এক দাসীপুত্র,—আমাদের রাজার নাচওয়ালীর নাতি—এই ঘরে বাস করে গেছে…তাই দুধ-জলে এই ঘর ধুয়ে ঘর শুদ্ধ করছি !

রাজা ॥ বিরূধক ! বিরূধক !—সে যে মিথ্যা বলে নি…বা পরিহাস করে নি… তার প্রমাণ ?

বিরূধক ॥ তখনি আমি ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে রাজপুরীর বাইরে এসে গ্রামে গ্রামে সন্ধান নিলুম। দেখলুম সব শাক্যই এ খবর জানে। তারা বললো "কোশলরাজ তরোয়ালের জোরে শাক্যবংশের মেয়ে বিয়ে করে কুলীন হবার ফন্দী এঁটেছিলেন…একটা নাচওয়ালীর মেয়ে দিয়ে তাকে খুব ঠকানো গেছে…"

রাজা ॥ এতদূর ! এতদূর !

বিরূধক ॥ —আমিও তখনি তরবারি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলুম, "ঐ দুধ-জল আমি শাক্যদের রক্ত দিয়ে ধুয়ে ফেলব। মিথ্যাবাদী শঠদের রক্ত দিয়ে ঐ মিথ্যা পুরীকে সত্য আর শুদ্ধ কর্ব।"

রাজা ॥ —কিন্তু, আমি ভাবছি রাণীর কথা। মিথ্যা মূর্তিমতী হয়ে একদিন নয়, দুদিন নয়, এই ষোলটি বছর আমার চোখে ধূলি দিয়ে আছে ! অথচ আজ—এখনি একটি পুরনারীর বিরুদ্ধে সে ঠিক এমনি এক অভিযোগ এনে নিজে তাকে নির্বাসন দণ্ড দিতে গেছে—স্পর্ধা তার !—দাসী, কোথায় সে …ডাকো তাকে…

[বাম দরজা দিয়া দাসীর প্রস্থান]

বিরূধক ॥ —ঐ নির্বাসন দণ্ড তাকে দিন…আজই…এই মুহূর্তে—

রাজা ॥ —অবশ্য দেব, অবশ্য দেব—

বিরূধক ॥ অন্য শাক্যদের ভার নিলুম আমি। জানেন পিতা, পুর-প্রবেশ করেই আমি সেই শঠকুলচূড়ামণি শাক্যমুনি বুদ্ধের আশ্রম শাক্যের রক্তে ভাসিয়ে দিতে আদেশ দিয়ে এসেছি…হত্যাকাণ্ড হয়তো এতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে…

রাজা ॥ …না না…সে কি করেছ !—ভগবান যে স্বয়ং শাক্য—

বিরূধক ॥ তাঁর ছিন্ন মস্তক আমি আজ রাত্রেই স্বর্ণ-পাত্রে নিয়ে আসতে আদেশ দিয়েছি…

রাজা ॥ না···না···সে হয় না, সে হবে না···

বিরূধক ॥ —অবশ্য হবে।—সেই হবে আমার প্রথম ও প্রধান গৌরব···

রাজা ॥ আগে রাণীর নির্বাসন-দণ্ড ব্যবস্থা কর রাজপুত্র···তার পর—

[বাম দরজা-পথে মল্লিকার প্রবেশ]

এই যে মল্লিকা !—রাণী কোথায় শীঘ্র বল···

মল্লিকা ॥ তিনি রাজপুরী থেকে নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করে শ্রীবুদ্ধের আশ্রমে চিরপ্রস্থান করেছেন—

রাজা ॥ —আমি তো এখনো তার ওপর সে দণ্ড বিধান করি নি···

মল্লিকা ॥ আপনি বহু পূর্বেই, স্বয়ং তাঁকে সে দণ্ড দান করেছেন—

রাজা ॥ কি রকম !

মল্লিকা ॥ তিনি আপনার নিকট এক পুরনারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনয়ন করেছিলেন···

জা ॥ —তবে সে পুরনারী রাণী স্বয়ং !

[মল্লিকা নীরব রহিল]

এখন বুঝেছি কি নিদারুণ ঝড় এই ষোলটি বছর তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে —বিরূধক ! বিরূধক ! সে শেষে রাত্রে ঘুমাতেও পার্তো না···আমি আজ বুঝতে পাছি তার সেই অন্তর্যুদ্ধের তীব্রতা।—কিন্তু সে তবে সেই যুদ্ধে শেষকালে জয়লাভ করেছিল।—বিরূধক ! আর আমার ক্ষোভ নেই —আমি তাকে ক্ষমা কর্তে পার্ব !

বিরূধক ॥ —নিজের বিরুদ্ধে নিজে অভিযোগ এনে স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করেছেন !···পিতা, আমি আশ্রমে চললুম···আমার সেই সত্য-কুলজাতা···সেই সত্যাশ্রয়ী মাকে ফিরিয়ে এনে তাঁকে তাঁর সেই রাজলক্ষীর আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কর্ব···

[অঙ্গনের দ্বারপথে প্রতিহারীর প্রবেশ]

কি সংবাদ ?

প্রতিহারী ॥ [অভিবানযান্তে] যুবরাজের এক দেহরক্ষী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মস্তক নিয়ে যুবরাজের দর্শন-প্রার্থী—

বিরূধক ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সেই শাক্য-মুনির ছিন্ন মস্তক !—যাও, অবিলম্বে তাকে এখানে উপস্থিত কর—

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান]

* * *

[সহসা ঝড় উঠিল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল]

রাজা ॥ বিরূধক ! বিরূধক !—ঝড় উঠেছে…এ তো প্রলয়ের কালবৈশাখী নয় ? ঐ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে…ঐ—ঐ—

[প্রাঙ্গণে বজ্রপাত হইল]

উঃ উঃ [চোখ বুজিয়া কানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন]

[দেহরক্ষীর প্রবেশ—হাতে তাহার এক স্বর্ণথালা…তাহার উপর এক ছিন্ন মস্তক। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল—* * *]

বিরূধক ॥ [বিদ্যুতালোকের সুতীব্র দীপ্তিতে সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—]

এ কি ! মা !…আমার মা !

[দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া পিছাইয়া আসিলেন]

দেহরক্ষী ॥ আশ্রমের প্রথম হত্যা…

বিরূধক ॥ —আশ্রমের শেষ হত্যা…

মা ! মা ! [সেই ছিন্ন মস্তকের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। সম্মুখে পুনরায় বজ্রপাত হইল]

অসাধারণ

মন্মথ রায়

[দক্ষিণ কলিকাতায় বড়রাস্তার ধারে একতলা একটি বাড়ি। গৃহস্বামী শ্রীপবিত্র বসু এম-এ, পি-আর-এস, কোনও কলেজে বাঙলা ভাষার অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার পরীক্ষক। স্ত্রী অমলা, পুত্র অমিয় ও কন্যা কৃষ্ণাকে লইয়া অধ্যাপক বসুর ক্ষুদ্র সংসার। সন্ধ্যা। অধ্যাপক বসু লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া ফোনে কাহার সহিত আলাপ করিতেছেন]

পবিত্র॥ হ্যাঁ, আমি পবিত্র বোসই কথা বলছি।...হ্যাঁ, এইমাত্র বাড়ী ফিরছি। হ্যাঁ, বি-এর রেজাল্ট আজ বেরিয়েছে।...তা ঠিক্, এবার পাশের পার্সেণ্টেজ খুব কম।...হ্যাঁ, অমিয়, আমার ছেলে—পাশ করতে পারে নি। কম্পালসরি বাঙলার পরীক্ষক আমিই ছিলাম বটে,...না, আমি কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলাম আমার ছেলের কাগজ যেন অন্য পরীক্ষককে দেওয়া হয়।...না...এ আর আশ্চর্য কি—এইটেই আমার কর্তব্য ছিল।...আপনার ছেলেও পাশ করতে পারে নি! শুনে দুঃখিত হলাম। আমার কাছেই কাগজ পড়েছিল? ...তা হবে...কিন্তু তাতো আমার জানবার কথা নয়।...না মশাই না। নমস্কার।

[টেলিফোনে এই কথোপকথনের মধ্যে কৃষ্ণা এক গ্লাস ওভালটিন লইয়া আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে]

পবিত্র॥ এ কি মা। চা কই?

কৃষ্ণা॥ চা আর তুমি পাবে না বাবা। এখন থেকে তোমাকে দুবেলা ওভালটিনই খেতে হবে—ডাক্তারের হুকুম।

পবিত্র॥ ওটা তবে ওভালটিন?

কৃষ্ণা॥ হ্যাঁ বাবা।

পবিত্র॥ অত দাম—জুটলো কোত্থেকে?

কৃষ্ণা॥ সে আমি জানি না বাবা। মা আনিয়েছেন।

পবিত্র॥ বেশ-বেশ। চা-টা এমন নেশা—কিন্তু ধাতে আর সইচে না।

ছাড়া উচিত—বুঝি, কিন্তু, ছাড়তে পারছি কই, ওভালটিনের পয়সা কোথায় ?···একদিন দুদিন চলে, কিন্তু রোজ তো আর চলবে না।

কৃষ্ণা ॥ খাবেতো এক গ্লাস ওভালটিন ; তার জন্য এত ভাবছ কেন বলতো। তুমি খেয়ে ফেলো—

[পবিত্র ওভালটিন খাইতে লাগিলেন]

পবিত্র ॥ তা খেতে বেশ। [হাসিয়া] এক টিন ওভালটিন কিনে তোমাদের দুধের বরাদ্দটা বোধ হয় উঠিয়ে দিলেন তোমার মা।

[বাহির হইতে পুত্র অমিয়ের প্রবেশ—গায়ে সদ্য কেনা দামী বুশ কোট—ট্রাউজার। হাতে রঙীন সিনেমা-পত্রিকা]

পবিত্র ॥ ব্যাপার কি অমিয় ? এত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নতুন পোশাক গায়ে তুলেছ যে !

অমিয় ॥ কিনলাম বাবা। অনেক দিনের সাধ পুরল।

পবিত্র ॥ কিন্তু দাম পড়ল কত ?

অমিয় ॥ সবশুদ্ধ উনষাট টাকা পনেরো আনা।

পবিত্র ॥ পেলে কোত্থেকে ?

অমিয় ॥ কেন ! মা দিয়েছেন।

পবিত্র ॥ কিন্তু, তিনি পেলেন কোথায় ?

অমিয় ॥ তুমি দিয়েছ।

পবিত্র ॥ আমি দিয়েছি ! কোথায় পাব ?

অমিয় ॥ সে আমার জানবার কথা নয় বাবা।

পবিত্র ॥ হ্যাঁ, আমারি জানবার কথা। তিনশো টাকা যার বেতন, তার ছেলের গায়ে উঠবে ষাট টাকার পোশাক ! তোমার মা কোথায় কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণা ॥ রান্নাঘরে বাবা।

পবিত্র ॥ যাকে হাত পুড়িয়ে দুবেলা রাঁধতে হয়, তার ছেলের গায়ে—তাও এমন দিনে—? [অমিয়ের প্রতি] তোমার বি-এ ফেল করবার লজ্জাটা ঢাকবার জন্যই বুঝি তোমার ঐ সজ্জা অমিয় ?

অমিয় ॥ বাপ হয়ে নিজে আমার বাঙলার কাগজ না দেখে, অন্যের হাতে ফেল করিয়ে দিয়েছ তুমি—সেটা যখন সইতে পেরেছি, তোমার ও আঘাতও আমার সইবে বাবা।

পবিত্র ॥ সেটা ছিল আমার কর্তব্য। কর্তব্য পালন করেছি বলে যদি তুমি দুঃখিত হও, তাতে আমি দুঃখিত নই।

অমিয় ॥ বেশ তো ফেল করেছি বলেও আমার কোন দুঃখ নেই। তুমিই তো বল—Failures are but the pillars of success!

[অমিয় বীরদর্পে অন্দরে চলিয়া গেল]

পবিত্র ॥ ছিঃ ছিঃ ছিঃ…এসব কী হচ্ছে! কী হচ্ছে এসব! তোমার মায়ের প্রশ্রয়ে—আর তিনি এত টাকা পেলেনই বা কী করে! এই, মাসের শেষে?…তুই বলতে পারিস মা?

কৃষ্ণা ॥ তা তো জানি না বাবা। মা আজ আমাকেও একটা খুব ভালো শাড়ি কিনে দিয়েছেন।

পবিত্র ॥ তোর ভালো শাড়ি ছিল না আমি জানি,—দেখেছি। আসচে মাসে মাইনে পেলে কিনে দেব বলেছিলাম। তিনি কিনে দিয়েছেন ভালই করেছেন। কিন্তু এসব টাকা পাচ্ছেন কোত্থেকে—আমি সেইটেই বুঝে উঠতে পারছি না মা।

কৃষ্ণা ॥ আমিও না।

পবিত্র ॥ অবিশ্যি তোমার মা মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে দেন—রীতিমতো চমকে দেন আমাকে। হিসেব করে চলেন বলেই পারেন, আর কতকটা পারেন নিজেকে বঞ্চিত করে—পান আর জরদা খাওয়াটা ছিল অত কালের নেশা--টানাটানি দেখে দিলেন সেটা ছেড়ে। একটা ভালো শাড়ি, একটা নতুন গয়না, মাঝে মাঝে সিনেমায় নিয়ে যাওয়া, এসব কিছুই আমি পারিনি—মুখ ফুটে বলেন না অবিশ্যি কিছু—কিন্তু… আমিই বা কি করব! সম্বল তো মাস গেলে তিনশোটি টাকা।

কৃষ্ণা ॥ তাই বা কি কম! চলে যাচ্ছে তো।

পবিত্র ॥ চলে যাচ্ছে মানে একটা লড়াই চলছে—কোনও মতে বেঁচে থাকবার একটা লড়াই। একদিন নয়—দুদিন নয়, রোজ। পারতাম না, ভেঙে পড়তাম, মা, শুধু তোরা মুখ বুজে সব সয়ে যাচ্ছিস বলেই ভেঙে পড়িনি। শাড়িটা তোর পছন্দ হয়েছে তো মা? কই? কোথায়? আন দেখি—প'রে আয়—

কৃষ্ণা ॥ না বাবা। অত দামী শাড়ি—ও আমায় মানাবে না বাবা!

পবিত্র ॥ সে কি? কত দাম?

কৃষ্ণা ॥ ঐ যে নতুন উঠেছে—ফিল্ম স্টার শাড়ি—দামী সিল্ক! দাম খুব কম করেও ষাট টাকা। আমি তো ফিল্ম স্টার নই বাবা। কলেজে যাবার জন্য দরকার ছিল আমার খান দুই আটপৌরে শাড়ি—তা হলো না।

পবিত্র ॥ না—না, আমার উঠতে হ'ল। কী হচ্ছে এ সব? এ সব কী হচ্ছে!

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অন্দর হইতে অমলা দেবীর প্রবেশ]

অমলা ॥ কী আবার হচ্ছে! দপ করে জলে উঠলে যে!

পবিত্র ॥ এই সব খরচপত্র—অযথা অন্যায় এসব খরচপত্র—কী করে হয়—যেখানে তুমি রয়েছ! আর এসব টাকা এলই বা কোত্থেকে?

অমলা ॥ হিসাব তো তুমি কোন দিনই চাওনি—আজ চাইছ যে!

পবিত্র ॥ আমি বুঝছি না—বুঝতে পারছি না—এত সব টাকা এল কোত্থেকে? কোত্থেকে এল?

অমলা ॥ যেখান থেকে আসার—সেখান থেকেই এসেছে—আমার বাপের বাড়ী থেকে আসেনি।

কৃষ্ণা ॥ আমি খাবার যোগাড় করব মা?

অমলা ॥ রান্না এখনো শেষ হয় নি। পোলাওটা বোধহয় এতক্ষণ হয়ে গেছে। গিয়ে দেখ।

[কৃষ্ণা চলিয়া গেল]

পবিত্র ॥ পোলাও!

অমলা ॥ হ্যাঁ পোলাও। নরেশদা একদিন খেতে চেয়েছিলেন। আজ খেতে বলেছি। কোনদিনই একটু ভালো কিছু খাওয়াতে পারি নি তাঁকে। আজ তাই একটু আয়োজন করেছি। তুমি সেই কোন ভোজে কাটলেট খেয়ে এসে বলেছিলে একটাই দিল, দিলে আর একটা খেতে—সেই কাটলেটও করেছি আজ—আশ মিটিয়ে খেতে হবে তোমাকে। না—না গুরুপাক হবে না, দেখো তুমি। চারটি ভাত, মুরগির একটু ঝোল আর সেই সঙ্গে খান কতক কাটলেট্ করেছি...কাটলেট্—এতে তোমার কোন অসুখ হবে না দেখো!

পবিত্র ॥ কী ক'রে তুমি এসব—এত সব...পারো, তাই আমি ভাবি। আজ তবে তোমায় বলি, শোনো। সেদিনকার সেই ভোজে কবরেজি কাটলেট খেয়ে—সে যেন মুখে লেগে রইল। ভাবলাম তোমাদেরও খাওয়াতে হবে। গেলাম সেদিন কলেজ ষ্ট্রীটের সেই বড় রেস্তোঁরাতে—চারটি কাটলেট্ চাইলাম—প্যাকেটে পুরে দিল—দাম শুনে চক্ষু কপালে উঠল—ছ'টাকা। বললাম তবে যে শুনেছি একটাকা ক'রে। লোকটা বললে পথে ঘাটে তাই বিক্রি হয় বটে। দুটো টাকা কম পড়ল—ফেরত দিলাম—তা বলে কিনা—মিছি মিছি ভাজালেন...এ সব দোকানে আসেন কেন?

অমলা ॥ অসভ্য। ইতর। কেন তুমি কিনতে গিয়েছিলে! এই তো আমি করে দিচ্ছি আজ। এককুড়ি কাট্‌লেটে আমার দশ টাকা খরচ পড়েছে মাত্র—

পবিত্র ॥ দশ টাকা! এল কোত্থেকে?…না-না অমলা—এতসব খরচ—মাসের শেষ—আমি ভেবে পাচ্ছি না—না না এসব বাড়াবাড়ি—এ সব আমাদের মতো ছা-পোষা গেরস্ত ঘরে চলে না—চলা উচিত নয়—

অমলা ॥ কী দোষ করেছি আমরা অন্তত একটি দিনও একটি বারও একটু ভালো খাবার—একটু ভালো পরবার সখ মেটাতে পারব না আমরা!

পবিত্র ॥ ক্ষমতায় যদি কুলোয় কেন পারবে না অমলা?

অমলা ॥ কেন কুলোবে না! কেন কুলোয় না। বিদ্যাবুদ্ধি কি তোমার কারো চেয়ে কম? এম. এ. পি-আর-এস এই যে এতবড় একটা ল্যাজ ঝুলিয়ে বেড়াও—তবে বল এর কোন দাম নেই! আর যদি দাম না-ই থাকে তবে কেন এই মিথ্যা ভড়ং। কেন তবে এই শিক্ষিত সভ্য সমাজে বাস করার এই প্রাণান্তকর মোহ? যে সমাজে প্রতিটি মুহূর্তে চল্‌ছে বাঁচবার জন্য এই নিদারুণ লড়াই। যে লড়াইয়ে হারিয়ে ফেলেছি আমরা জীবনের সকল আনন্দ ও উৎসব। উত্তর দাও আমাকে—প্রফেসার বোস—উত্তর দাও—

পবিত্র ॥ 'Plain living and high thinking'—এই হলো গিয়ে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ। ৩০০৲ টাকা আমি বেতন পাই—এজন্য এই বেতন যথেষ্ট—অমলাদেবী।

অমলা ॥ তবে বলো, তুমি এ যুগের লোক—প্রফেসর বোস! এ যুগের আদর্শ। Plain living and high thinking—একথা বল্‌লে তোমাদের পণ্ডিত নেহেরুও তোমাকে 'Zero' mark দেবেন। এ যুগের আদর্শ high living and high thinking. Standard of living বাড়াবার জন্যই আজ সকল দেশ, সকল জাতির প্রয়াস। তাই এত Five year plan, Ten year plan, Twenty year plan. থাক তর্ক করতে চাই না আমি তোমার সঙ্গে। বাথরুমে তোমার গরমজল দেওয়া হয়েছে। স্নান করবে এসো। আজ সব একসঙ্গেই খাবো।

পবিত্র ॥ ছেলে ফেল করলে সেজন্য উৎসব হয় এটাও বুঝি এ যুগের সভ্যতা?

অমলা ॥ পাশ ফেলের কোন দাম নেই এযুগে। এ যুগের সভ্যতা হলো,

যেন তেন প্রকারেন টাকা রোজগার এবং সেই টাকায় জীবনকে ষোল আনা উপভোগ করা।

পবিত্র ॥ অমলাদেবী! এ তুমি কি বলছো?

অমলা ॥ বড় দুঃখেই একথা বলছি প্রফেসার বোস। হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, এযুগে সাধুতার কোন দাম নেই। বিদ্যার কোন মান নেই। এটা কাঞ্চন কৌলিন্যের যুগ। চোখের উপর দেখেছি, সৎ, সাধু, সুবিদ্বান অধ্যাপক সপরিবারে শুকিয়ে মরছে। সমাজে তার নাই কোন প্রভাব, নাই কোন প্রতিপত্তি। চোর জোচ্চোর টাকার জোরে নাম কিনছে। খেতাব পাচ্ছে। সমাজে হয় তারই অভিনন্দন, তারই অভ্যর্থনা। সমাজ আমাদের যা শেখাচ্ছে তাই আমরা শিখছি—প্রফেসার বোস। এ তোমার পুঁথিপড়া জ্ঞান নয়, এ আমাদের হাড়ে হাড়ে শেখা অভিজ্ঞতা। এতটুকু মিথ্যা বলিনি প্রফেসার বোস। ওঠো, চলো।

পবিত্র ॥ তুমি যাও। স্নান আজ আমি করবো না। খাবার দেওয়া হলে আমায় ডেকো।

অমলা ॥ আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি জানি আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখার জন্য তোমার চেষ্টার অন্ত নাই। বিদ্যে, বুদ্ধিও তোমার কিছু কম নয়। সংসারের জ্ঞান ভাণ্ডার তোমার থিসিসে, তোমার রিসার্চে সমৃদ্ধতর হয়েছে। কিন্তু তোমার সমৃদ্ধি বেড়েছে কতটুকু? শরীর ভেঙে পড়েছে। টাকার অভাবে হয়নি তোমার উপযুক্ত চিকিৎসা, উপযুক্ত পথ্য। দুবেলা চায়ের বদলে একটু ওভালটিন, তাই আমি তোমায় দিতে পারিনি এতদিন। কিন্তু আর না—আর এসব সইবো না। আমি যাচ্ছি, তুমি এসো।

[অমলার প্রস্থান]

[ফোন বাজিতে লাগিল। পবিত্র বোস ফোনটি তুলিয়া ধরিলেন].

পবিত্র ॥ হ্যালো···কে? অনিল রায়? কাকে চান? অমিয়? হ্যাঁ বাড়ী আছে। ধরুন, আমি খবর দিচ্ছি—বেশ তো বলুন, কি বলতে হবে। ওঃ আপনারা তার জন্য বসে আছেন। কোথায়? ফারপোতে? এক্ষুনি তাকে যেতে বলছেন? বলবো। নমস্কার।

[ফোন রাখিয়া দিলেন। বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া অমিয়ের প্রবেশ]

পবিত্র ॥ অনিল রায় কে? তোমাকে ফোনে এক্ষুনি ডাকছিলেন।

অমিয় ॥ কেন? অনিল রায়কে তুমি চিনলে না বাবা? ব্যারিষ্টার মহিম

রায়ের ছেলে। বি. এ. পাশ করলো এবার। কি করে যে পাশ করলো তাই ভাবি। সে আজ ফারপোতে আমাদের পার্টি দিচ্ছে। সেই পার্টিতেই আমি যাচ্ছি।

পবিত্র ॥ দাঁড়াও। মহিম রায়ের ছেলে অনিল রায়? হ্যাঁ ওর পেপার ছিল আমার কাছেই। রোল থারটি ফাইভ?

অমিয় ॥ হ্যাঁ বাবা, রোল থারটি ফাইভ। বাংলার 'ব' জানে না। ইংরেজী ছাড়া যে কথা বলে না, সে তোমার কাছে পাশ হলো?

পবিত্র ॥ সাট্ আপ। সে আমার কাছে পাশ করে নি। সে যে কে তাও আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু জানতে আমি বাধ্য হয়েছি। প্রকাণ্ড বড়লোক এরা। আমাকে ঘুস দিয়ে পাশ করিয়ে নিতে চেয়েছিল ওরা অনিলকে। কিন্তু আমি—সে পাশ করেছে?

অমিয় ॥ শুধু পাশ করেনি। তার পাশের ভোজ খেতে আমি যাচ্ছি ফারপোতে।

[অমলা দেবীর প্রবেশ]

অমলা ॥ আমার ইচ্ছা ছিল না, এ ভোজে তুমি যাও। ইচ্ছা ছিল আজ আমরা সব একসঙ্গে খাবো।

অমিয় ॥ সে তো আমরা রোজই খাই মা। আজকের এ নেমন্তন্নটা এড়ানো গেল না। যাই আমার দেরী হয়ে গেছে।

[প্রস্থান]

অমলা ॥ এসো! খাবে এস।

পবিত্র ॥ খাওয়া চুলোয় যাক্। তুমি বসো অমলা। তোমার মনে আছে হয়ত, তোমাকে আমি বলেছিলাম, তোমার নরেশদা মহিম রায়ের ছেলে অনিল রায়কে পাশ করিয়ে দেবার জন্য আমাকে ধরেছিলো। তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুস দিতে চেয়েছিল। আমি নরেশকে হাঁকিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সে যেন এ বাড়ীতে আর কখনও না আসে। সেদিন তুমি আমাকে সমর্থনই করেছিলে।

অমলা ॥ হ্যাঁ করেছিলাম।

পবিত্র ॥ সব খাতার নম্বরগুলো আমি যোগ দিয়ে তোমাকে দিয়েছিলাম চেক্ করতে। সেই সময় তুমিও দেখেছিলে—রোল থার্টি ফাইভ মানে ঐ অনিল রায়—আমার পেপার পেয়েছিল মাত্র পনের।

অমলা ॥ পনেরো না একান্ন?

পবিত্র ॥ একান্ন! তোমায় আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। পনেরো। এই নিয়ে কত কথা হলো। তোমার মনে পড়ছে না—

[অমলা নীরব রহিল]

পবিত্র ॥ তারপর ফি বছর যেমন তুমি করো, মার্কের ফরমগুলি তুমি পূরণ করেছিলে। আমি বিশ্বাস করে, তাতে সই দি। আমি বিশ্বাস করে এবার তাতে সই দিয়ে খাতাপত্র মার্কসীট সব পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ইউনিভারসিটিতে।

অমলা ॥ দিয়েছিলে।

পরিত্র ॥ সে পাশ হয়ে পাশের ভোজ খাওয়াচ্ছে বন্ধুদের আজ। তোমার ছেলে সেই ভোজ খেতে গেল। কী করে এটা হলো? কী করে এটা হয় অমলা?

[অমলা নীরব রহিল]

পবিত্র ॥ এ কাজ তোমার।

অমলা ॥ শোন—

পবিত্র ॥ না, না, প্রতিবাদ করো না। খাতা আর মার্কসীট খুললেই দেখা যাবে। পনেরো হয়েছে একান্ন তোমারই হাতে। নীচে সই আছে অবশ্য আমার। প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই অমলা। আমি সব বুঝেছি। নরেশের হাতের ঐ তিন হাজার টাকা তুমি নিয়েছো। তাই আজ আমার মুখে উঠেছে ওভালটিন, ছেলের গায়ে উঠেছে যাট্ টাকার পোশাক, মেয়ে পেয়েছে যাট টাকার শাড়ী। তুমি হয়তো নিয়েছো একজোড়া বেনারসী। স্যাকরা হয়ত গয়নার অর্ডারও পেয়ে গেছে। আজ আমাদের জন্য রান্না হচ্ছে পোলাও, কালিয়া, কোর্মা, কাবাব—এই তোমার High living and high thinking…standard of living বাড়াবার চমৎকার পথ তুমি করে নিয়েছো তো!

অমলা ॥ নিয়েছি এবং আশ্চর্য, প্রফেসার, এজন্য আমার এতটুকু লজ্জা হচ্ছে না। অনুশোচনাও হচ্ছে না। কেন জানো প্রফেসার? এ ঘুস যে দিয়েছে, সে হচ্ছে, এই সমাজের একজন মাথা। অতবড় ব্যারিষ্টার! কত সভা সমিতির প্রেসিডেণ্ট। কাগজে কাগজে কত তাঁর জয়গান।

[পবিত্র বোস উঠিয়া তাঁহার কোটটি পরিলেন। ছড়িটি হাতে লইলেন]

অমলা ॥ এ কী? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পবিত্র ॥ এখন আমার যা কর্তব্য তাই করতে!

অমলা ॥ মানে?

পবিত্র ॥ আমি ভাইস চ্যান্সেলারের সঙ্গে দেখা করবো।

অমলা ॥ বলবে তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে? যেখানে নিজের সই রয়েছে! বিশ্বাস করবেন তিনি এসব কথা?

পবিত্র ॥ করবেন না? আমি সব খুলে বলবো, তবু করবেন না?

অমলা ॥ তবু করবেন না। শুধু বল্‌বেন, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে প্রফেসার বোস। তুমি একটি Fool, ছুটি নাও। চিকিৎসা করাও। এসব কেলেঙ্কারী ঘেঁটে আমি ইউনিভারসিটির বদনাম কিনবো না।"

পবিত্র ॥ হুঁ। (কোট খুলিয়া ফেলিলেন। ছড়িটি যথাস্থানে রাখিলেন। চেয়ারে বসিলেন।)

অমলা ॥ চলো খেতে চলো। খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

পবিত্র ॥ আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

[অমলা প্রফেসারের কাছে আসিয়া তাঁহার চুলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল]

অমলা ॥ আমি যা করেছি—এ যুগে তা কিছু অন্যায় হয় নি। যুগটাই এখন এই। যা করেছি, শুধু ভালভাবে বাঁচবার জন্য।

পবিত্র ॥ বাঁচাই যায় এতে। ভালভাবেই বাঁচা যায় এতে। বেশ তোমরাই বাঁচো, কিন্তু আমি এতে বাঁচবো না অমলা। তুমি বলছো বাঁচবো, কিন্তু আমি দেখছি, আমরা মরে গেছি। সমাজটাই মরে গেছে। পচে গেছে।

[কৃষ্ণার প্রবেশ]

কৃষ্ণা ॥ খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল।

পবিত্র ॥ ও পচে গেছে—ও খাবার আমার মুখে উঠবে না! আমি চলে যাচ্ছি। এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

[চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

কৃষ্ণা ॥ এ কী বাবা? তুমি কোথায় যাচ্ছো?

পবিত্র ॥ ভয় নেই। মরতে যাচ্ছি না। তোমরা যে নাগপাশে আমায় বেঁধেছো—সাধ্য কি আমার তা কেটে বেরিয়ে পড়ি। যাচ্ছি আমি পার্কে। একটা বেঞ্চে শুয়ে আকাশের তারাগুলো চেয়ে দেখবো আজ সারারাত। চেয়ে চেয়ে ভাববো, ওরা কত কি দেখল, আমরা কত কি দেখছি।

[প্রস্থানোদ্যত]

কৃষ্ণা ॥ বাবা! দাঁড়াও আমি আসছি। আমিও আজ ক'দিন থেকে কম

দেখছি না। আমি বুঝতে পেরেছি কি তোমার দুঃখ। কিন্তু মা, তাই বলে তোমাকেও আমি ভুল বুঝছি না। সাধারণে যা করে তুমি তাই করেছ। কিন্তু আমার বাবা অসাধারণ—অসাধারণ।

[পিতার অনুগমন]

অমলা ॥ কিন্তু আমার কি দোষ! ঐ অসাধারণ লোকটাকে ভালভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে আর আমার কী পথ আছে?

[অমলা কাঁদিতে লাগিল]

শিক কাবাব

বনফুল

[প্রকাণ্ড একটি হল-ঘর। ছাদ পাকা নয়, খাপরার চাল। একটি বড় বরগা ঘরের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে দেখা যাইতেছে। পর্দা টাঙাইয়া হলটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। পর্দা একটি নয় দুইটি—পাশাপাশি টাঙানো আছে। পর্দার ওপারে কি আছে তাহা দেখা যাইতেছে না বটে, কিন্তু উভয় পর্দার সন্ধিস্থল ফাঁক করিয়া দিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে। ঘরের দুই দিকে দুইটি দরজা আছে। ঘরের মাঝামাঝি একটি গোল টেবিল এবং দেয়াল ঘেঁসিয়া ছোট লম্বা গোছের আর একটি টেবিল রহিয়াছে। গোল টেবিলের চারি ধারে কয়েকখানি দামী চেয়ার আছে। সুদৃশ্য ডোম-সমন্বিত একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলিতেছে। একটি প্লেট হাতে করিয়া করিম খানসামা প্রবেশ করিল। করিম খানসামার নুর আছে; পরিধানে চেক-চেক লুঙ্গি, ফতুয়া এবং মলিন ফেজ। প্লেটটি ছোট লম্বা টেবিলে রাখিয়া করিম উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে ডাক দিল]

করিম ॥ কই রে শিবু, শিকগুলো নিয়ে আয়।

শিবু ॥ [নেপথ্য হইতে] যাই।

করিম ॥ [এদিক ওদিক চাহিয়া] সব ঘরগুলোর খাপরা নাবিয়েছে দেখছি। ঘরের মাঝামাঝি আবার পর্দা টাঙিয়েছে কেন! শিবু, ওরে শিবু।

শিবু ॥ [নেপথ্য হইতে] যাই—যাই।

[শিবু প্রবেশ করিল। ঝানু চেহারা। তাহার কাঁধে ঝাড়ন, পরনে ফতুয়া এবং হাতে গোটা দুই লোহার শিক। শিবু আসিয়াই চোখ বড় বড় করিয়া ঠোঁটে আঙুল দিল]

শিবু ॥ আরে, চুপ চুপ করিম মিয়া, অত চেঁচায় না।

করিম ॥ কেন?

শিবু ॥ [পর্দা দেখাইয়া, চুপি চুপি] আরে, দেখছ না?

করিম ॥ দেখছি তো, পর্দা টাঙালে যে হঠাৎ?

শিবু ॥ [চুপি চুপি] ওপারে মেয়েমানুষ আছে।

করিম ॥ [সবিস্ময়ে ও নিম্ন কণ্ঠে] তাই নাকি?

শিবু ॥ তা না হ'লে শুধু শুধু পর্দা টাঙাব কেন ?

[উভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল]

করিম ॥ কর্তা তা হ'লে আর একটি উড়িয়ে এনেছেন ?

[শিবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল]

শিবু ॥ তাই না শিক-কাবাব করবার জন্যে তোমার ডাক পড়েছে। তোমার হাতের শিক-কাবাব নইলে কর্তার ফুর্তিই জমে না যে।

[করিম দন্ত বিকসিত করিয়া হাসিল]

করিম ॥ দাও তা হ'লে শিকগুলো, মাংসটা গেঁথে ফেলি চটপট।

[শিবু শিক দিল, করিম মাংস গাঁথিতে লাগিল]

শিবু ॥ এখানে টেবিলটা ময়লা করবে কেন, চল না, রান্নাঘরে ব'সে গাঁথবে।

করিম ॥ রান্নাঘরে যা ধোঁয়া করেছ তুমি !

শিবু ॥ কয়লায় আগুন দিয়েছি যে, যাই একটু হাওয়া করি গিয়ে, মদও আনা হয়নি এখনও। তুমি মাংসটা গেঁথে নিয়ে চটপট এস।

[গমনোদ্যত]

করিম ॥ আরে আরে, শোন না—[বাম চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া] চিড়িয়া ফাঁসল কি ক'রে ?

শিবু ॥ বাবুর ওই যে একটি নতুন মোসাহেব জুটেছে আজকাল—

করিম ॥ কে, পান্নালালবাবু ?

শিবু ॥ হ্যাঁ। উনিই উড়িয়ে এনেছেন আজ সন্ধ্যেবেলা।

করিম ॥ [সাগ্রহে] কোথা থেকে ?

শিবু ॥ আমাকে জিজ্ঞেস ক'র না, আমি কিছু জানি-টানি না।

করিম ॥ তুমি বাবা পুরনো ঘুঘু, তুমি জান না !

[শিবু মুচকি হাসিল]

শিবু ॥ মাইরি বলছি, কালীর কসম। আমি চাকর মনিষ্যি সাতেও থাকি না, পাঁচেও থাকি না।

করিম ॥ তবু—

শিবু ॥ যেটুকু জানি, সেটুকু হচ্ছে এই—সকালে বৈঠকখানা ঝাড়পোঁছ করি, এমন সময় এক টেলিগেরাপ এল। জীবনধনবাবু তখন সেখানে ব'সে। টেলিগেরাপ প'ড়ে বাবু আমাকে বললেন, ওরে, পালকির বেয়ারাগুলিকে ব'লে দে, সন্ধ্যের সময় যেন তারা পালকি নিয়ে ইষ্টিশানে থাকে, জেনানি সোয়ারি আসবে। আর তুই বাগানবাড়িটা পরিষ্কার ক'রে রাখিস।

[শিবু একবার পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া নিম্নকণ্ঠে পুনরায় সুরু করিল]

আমি বললাম বাগানবাড়িতে তো জেনানি রাখবার মত ঘর নেই, মাঝের হল-ঘরটি ছাড়া সব ঘরের খাপরা নাবানো হয়েছে। বাবু ধমকে উঠলেন, বললেন, ওই হল-ঘরেই ফরাসের চাদর টাঙিয়ে একটা পর্দার ব্যবস্থা ক'রে রাখ।

[পুনরায় পর্দার প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল]

করিম ॥ [মাংস গাঁথিতে গাঁথিতে] তারপর ?

শিবু ॥ তারপর আর কি, সন্ধ্যের সময় পালকি এসে ওই পেছনের দরজাটায় লাগল, পান্নালালবাবু এসে কি একটু ফুসফুস গুজগুজ করলেন, চিড়িয়া এসে খাঁচায় ঢুকল। আমি ঝি-মাগীকে দিয়ে এক বালতি জল, একটা ঘটি আর কিছু জলখাবার পাঠিয়ে দিলাম। [হাত উল্টাইয়া] কত্তার ইচ্ছেয় কম্ম। যেমন যেমন বলেছিলেন, তেমনই তেমনই করেছি ; তোমাকেও খবর দিতে বলেছিলেন, তুমিও এসে গেছ ; যাই এবার, দেখি আঁচটার কতদূর !

[গমনোদ্যত]

করিম ॥ আরে, দাঁড়াও দাঁড়াও, আসল খবরটাই তো বললে না।

শিবু ॥ [সবিস্ময়ে] আবার কি ! যা জানি, তা তো বললাম।

করিম ॥ [ভুরু নাচাইয়া] মানে, চিড়িয়াটি কি রকম ? বুলবুল, না ছাতারে ?

শিবু ॥ [মাথা নাড়িয়া] জানি না ভাই।

করিম ॥ [অবিশ্বাসভরে] আরে যাও যাও।

শিবু ॥ সত্যি বলছি, কালীর কসম। তবে পর্দার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, বাগ্দী ক্যাওড়া নয়, ভদ্রলোকের মেয়ে।

করিম ॥ [লুব্ধ আগ্রহে] বল কি ?

শিবু ॥ তাই তো মনে হয়।

[ভুট্টা নামক বালক-ভৃত্য প্রবেশ করিল]

ভুট্টা ॥ এই পেঁপে-বাটাটা মাংসে পড়ে নি।

করিম ॥ সেকি, কোথায় ছিল ওটা এতক্ষণ ?

ভুট্টা ॥ রান্নাঘরের কোণের দিকটায় ছিল।

করিম ॥ একটা শিক তো গাঁথা হয়ে গেছে। আচ্ছা দে, বাকি মাংসটায় মিশিয়ে দিই।

[মিশাইয়া দিল]

শিবু ॥ তুই উনুনটায় হাওয়া কর গিয়ে, আমি যাচ্ছি।

[ভুট্টা চলিয়া গেল]

করিম ॥ বাগ্দীই হোক, ক্যাওড়াই হোক, আর ভদ্দরলোকই হোক, শেষ পর্যন্ত তো আমাদের ভোগেই লাগবে।

[হঠাৎ ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া হাসিয়া উঠিল]

শিবু ॥ [নিম্ন কণ্ঠে] আরে, চুপ চুপ, শুনতে পাবে যে, পাশেই রয়েছে।

[পর্দার ওপাশে চেয়ার সরানোর শব্দ পাওয়া গেল। উভয়েই সেদিকে সচকিত দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ]

করিম ॥ নিস্তারিণীটাকে আজকাল দেখলে কিন্তু কষ্ট হয়। দেখেছ এদানীং তাকে তুমি?

শিবু ॥ দেখেছি।

করিম ॥ গায়ে চাকা চাকা কি বেরিয়েছে বল দিকি?

শিবু ॥ [নির্বিকারভাবে] কি আবার, কুষ্ট।

করিম ॥ ক্যাওড়ার মেয়ে হ'লে কি হয়, রূপ ছিল বটে এককালে! প্রথম বাবুর কাছে যখন এল—ওরে ব্বাস রে—চোখ-ঝলসান রূপ!

শিবু ॥ হ'লে কি হয়, শেষ পর্যন্ত যে ওরা গিয়ে ব্যবসা খোলে! ব্যবসা যাঁহাতক খুলেছে কি মরেছে!

করিম ॥ কি করবে বল, বাবু তো আর চিরকাল পোষে না। পেট চালাতে হবে বেচারীদের।

শিবু। [দরজার পানে চাহিয়া] ওই কত্তা এসে পড়লেন, এখনও মদ আনা হয় নি। চল চল, যেটুকু বাকি আছে রান্নাঘরে ব'সেই গেঁথো।

[উভয়ে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে শিবু ঝাড়ন দিয়া টেবিলটা ঝাড়িয়া দিল। কথা কহিতে কহিতে জমিদার এবং মোসাহেব পান্নালাল আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পান্নালাল একটু রোগা-গোছের, ছিমছাম, চোখে চশমা, গোঁফদাড়ি কামানো। জমিদারটি খুব মোটা বর্তুলাকার ব্যক্তি। তিন থাক চিবুকের উপর কটা রঙের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথার সামনের দিকটায় টাক]

জমিদার ॥ ওসব কবিত্ব-টবিত্ব রাখ তুমি, মনে ঘাঁটা প'ড়ে গেছে বাবা। আগে ইতিহাসটা শুনি।

পান্নালাল ॥ ইতিহাস তো বললাম সংক্ষেপে।

জমিদার ॥ সংক্ষেপে টংখেপে চলবে না, বিশদভাবে শুনতে চাই। ইতিহাসটি পুরোপুরি না শুনে আমি ছুঁচ্ছি না ওসব। সেবারে মনে নেই, এক পুলিস-কেসেই ফেঁসে গেলাম বাবা, হাজারখানেক টাকা লম্বা হয়ে

গেল ঘুষঘাষ দিতেই। এস, বসা যাক ভাল ক'রে সব গুছিয়ে বল দিকি শুনি। হ্যাংলার মত হামলে পড়বার বয়স গেছে—হঁ হঁ হঁ হঁ [হাসিলেন]।

পান্নালাল ॥ বেশ শুনুন তা হ'লে।

[চেয়ার টানিয়া দুজনে উপবেশন করিলেন]

জমিদার ॥ দাঁড়াও, সিগার বার করি।

[পকেট হইতে সিগার-কেস বাহির করিলেন]

দেশলাইটা কোথা গেল ?

[এ পকেট ও পকেট খুঁজিতে লাগিলেন]

ঠিক ফেলে এসেছি, এমন ভুলো মন হয়েছে আজকাল! ওরে শিবে!

[পান্নালাল পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিলেন]

পান্নালাল ॥ এই যে আমার কাছে আছে।

জমিদার ॥ দাও। এইবার আনুপূর্বিক সব কাহিনীটি বল দিকি বাবা, ভদ্দরলোকের মেয়ে তোমার খপ্পরে পড়ল কি ক'রে ?

পান্নালাল ॥ ওই যে বললাম, শেয়ালদা ষ্টেশনে পুলিসের হাতে ধরা প'ড়ে কাঁদছিল। আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল আর কি।

জমিদার ॥ আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল ? তুমি জানলে কি ক'রে ?

পান্নালাল। পুলিসের কাছে শুনলাম, রেল-লাইনে মাথা দিয়েছিল।

জমিদার ॥ তারপর ?

পান্নালাল ॥ তারপর আমি পুলিসকে কিছু দিয়ে-টিয়ে উদ্ধার করলাম। একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালাম বোঝালাম—

জমিদার ॥ [সকৌতুকে] কি বোঝালে ?

পান্নালাল ॥ বোঝালাম যে, এত অল্প বয়সে মরবার দরকার কি! চল, আমি তোমাকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি আমার এক জমিদার বন্ধুর বাড়িতে।

জমিদার ॥ আরে এটা তো শেষের ঘটনা। গোড়া থেকে সব বল না, শুনি। শেয়ালদা ষ্টেশনেই বা এল কি ক'রে, তার আগেই বা কোথা ছিল ? দাঁড়াও, এটা আগে ধরিয়ে নিই, তুমিও নাও একটা।

[জমিদারবাবু সিগার ধরাইতে লাগিলেন। দেখা গেল Alcoholic tremor আছে, হাত কাঁপে। পান্নালালও একটি সিগার লইয়া ধরাইলেন]

পান্নালাল ॥ [ধোঁয়া ছাড়িয়া] সেই মামুলি কাহিনী আর কি।

জমিদার ॥ কি ?

পান্নালাল ॥ মেয়ের বয়স হ'ল, কিন্তু পাত্র জুটল না, বাপ মা বিয়ের জন্যে ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল—

[জমিদারবাবুর সিগারটা ঠিকমত ধরিতেছিল না। তিনি তাহা ধরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

জমিদার ॥ কি বললে, ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগল, আই সি, তারপর ?

পান্নালাল ॥ তারপর যা হয়। কেউ চাইলে টাকা, কেউ চাইলে রূপ, কেউ চাইলে গান, কেউ চাইলে বাজনা, কেউ চাইলে নাচ, কেউ চাইলে লেখাপড়া, কেউ চাইলে সব—

[জমিদারের সিগার ঠিক ধরে নাই, নিবিয়া গেল। তিনি কম্পমান হস্তে পুনরায় তাহা ধরাইতে ধরাইতে গল্পে মনোযোগ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

অর্থাৎ বরপক্ষের চাহিদা সবই প্লাসের কোঠায় আর মেয়েপক্ষের দিকে সবই মাইনাস। সুতরাং বিয়ে হ'ল না, বয়স বাড়তে লাগল।

জমিদার ॥ [এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া] এইবার ধরেছে। কি বললে, বয়স বাড়তে লাগল, আই সি। [সহসা] মেয়েটি দেখতে কেমন ?

পান্নালাল ॥ এস না, দেখবে ?

জমিদার ॥ না, এখন থাক। এই অপেক্ষা ক'রে থাকার মধ্যেই একটা থ্রিল আছে হে, দেখলেই তো সব ফুরিয়ে গেল—হঁ হঁ হঁ হঁ। যাক, ইতিহাসটা আগে শুনে নিই। ভাল কথা, ওকে ওখানে বসতে-টসতে দিয়েছ তো ভাল ক'রে ?

[পর্দার দিকে চাহিলেন]

পান্নালাল ॥ একটা চেয়ার দিয়েছি।

জমিদার ॥ বেশ, এইবার বল শুনি। তারপর কি হ'ল ?

পান্নালাল ॥ তারপর একটু রোমান্টিক ব্যাপার ঘটল।

জমিদার ॥ কি রকম ?

পান্নালাল ॥ স্বাভাবিক নিয়মে মেয়েটি একটি প্রতিবেশী যুবকের প্রেমে পড়ল।

জমিদার ॥ [হাসিলেন] হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ হঁ।

পান্নালাল ॥ তারপরই কিন্তু হ'ল মুস্কিল, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না।

[জমিদারবাবু এ কথায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হাস্যবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না—এঃ হে হে হে হে হে করিয়া উচ্চকণ্ঠে ফাটিয়া পড়িলেন। শিবু এক বোতল হুইস্কি ও কয়েকটি গ্লাস লম্বা টেবিলটিতে রাখিয়া গেল]

জমিদার ॥ [সিগারের ছাই ঝাড়িয়া] বেড়ে বলেছ কথাটা হে, মনে মিলল, কিন্তু জাতে মিলল না, অ্যাঁ! তারপর ?

পান্নালাল ॥ উধাও হ'ল একদিন দুজনে।

জমিদার ॥ উধাও হ'ল! বল কি?

পান্নালাল ॥ হ্যাঁ।

[জমিদারবাবু বার্তাটি উপভোগ করিলেন এবং মৃদু হাসিয়া বলিলেন]

জমিদার ॥ ঠেকল গিয়ে কোথায়?

পান্নালাল ॥ কাশীতে।

জমিদার ॥ পুণ্য বারাণসী তীর্থে! [সহসা চক্ষু দুইটি বড় করিয়া] খান জায়গায় গিয়ে পড়ল বল।

পান্নালাল ॥ [মুচকি হাসিয়া] সে কথা আর বলতে! খান খান হয়েও গেল।

জমিদার ॥ কি রকম! এ যে রীতিমত উপন্যাস ক'রে তুললে তুমি বাবা! থাম থাম, এটা আবার নিবে গেল, ধরিয়ে নিই, আর গলাটাও একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বল অ্যাঁ? ওরে শিবু!

[কম্পমান হস্তে সিগার ধরাইতে লাগিলেন। কয়েক বোতল সোডা লইয়া হন্তদন্তভাবে শিবু প্রবেশ করিল]

তুই সোডা আনতে গেছলি বুঝি? ব্যাটা আগে থাকতে কিছু এনে রাখবে না। বোতলটা খোল।

শিবু ॥ খোলাই আছে হুজুর।

[শিবু হুইস্কির বোতল এবং তিনটি গ্লাস আনিয়া গোল টেবিলটাতে রাখিল। জমিদারবাবু দুইটি গ্লাসে মদ ঢালিলেন। শিবু সোডা খুলিল]

জমিদার ॥ [তৃতীয় গ্লাসটি দেখাইয়া] এটা আবার কার জন্যে?

শিবু ॥ জীবনধনবাবুর আসবার কথা ছিল।

জমিদার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো, সে এখনও এল না কেন? নে, ঢাল।

[শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। দুইজনে দুইটি গ্লাস তুলিয়া লইয়া 'সিপ' করিতে লাগিলেন]

এইবার বল শুনি। খান খান হয়ে গেল কি রকম?

পান্নালাল ॥ মানে কাশীর পাণ্ডার হাতে পড়ল আর কি। পাণ্ডাগুলো তো গুণ্ডারই নামান্তর।

জমিদার ॥ আর সেই ছোকরা?

পান্নালাল ॥ ছোকরা আর কি করবে, তার না ছিল ট্যাঁকের জোর, না ছিল গায়ের জোর।

জমিদার ॥ আই সি।

[শূন্য গ্লাসটি রাখিয়া দিলেন]

ভাগ্নে ফিরে এল ?

পান্নালাল ॥ নিশ্চয়। অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে।

জমিদার ॥ [হাসিলেন] হঁ-হঁ-হঁ-হঁ-হঁ তারপর ?

পান্নালাল ॥ মেয়েটি রইল কলকাতায়।

জমিদার ॥ কার কাছে ?

পান্নালাল ॥ সন্তোষবাবু তাকে এক অবলা-আশ্রমে ভর্তি করে দিয়ে এলেন।

[শিবু আসিয়া প্রবেশ করিল]

শিবু ॥ শিক-কাবাবের এখনও একটু দেরি আছে বাবু, এখনও ঠিক নরম হয়নি।

জমিদার ॥ [ধমকাইয়া] নরম আবার কোন জন্মে হবে ? মদ ফুরিয়ে গেলে ও গুষ্টির পিণ্ডি নিয়ে কি করব আমি ? সেবারেও ঠিক এই কাণ্ড হ'ল।

[গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালিলেন]

নে, সোডা দে। তুমি আর একটু নেবে নাকি পান্নালাল ?

পান্নালাল ॥ না থাক, পরে নোব।

[শিবু সোডা ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল]

জমিদার ॥ [বেশ বড় এক চুমুক পান করিয়া] হ্যাঁ, তারপর ? অবলা-আশ্রমে ভর্তি করে দিলে, তারপর ?

[পান্নালাল সিগার ধরাইলেন]

পান্নালাল ॥ তারপর আর কি, তপ্ত কটাহ থেকে অগ্নিকুণ্ডে। সেখানে এক ব্যাটা রাঘব-বোয়াল ম্যানেজার ছিল—

[জমিদার মদ 'সিপ' করিতেছিলেন, এ কথা শুনিয়া আনন্দে 'বিষম' খাইলেন]

জমিদার ॥ হে হে হে হে হে—রাঘব-বোয়াল—অ্যাঁ—বেড়ে উপমাটা দিয়েছ তো হে—না চিবিয়েই গেলে, অ্যাঁ ?

[পান্নালাল উপমা-প্রয়োগের কৃতিত্বটা স্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন]

ম্যানেজার রসিক ব্যক্তি বল। চিবিয়ে সব জিনিস যে গলাধঃকরণ করা যায় না, সেটা জানে, অ্যাঁ ?

[টলিতে টলিতে অসম্বৃত-বেশবাস মুক্তকচ্ছ জীবনধন প্রবেশ করিলেন। বগলে বোতল, কণ্ঠে গান]

জীবনধন ॥ [সুরে] গয়লা দিদিলো, তোর ময়লা বড় প্রাণ—

জমিদার ॥ এস এস, জীবনধন এস, তোমাকেই খুঁজছিলাম এতক্ষণ। ভয় হচ্ছিল কোথাও আটকেই গেলে বুঝি।

জীবনধন ॥ [জড়িত কণ্ঠে] যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে—

জমিদার ॥ ব'স ব'স।

[জীবনধন চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলেন]

জীবনধন ॥ সাড়া পেয়েই কোথায় সরালে বাবা পানু ?

[পান্নালাল মুচকি হাসিলেন]

জমিদার ॥ আরে, ব'স না আগে।

[জীবনধন ধপাস করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন]

জীবনধন ॥ হুকুম তো তামিল করলাম ইন্দ্রদেব, এইবার অপ্সরাটিকে আসতে বলুন।

জমিদার ॥ হচ্ছে হচ্ছে, সব হচ্ছে। ততক্ষণ এক আধ পেগ চালাও না।

জীবনধন ॥ তথাস্তু।

জমিদার ॥ শিবু তোমার জন্য আলাদা একটা গেলাস রেখে গেছে। এই নাও।

[তৃতীয় গ্লাসে মদ ঢালিলেন]

সোডা চাই ?

জীবনধন ॥ না। স্বয়ং সুজলাং ধান্যেশ্বরী উদরে বিরাজ করছেন—জলের অভাব নেই। নির্জলাই দিন।

[নির্জলা পান করিয়া মুখবিকৃত করিলেন]

জমিদার ॥ হ্যাঁ, অবলা-আশ্রমে কি হ'ল তারপর। রাঘব-বোয়াল করলে কি ?

পান্নালাল ॥ রাঘব-বোয়াল আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল, আমাকে যদি না গিলতে দাও, পাঞ্জাবীর কাছে বিক্রি ক'রে দোব।

জমিদার ॥ [সবিস্ময়ে] পাঞ্জাবীর কাছে ?

জীবনধন ॥ [জড়িত কণ্ঠে বিড় বিড় করিয়া বলিল] পাঞ্জাবীরা গুড ট্যাক্সি-ড্রাইভার —বেপরোয়া হাঁকায় বাবা।

[জমিদার মুচকি হাসিলেন]

জমিদার ॥ পাঞ্জাবী মানে ?

পান্নালাল ॥ অবলা-আশ্রমগুলো থেকে পাঞ্জাবীরা মেয়ে কিনে নিয়ে যায় যে, বিয়ে করবে ব'লে। বেশ দাম দিয়ে কেনে, এক হাজার দেড় হাজার পর্যন্ত দাম দেয়।

জমিদার॥ তাই নাকি? জানতাম না তো এ কথা। তুমি জানতে জীবনধন?

জীবনধন॥ [হাতজোড় করিয়া] যদি অভয় দেন, একটি কথা নিবেদন করি।

জমিদার। কি?

জীবনধন॥ অত্যন্ত বাজে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে হুজুর। পাঞ্জাবী প্রসঙ্গে আলোচনা চলবে জানলে কোন্ শালা—

জমিদার॥ আহা, আর এক পেগ চড়াও না, ততক্ষণ আমরা গল্পটা শেষ করি।

[জীবনধনকে আরও খানিকটা নির্জলা হুইস্কি ঢালিয়া দিলেন]

আর কতটা বাকি পান্নালাল?

পান্নালাল॥ আর বেশী নেই।

জীবনধন॥ [সান্ত্বনয়ে] তাড়াতাড়ি শেষ কর পান্নু, লক্ষ্মী ধন আমার।

[করিম শিক-কাবাব লইয়া প্রবেশ করিল]

করিম॥ একটা শিক নিয়ে এলুম, হুজুররা একটু চেখে দেখুন তো। ওরে শিবু, প্লেট নিয়ে আয় তিনখানা।

[শিবু তিনখানি প্লেট দিয়া চলিয়া গেল, করিম তিনটি প্লেটে শিক-কাবাব ভাগ করিয়া দিল]

জীবনধন॥ [এক কামড় দিয়া] উঃ, বড় গরম যে! উঃ উঃ, এ যে নেশা ছুটিয়ে দিলে বাবা—উঃ।

পান্নালাল॥ [সামান্য ভাঙ্গিয়া লইয়া চিবাইতে চিবাইতে] এখনও একটু কসর আছে হে।

[জমিদার বাম হাত দিয়া খানিকটা তুলিয়া ডান হাত দিয়া টানিয়া দেখিলেন]

জমিদার॥ হ্যাঁ, বেশ কসর আছে এখনও। নিয়ে যা, আরও খানিকটা হবে।

[পান্নালাল ও জমিদার প্লেট ঠেলিয়া দিলেন। জীবনধন কিন্তু প্লেট ছাড়িলেন না]

জীবনধন॥ আমার এই বেশ লাগছে বাবা, বেড়ে ঝাল ঝাল হয়েছে। করিমের মসলার হাতটি একেবারে নিখুঁত।

[চক্ষু বুজিয়া চিবাইতে লাগিলেন। করিম দুইটি প্লেট লইয়া চলিয়া গেল]

জমিদার॥ [পান্নালালকে] তারপর?

পান্নালাল॥ গতিক খারাপ দেখে মেয়েটি একদিন অবলা-আশ্রমের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল।

জমিদার। আবার পালাল? এতো খুব তুখোড় মেয়ে দেখছি হে! পাঁচিল ডিঙিয়ে, অ্যাঁ?

পান্নালাল ॥ পাঁচিল ডিঙিয়ে।

জীবনধন ॥ [সানুনয়ে] সংক্ষেপ কর বাপ পানু।

জমিদার ॥ তারপর ?

পান্নালাল ॥ তারপর কলকাতার জনসমুদ্রে ঘোলটান খেতে খেতে শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে হাজির এবং সেখানে—

জমিদার ॥ এবং সেখানে চারিচক্ষের মিলন, আর অমনই আমাকে টেলিগ্রাম —এহ্ এহ্ এহ্ এহ্! বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি।

[পান্নালাল স্মিত মুখে সিগার ধরাইতে লাগিলেন]

পান্নালাল ॥ ইতিহাস তো শুনলে, এইবার একটু আলাপ-পরিচয় হোক।

জমিদার ॥ আলাপ-পরিচয় করতে পারি, কিন্তু আর কিছু নয়। আজই সরিয়ে ফেল ওকে। [সহসা] তুমি আমাকে কি ঠাউরেছ বল দিকি ?

[পান্নালাল একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন]

পান্নালাল ॥ তুমি একদিন বলেছিলে কিনা যে, যদি ভাল জিনিষ কখনও চোখে পড়ে—

জমিদার ॥ এর নাম ভাল জিনিষ! সাত ঘাটের জল খাওয়া রাবিশ দাগী মাল। ছি ছি ছি ছি!

জীবনধন ॥ আরে বাবা, বারই কর না, দেখি জিনিসটা।

[পর্দার ওপার হইতে চেয়ার সরানোর একটা শব্দ হইল। পর্দাটা একটু নড়িয়া উঠিল]

জমিদার ॥ [চর্বিস্ফীত হাসি হাসিয়া] অধীর আগ্রহে ছটফট করছে ব'লে মনে হচ্ছে যেন!

[সহসা জীবনধনের পানে চাহিলেন]

আরে, ছি ছি জীবনধন, তুমি করছ কি, কাঁচা মাংসগুলো চিবুচ্ছ ? রক্ত বেরুচ্ছে যে ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে।

জীবনধন ॥ বড় মিঠে লাগছে কিন্তু।

[আর একটা শিক লইয়া করিম পুনরায় প্রবেশ করিল]

করিম ॥ আগেকার শিকটায় পেঁপে দেওয়া হয় নি, এই শিকটা দেখুন তো হুজুর। শিবু, প্লেট আন।

[শিবু প্লেট দিয়া চলিয়া গেল। করিম প্লেটে কাবাব পরিবেশন করিতে লাগিল। জমিদারবাবু তিনটি গ্লাসে আবার খানিকটা করিয়া মদ ঢালিয়া লইলেন]

জমিদার ॥ ওরে শিবু!

শিবু ॥ [নেপথ্য হইতে] আজ্ঞে যাই।

[কয়েক বোতল সোডা লইয়া শিবু প্রবেশ করিল]

জমিদার ॥ সোডা ভাঙ।

[সোডা ভাঙ্গিয়া জমিদারবাবুর হাতে দিল, তিনি নিজের গ্লাসে ও পান্নালালবাবুর গ্লাসে পরিমাণমত সোডা ঢালিয়া লইলেন]

পান্নালাল ॥ [শিক-কাবাব খাইয়া] এইবার ঠিক হয়েছে।

জমিদার ॥ [একটু চাখিয়া] হুঁ।

জীবনধন ॥ [বেশ খানিকটা মুখে পুরিয়া, নিমীলিত চক্ষে] দীর্ঘজীবী হও বাপ করিম, তুমি ছদ্মবেশী অন্নপূর্ণা বাপ।

[করিম ও শিবু চলিয়া গেল। তিনজনে জমাইয়া শিক-কাবাব সহযোগে মদ্যপান করিতে লাগিলেন]

পান্নালাল ॥ এইবার ডাকব ?

জীবনধন ॥ ডাক না বাপ। [সুর করিয়া] সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—

জমিদার ॥ ডাকতে পার, তবে আমি ওসবের মধ্যে নেই। ওসব দশ-হাত-ঘোরা জিনিস টাচ করি না আমি।

পান্নালাল ॥ [হাসিয়া] আলাপ ক'রে দেখতে ক্ষতি কি ?

জীবনধন ॥ কিস্সু ক্ষতি নেই।

পান্নালাল ॥ ডাকি তা হ'লে ?

জমিদার ॥ ডাক।

পান্নালাল ॥ সৌদামিনী !

[পর্দার ওপার হইতে কোনও উত্তর আসিল না]

—সৌদামিনী !

[কোন উত্তর নাই]

ঘুমিয়ে পড়ল নাকি !

[পান্নালাল উঠিয়া গেলেন ও পর্দা ফাঁক করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন]

একি !

জমিদার ॥ কি ?

[তিনিও উঠিয়া গেলেন ও অন্য পর্দাটা ফাঁক করিয়া ধরিলেন। দেখা গেল শূন্যে শেমিজ-পরা একটি নারীদেহ বরগা হইতে ঝুলিতেছে। পরণের শাড়ি খুলিয়া সৌদামিনী গলায় দড়ি দিয়াছে। জীবনধনও উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রক্তাক্ত মুখে ভীত বিস্মিত নেত্রে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন]

জীবনধন ॥ গলায় দড়ি দিয়েছে—অ্যাঁ, সেকি !

উপসংহার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দৃশ্য ঃ স্বামীর লিখিবার ঘর। সময় ঃ মধ্য-রাত্রি।

[পর্দা উঠিতেই দেখা গেল ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসিয়া সন্নিহিত টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া স্বামী প্রকাণ্ড একটা খাতায় কি-সব লিখিতেছেন। ঘরটি ছোট, তিনটি জানালা আছে, তিনটিই খোলা। টেবিলের উপর স্ট্যাণ্ডে নীল কাচের শেড্-দেওয়া ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বলিতেছে। টেবিলে ফাউন্টেন পেন হেলান দিয়া রাখিবার জন্য সমুদ্রের একটা কড়ি ও একটা য়্যাশ্-ট্রে ছাড়া আর কিছু আবর্জনা নাই—ছাইদানির হাতলে একটা অধদগ্ধ চুরুট। সামনের দেওয়ালে য়্যাব্রাহাম লিঙ্কনের একখানি বড় ছবি। ইহা ছাড়া ঘরে আর কোনোই আসবাব নাই। পশ্চিমের জানালাটির কাছে মেঝের উপর তরল একটু জ্যোৎস্নার আভাস পাওয়া যায়।

নিস্তব্ধ নির্জন ঘর—কোথা হইতেও একটি শব্দ আসিতেছে না। অপরিমেয় প্রশান্তি; কান পাতিয়া থাকিলে হয়তো মুহূর্তগুলির পদধ্বনি শোনা যাইবে।

খাতার পাতা উল্টাইয়া স্বামী লিখিয়া চলিয়াছেন। ধীরে-ধীরে দু'টি লাইন লিখিয়া হঠাৎ, কিছু ভাবিয়া লইবার জন্য, থামিলেন। পেনটা কড়ির গায়ে হেলান দিয়া রাখিলেন; চুরুটটা তুলিয়া টানিয়া দেখিলেন নিভিয়া গিয়াছে। দেরাজ হইতে দেশলাই বাহির করিয়া চুরুটটা ধরাইয়া পেনটা তিনটি আঙুলের মধ্যে নাড়িতে-নাড়িতে কতক্ষণ কি ভাবিয়া আবার খাতার উপর ঝুঁকিলেন, কিন্তু একটি লাইন লিখিয়াই কাটিয়া ফেলিতে হইল। পেনটা টেবিলের উপর আস্তে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ঘরের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত যেন নিষ্ফল আক্রোশে পাইচারি করিতে লাগিলেন।

তাঁহাকে এইবার স্পষ্টতর রূপে দেখা গেল। খর্বাকৃতি বলিষ্ঠ মানুষটি, চাপা নাক, জোরালো চিবুক, প্রশস্ত উন্নত ললাট, দুই চোখে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গ। গায়ে গরদের জামার বুকের দিকটা লিখিতে-লিখিতে কখন অন্যমনস্ক অবস্থায় ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, মাথার চুল দীর্ঘ না হইলেও অবিন্যস্ত—দেখিলেই কি-রকম উদাস ও উন্মত্ত মনে হয়। একবার জানালার কাছে মুখ বাড়াইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন—পাছে বাহিরের চন্দ্রালোকিত জগৎ তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। ঘরের মধ্যখানে দাঁড়াইয়া দুই মাংসল বাহু প্রসারিত করিয়া কিছুকাল ব্যায়াম করিলেন, পরে দুই মুঠিতে মাথার চুলগুলি লইয়া মাথাটা সজোরে ঝাঁকিয়া দিলেন—মস্তিষ্ক যেন অসাড় হইয়া আসিতেছে! খালিপায়েই পাইচারি করিতেছেন—টেবিলের নিচে চটিজুতাজোড়া দেখা যায়।

জানালা দিয়া পুনঃনির্বাপিত চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আবার চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। বিড়বিড় করিয়া কি বকিলেন কিছু বোঝা গেল না। পেনটা তুলিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তাহার পর কি লিখিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের নখের উপর অন্যমনস্ক চিত্তে পেন-এর নিবটা বারে-বারে ঠুকিতে লাগিলেন।

সহসা বিদ্যুত-বিকাশের মত মনে নবীন কোনো ভাবোদয় হইল বুঝি। আনন্দে অস্ফুট চীৎকার করিয়া ফের খাতার উপর দ্বিগুণ আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় বাহির হইতে ভেজানো দরজা ঠেলিয়া স্ত্রী প্রবেশ করিলেন। সামান্য যা একটু শব্দ হইল তাহাতে স্বামীর ধ্যান ভাঙিল না।

ইংরেজি ব্রুনেট্-ধরনের মেয়ে—শ্যামা, লাবণ্যললিতা: গায়ে সাদাসিধে একটি সেমিজ, তাহার উপর আটপৌরে একখানি শাড়ি—এইমাত্র শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন বলিয়া পারিপাটাহীন। বিকালের খোঁপা মধ্য-রাত্রে পিঠের উপর খসিয়া পড়িয়াছে। মুখে বিরক্তির ভাব, চোখে অনিদ্রাজনিত অস্থিরতা! বয়স কুড়ির বেশি হইবে না, দেখিলে নববিবাহিতা বলিয়া মনে হয়। মিলনের প্রথম সঙ্কোচ দূর হইয়া এখন বন্ধুতার নিবিড়তা ঘটিয়াছে—মেয়েটির অকুণ্ঠ আবির্ভাবেই তাহা ধরা পড়িল। সাধারণ বাঙালি মেয়ে—অথচ কোথায় যেন একটা বুদ্ধিরঞ্জিত তেজস্বিতা আছে বলিয়া মনে হয়।]

স্ত্রী ॥ [দরজা হইতে দুই পা আগাইয়া আসিয়া] তুমি আজ আমাকে ঘুমুতে দেবে না নাকি?

স্বামী ॥ [বাঁ হাত অল্প একটু তুলিয়া স্ত্রীকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াই চলিলেন।]

স্ত্রী ॥ [টেবিলের কাছে আসিয়া পিছন হইতে স্বামীর ডান হাত চাপিয়া ধরিয়া] আজ চোখে কি ঘুম নেই?

স্বামী ॥ [ঘাড় ফিরাইয়া] বিরক্ত কোরো না, মিনু।

স্ত্রী ॥ এখন রাত কত জান?

স্বামী ॥ রাত কত জানবার আমার কৌতূহল নেই। এটা রাত কি না, তাই আমার এতক্ষণ জ্ঞান ছিল না। যাও, শেষ না করে আমি উঠছি নে।

স্ত্রী ॥ তা হ'লে আমিও সত্যাগ্রহ সুরু করে দেব। অনবরত তোমার চুলে আর কানের ডগায় এমন সুড়সুড়ি দেব যে তুমি খাতার ওপর ঘুমিয়ে পড়বে।

স্বামী ॥ [মুখ না তুলিয়াই] ঘুম? পাগল! তোমার বিধাতাকে ঘুমুতে বল গে। বল গে, রাত অনেক হয়েছে, আর তারা ফুটিয়ে কাজ নেই। এবার বিশ্রাম কর।

স্ত্রী ॥ [হাসিয়া] অনেক আগেই তাঁর বিশ্রাম করা উচিত ছিল; তা হলে

তোমার মতন এমন অকর্মণ্যদের এনে পৃথিবীকে অযথা ভারগ্রস্ত করতেন না।

স্বামী ॥ আর, তুমিও চিরকাল কায়াহীন হয়ে থাকতে।

স্ত্রী ॥ বেঁচে যেতাম! এখন ওঠ দেখি। বড় ঘড়িতে আড়াইটের শব্দ শুনে উঠে এসেছি। রাত জাগলে বিধাতার পেট ফাঁপে না—তিনি চোখ বুজলে কারুর বিধবা হবার ভয় নেই। ওঠ!

স্বামী ॥ [গম্ভীর] বিরক্ত কোরো না, মিনু। তোমাকে শান্তিতে ঘুমুতে দেবার জন্যেই ঘর ছেড়ে দিয়ে এসেছি। যাও।

স্ত্রী ॥ আমার একা-একা ভয় করে যে! তা হলে এখানে তোমার সঙ্গে গল্প করে রাতটা কাটিয়ে দিই, কি বল!

স্বামী ॥ না। তুমি তোমার ঘরে যাও। তোমার উপস্থিতি এখন আমার পক্ষে অসহ্য। স্বামীর সাধনার বাধা হয়ো না, মিনু।

স্ত্রী ॥ ছাই সাধনা। দেব সব খাতা-পত্র ছিঁড়ে, হাওয়ায় উড়িয়ে! [খাতায় হাত দিল]

স্বামী ॥ [কর্কশ] মিনু। [বিরাম]

স্ত্রী ॥ কী হবে এই সব মাথামুণ্ডু লিখে। নোবেল-প্রাইজ চাও না কি? যা লিখেছ, তাতেই হবে, কাল সকালে উনুন ধরাবার আগে তোমাকে একটা ঘুঁটের মেডেল উপহার দেব'খন। চল।

স্বামী ॥ তুমি নেহাৎই সেকেলে, বাজে, স্টুপিড। তুমি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য কী বুঝবে?

স্ত্রী ॥ তার চেয়ে একটা নেকলেস-এর মূল্য বুঝতাম। হ্যাঁ, ঠিক কথা, বাবার চিঠির জবাব দিয়েছ? বিকেলে ঠাকুরঝিদের বাড়ি গেছলে?

স্বামী ॥ তোমার ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে কথা বল গে। আমাকে একা থাকতে দাও। তোমার আবির্ভাবে আমার ঘর অপবিত্র হয়ে উঠেছে। আর্ট শুচিতা ও স্তব্ধতা পছন্দ করে।

স্ত্রী ॥ তোমার আর্টের মাথায় ঝাঁটা মারবার জন্যেই তো আমার আবির্ভাব! [পেনটা কাড়িয়া] নিলাম এই কলম কেড়ে!

স্বামী ॥ [চটিয়া] এটা ইয়ার্কি করবার সময় নয়।

স্ত্রী ॥ ঘুমুবার সময়।

স্বামী ॥ [স্ত্রীর হাত হইতে পুনরায় কলম ছিনাইয়া] তুমি ঘুমোও গে, যাও; আমার আর আকাশের চোখে আজ ঘুম নেই।

স্ত্রী ॥ বাজে কবিত্ব করো না বলছি।

স্বামী ॥ সত্যি, তুমি আমাকে হঠাৎ স্পর্শাতীত কল্পনা-লোক থেকে একেবারে শুকনো কঠিন মাটিতে নামিয়ে এনেছ—

স্ত্রী ॥ আমার তা হলে বাহাদুরি আছে। তবু তুমি আমার মূল্য বুঝলে না। [হাসিয়া] আমার একজনের সঙ্গে সম্বন্ধ এসেছিল, কাল গেজেট খুলে দেখলাম ডেপুটি হয়েছে, সে নিশ্চয় আমাকে মাথায় করে রাখত, আর মাথা থেকে নামিয়ে মোটরে। নাম শুনবে ? তা বলছি নে।

স্বামী ॥ [কথা কানে না তুলিয়া] সেই বিস্তীর্ণ রাজ্যে আমি আর বিধাতা মুখোমুখি বসে সৃষ্টি করছিলাম ; তুমি কেন সেই তপস্যার বিঘ্ন হলে ?

স্ত্রী। [একটু সরিয়া] এখন তো দিব্যি আমার মুখোমুখি বসেছ ? আমি তোমার বিধাতার চেয়ে সুন্দর নই ?

স্বামী ॥ যশোবন্ত সিংহ হেরে এলে মহামায়া তাঁকে দুর্গে ফিরতে দেন নি। এমন বীরত্ব তোমার নেই কেন ? আমার সৃষ্টির উৎসে তোমাকে উৎসাহ-রূপে পাই না বলে দুঃখ হয়। কেন তুমি মহামায়ার মত বলতে পারবে না, উপন্যাস অসমাপ্ত রেখে এলে ককখনো ঘুমুতে দেব না আজ ?

স্ত্রী ॥ [হাসিয়া] তোমার জন্যে যে আমার মহা মায়া ! সারা রাত জেগে কাল যখন তোমার বুকের ধড়ফড়ানি সুরু হবে তখন আমাকেই তো মকরধ্বজ মেড়ে দিতে হবে।

স্বামী ॥ [খাতাটা তুলিয়া] এ লিখে যদি আমি মরেও যাই মিনু, তবু আমার এ কীর্তির মধ্যে আমি চিরকাল বেঁচে থাকব।

স্ত্রী ॥ একটা প্যারাডক্স বললে বটে, কিন্তু ভারি খেলো ছেলেমানসি হয়ে গেল !

স্বামী ॥ এমন একটা মহৎ কীর্তির কাছে তুচ্ছ স্বাস্থ্য, তুচ্ছ আয়ু, তুচ্ছ তোমার বৈধব্য !

স্ত্রী ॥ বল কি ! কত টাকার লাইফ-ইনসিওরেন্স করেছ ?

স্বামী ॥ আমি এখন উপন্যাসের খুব একটা কঠিন জায়গায় এসে ঠেকেছি। আর এক পৃষ্ঠা লিখলেই শেষ হয়, এবং এই শেষ পৃষ্ঠার ওপরেই উপন্যাসকে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হবে।

স্ত্রী ॥ তবে এই শেষ পৃষ্ঠা লিখে কাজ নেই। যতগুলি পৃষ্ঠা লিখেছ তা দিয়ে দিব্যি আগুন করে তোলা-উনুনে চা করি এস।

স্বামী ॥ [খাতার পাতা উলটাইয়া চিন্তিত ভাবে] তারাপদকে মারতেই হবে। তুমি কি বল ?

স্ত্রী ॥ কে তারাপদ ?

স্বামী ॥ আমার উপন্যাসের নায়ক।

স্ত্রী ॥ ও হরি! [হাসি]

স্বামী ॥ বোকার মত হাসলে যে বড়? তারাপদ কারো নাম হয় না? পেলবকুমার বা ললনালোভন না হলে বুঝি তোমাদের মন ওঠে না, না?

স্ত্রী ॥ ঐ রকম যার নাম, তাকে মেরেই ফেলা উচিত। [যেন একটু ভাবিয়া] হ্যাঁ, আমার সায় আছে।

স্বামী ॥ [চকিত] কি বললে?

স্ত্রী ॥ বললাম, পেট ফেঁপে নিজে মরার চেয়ে মনে-মনে কলমের নিব দিয়ে অন্য লোককে মেরে ফেলায় কৃতিত্ব বেশি। ঝঞ্ঝাট কম।

স্বামী ॥ [গম্ভীর] তুমি বড্ড ফাজিল হয়েছ, মিনু মান্য করে কথা বলতে শেখ।

স্ত্রী ॥ [নিজেকে শুধারাইবার চেষ্টায়] আচ্ছা। শ্যামাপদকে কেন মারবে? তার অপরাধ?

স্বামী ॥ শ্যামাপদ নয়, তারাপদ।

স্ত্রী ॥ হ্যাঁ, তারাপদ। ঐ ছোটখাট ভুলে কিছু এসে যাবে না। ওর নাম তারিণীপ্রসাদ হলেও চলত।

স্বামী ॥ [ধমকের সুরে] চলত না। নামে একটা য়্যাটমসফিয়ার আছে।

স্ত্রী ॥ [সায় দিয়া] আচ্ছা, আছে। কিন্তু নামের জন্যেই বেচারাকে মারতে হবে? বেচারার বিয়ে দিয়েছিলে? বৌর নাম কি রেখেছ শুনি? ভবতোষিণী?

স্বামী ॥ তা হলে গল্পটা তোমাকে বলি। [খাতাটা খুলিল]

স্ত্রী ॥ [অনুনয় করিয়া] সংক্ষেপে। তার চেয়ে আরেক কাজ করলে আরো ভালো হয়।

স্বামী ॥ কি?

স্ত্রী ॥ তারাপদর মৃত্যুটা যদি সংক্ষেপে সেরে ফেলতে পার তা হলে দুজনেই তাড়াতাড়ি ঘুমুতে যেতে পারি।

স্বামী ॥ কিন্তু তারাপদকে কেনই বা মারব?

স্ত্রী ॥ সে-ও একটা কথা বটে! কেনই বা মারবে?

স্বামী ॥ গল্পটা আগাগোড়া না শুনলে তুমি কিছুই বুঝবে না। [পড়িতে উদ্যত হইল]

স্ত্রী ॥ [ভয় পাইয়া] রক্ষে কর, আমি সব বুঝতে পেরেছি। তারাপদকে

মারতেই হবে—এতে আর কথা নেই। তোমার স্বাস্থ্য ও আমার সুনিদ্রার জন্যে মরতে ওর একটুও আটকাবে না। ফেল না মেরে।

স্বামী ॥ তারাপদ ভাগ্য কর্তৃক পদে-পদে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত হয়েছে। ওর গৃহ নেই, আশ্রয় নেই, পাথেয় নেই। ওর জন্যে মা'র স্নেহ নয়, প্রিয়ার প্রেম নয়, বন্ধুর অনুরাগ নয়। ও জীবনের একটা মূর্তিমান বিদ্রূপ, স্রষ্টার ভয়াবহ বৈফল্য!

স্ত্রী ॥ [যেন একটু ভাবিয়া] তবে এক কাজ কর। আমার মত একটি ভালো মেয়ে দেখে ওর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও। সুখে-শান্তিতে ঘরকন্না করুক।

স্বামী ॥ এত বড় একটা জীবনের এই শোচনীয় পরিণাম! তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, মিনু।

স্ত্রী ॥ বিনা-দামে এত সব মূল্যবান পরামর্শ দিলাম কি না—

স্বামী ॥ ওর জন্যে মৃত্যু—মহান মৃত্যু। সুষুপ্ত সমুদ্রের মত সুগম্ভীর। মৃত্যুই ওর জীবনের পরম পরিপূর্ণতা!

স্ত্রী ॥ ঠিক। বিয়ে দেওয়ার ঢের হাঙ্গাম—গল্প আবার বাড়তে চায়। সব কথা তখনো ফুরোয় না। ছেলেপিলে আসে, স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-ঝাঁটি সুরু হয়—নানান রকম ফ্যাকড়া জোটে। তার চেয়ে মেরে ফেলাটা ঢের সোজা—এক কথায় ল্যাঠা চুকে যায়। হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায় তা হলে।

স্বামী ॥ কিন্তু কিসে তাকে মারব?

স্ত্রী ॥ [যেন চিন্তিত] সেইটেই সমস্যা বটে। গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দাও না!

স্বামী ॥ ছি! আমি এমন একটা মৃত্যু-বর্ণনা করব, ভিক্টর হিউগোর পর তেমনটি আর পৃথিবীর সাহিত্যে লেখা হয় নি।

স্ত্রী ॥ [সরাসরি ভাবে] তা হলে এক কাজ কর। ওর পেটে এক রাজ্যি পিলে দিয়ে কালাজ্বরের রুগী করে ওর পাতে বাঙালি-মৃত্যু পরিবেষণ কর। ভারি রিয়ালিস্টিক হবে।

স্বামী ॥ তুমি এই ঘটনার গাম্ভীর্যকে সম্মান করতে পারছ না।...মাথা ঘুলিয়ে উঠছে।

স্ত্রী ॥ মকরধ্বজ নিয়ে আসব? না য়্যাসপিরিন?

স্বামী ॥ [চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া] লেখকের পক্ষে এ বড় কঠিন সমস্যা। সে নিষ্ঠুর, নির্বিকার, অপক্ষপাত। [একটু পাইচারি করিয়া] তারাপদকে মারতেই হবে।

স্ত্রী ॥ আমার একটা সদুপদেশ শুনলে ভালো করতে। তারাপদকে মারলে

তোমার বইও মাঠে মারা পড়বে। বিয়ের উপহারের জন্যে বিক্রি হবে না। 'ফুলশয্যা' নাম দিয়ে তারাপদর সঙ্গে ভবতোষিণীর বিয়ে দিয়ে উপন্যাসের ইতি করো। ওরাও ঘুমুক, আমরাও ঘুমুই।

স্বামী ॥ [পায়চারি করিতে করিতে] লেখকের দায়িত্ব অপরিসীম, মিনু; তুমি তা বুঝবে না। লেখকের জন্যেই পাঠক, পাঠকের জন্যে লেখক নয়। তারাপদের মৃত্যু পৃথিবীর লোক বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে উপভোগ করবে—সে-মৃত্যু সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে একটা নূতনতর উপলব্ধি!

স্ত্রী ॥ তা হলে এক কাজ কর। ওকে হিমালয়ের চূড়ায় চড়িয়ে ছেড়ে দাও; ও গড়গড় করে গড়িয়ে এসে ভারতমহাসমুদ্রে তলিয়ে যাক।

স্বামী ॥ [চটিয়া] তোমাকে এখানে বসে আর বক-বক করতে হবে না। [ধমক দিয়া] যাও। মেয়েমানুষ হয়ে তুমি এর কি বুঝবে? আমার না হয়ে কোনো কেরানির ঘরণী হলেই তোমাকে মানাতো।

স্ত্রী ॥ আমার জীবনোপন্যাস শেষ করবার আগে বিধাতা যদি তোমার মতো আমার কাছে এসে পরামর্শ চাইতেন, তা হলে আমি কবি ছেড়ে হয় তো কেরানিকেই বেছে নিতাম। তার আর চারা নেই। যাই হোক, লাগবে য়্যাসপিরিন?

স্বামী ॥ ইয়ার্কি করো না, মিনু। এখন আমি একা—মর্তলোকের কোনো বন্ধন আমার নেই, আমি একটা শরীরী আত্মা শুধু! একমাত্র অদৃশ্য মহাকাল আমার সঙ্গী।

স্ত্রী ॥ শুধু য়্যাসপিরিনে্ হবে না। কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে আনব?

স্বামী ॥ [চমকিত] কেন?

স্ত্রী ॥ মাথাটা তোমার ধুয়ে দিতাম। বাক্সে অ-ডি-কোলন আছে।

স্বামী ॥ কথার অবাধ্য হয়ো না, মিনু; ঘুমুতে যাও। দেহের সেবাদাসীর চেয়ে আত্মার ঘরণীকে আমি বেশি ভালোবাসি।

স্ত্রী ॥ কে সে?

স্বামী ॥ সে আমার আর্ট—আমার কলালক্ষ্মী! আমাদের নিভৃত মিলনকে দীর্ঘতর হতে দাও।

স্ত্রী ॥ বটে আমি কেউ নই?

স্বামী ॥ এই মুহূর্তে তুমি আমার কেউ নও। অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ! তোমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারো আমার ইচ্ছা নেই। তোমাকে আমি ভুলে গেছি।

স্ত্রী ॥ বটে ! এমন সতীনকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। [হাসিয়া] দ্বেষটা প্রেমের স্বাস্থ্যের পরিচয়, না ?

স্বামী ॥ কাল সকালের আলোতে আমি তোমার কাছে দেখা দেব—সেই পরিচিত সীমাখণ্ডিত মানুষ ! কিন্তু আজকের রাতেই আমার সত্যিকারের পরিচয় ; যদি পার, চিনে রাখ, মিনু।

স্ত্রী ॥ চোখ বড় করে অমন ভাবে কথা কয়ো না, বলছি। আমার ভয় করে।

স্বামী ॥ রাত্রি আমাকে রহস্যময় করেছে। মিনুর স্বামী বলে আজ আমার পরিচয় নয়, বেদের সংজ্ঞানুসারে আমি কবি, স্রষ্টা। বিধাতার সমকক্ষ।

স্ত্রী ॥ বিধাতার ছোট ভাই। বাঁচলে হয় !

স্বামী। [দারুণ চটিয়া] যাও !

স্ত্রী ॥ [আহত ও করুণ] বকছ কেন ?

স্বামী ॥ যাও।

[পর্দা ঠেলিয়া অভিমানভরে স্ত্রীর প্রস্থান]

[ইহার পরে কতক্ষণ বিরাম। স্বামী চেয়ারে বসিয়া দেরাজ হইতে চুরুট ও দেশলাই বাহির করিলেন ; চুরুটটা ধরাইয়া আবার খানিকক্ষণ পাইচারি করিয়া লইলেন। হঠাৎ ঘরের মধ্যখানে দাঁড়াইলেন, মাথায় নূতন কোনো আইডিয়া আসিয়াছে নিশ্চয় ; তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া চেয়ারে গিয়া বসিয়া পেনটা খুলিতেছেন—সহসা ঘরের ইলেকট্রিক আলো নিভিয়া গেল। তার ফিউজড হইয়া গিয়াছে। আলো নিভিবার সঙ্গে-সঙ্গেই খোলা জানালা দিয়া এক ঝলক জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরের মেঝেতে ও দেওয়ালে লুটাইয়া পড়িল। জ্যোৎস্নায় অন্ধকার একটু তরল হইয়া উঠিয়াছে।]

স্বামী ॥ [আপন মনে] এই যাঃ। কি হবে ? [উচ্চস্বরে] মিনু ! মিনু ! [দেরাজ টানিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে—অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে] একটা মোমবাতিও বা যদি কোথাও থাকে ! এমন সময়টায় আলো নিভে গেল ! [চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দরজার পর্দার কাছে গিয়া চেঁচাইয়া] মিনু ! মিনু ! [একটা বিশ্রী নিস্তব্ধতা]

[সেই মুহূর্তেই আবার সহসা ঘরের মলিন জোৎস্নাটুকু বিতাড়িত করিয়া ইলেকট্রিক আলো জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত ঘর আবার প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। স্বামী একটা স্বস্তিসূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া দরজা হইতে ফিরিলেন ; চেয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন—তাঁহার চেয়ারে একটি অপরিচিত লোক বসিয়া আছে।

লোকটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি—অত্যন্ত শীর্ণ চেহারা, দেখিলেই রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। ছিন্ন অপরিচ্ছন্ন কাপড় পরনে, গায়ের শার্টটা বুকের দিকে অনেকটা লম্বালম্বি ছেঁড়া,

একমাত্র গলার বোতামটাই আটকানো। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল—কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। চক্ষু দুইটি কোটরপ্রবিষ্ট—ভারি অবসন্ন দৃষ্টি। চেহারা দেখিয়া ঘৃণা হয় না, করুণা হয়। লোকটি চেয়ারে খাতার পৃষ্ঠা উল্টাইয়া কি সব দেখিতেছে।]

স্বামী ॥ [চমকিত ও ভীত] কে ?…কে তুমি ?

ভূত ॥ [অল্প হাসিয়া] চিনতে পাচ্ছেন না ?

স্বামী ॥ [দৃঢ়স্বরে] না। কি চাও তুমি এখানে ? [চারিদিকে চাহিয়া] কোত্থেকে এলে ? বল, তুমি কে ?

ভূত ॥ ভালো করে চেয়ে দেখুন। এই ছেঁড়া জামা-কাপড়, এই রোগা কাহিল দেহ, [পকেট উল্টাইয়া] এই শূন্য পকেট, [জুতা দেখাইয়া] এই হাঁ-করা জুতো—চিনতে পাচ্ছেন না ?

স্বামী ॥ না।

ভূত ॥ [কাশিয়া] এই দেখুন কাশছি, [কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া] রক্ত উঠছে—চিনতে পাচ্ছেন না এখনো ?

স্বামী ॥ [অস্থির] না। কে তুমি ?

ভূত ॥ আশ্চর্য ! এতদিন ধরে নিভৃতে বসে যার ছবি আঁকলেন, যাকে নিয়ে আপনার সৃষ্টির অহংকার, তাকে আপনি চিনতে পারবেন না ?

স্বামী ॥ [বিচলিত] তুমি—তুমি—

ভূত ॥ হ্যাঁ, আমি তারাপদ। আপনার উপন্যাসের ব্যর্থ লাঞ্ছিত মুমূর্ষু তারাপদ।

স্বামী ॥ তারাপদ ! [দুই পা পিছাইয়া গেলেন]

ভূত ॥ হ্যাঁ, তারাপদ ! আমাকে আপনার ভয় করবার কিছু নেই। [নম্রস্বরে] আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

স্বামী ॥ কি কথা ? [চারিদিক চাহিয়া—চমকিত অবস্থায়] কোত্থেকে এলে তুমি ?

ভূত ॥ আপনার ভাবরাজ্য থেকে। সমস্ত আকাশ সাঁতরে।

স্বামী ॥ এই মধ্য-রাত্রে ? কি করে পথ চিনলে ?

ভূত ॥ আকাশের কোটি-কোটি তারা ইসারায় আমাকে পথ চিনিয়ে দিয়েছে। মধ্য-রাত্রে এলাম, কারণ আজ আপনি নিঃসঙ্গ, আপনার আজ প্রচুর অবকাশ, এ-ঘরে আজ প্রগাঢ় স্তব্ধতা। তা ছাড়া—

স্বামী ॥ তা ছাড়া—

ভূত ॥ তা ছাড়া আজ এখুনিই আমার জীবনের ওপর শেষ কালো যবনিকা নেমে আসছিল। ভাবলাম আপনার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। [ব্যস্ত হইয়া] আপনার সঙ্গে আমার ঢের কথা আছে।

স্বামী ॥ [একদৃষ্টে ভূতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া] তোমাকে দেখলাম, ভালোই হল। কিন্তু তোমার যে এমন দুর্দশা হয়েছে, ভাবিনি। [পূর্বকথা স্মরণ করিয়া] ফরবেশগঞ্জে সেই চাকরি খুইয়ে সাত দিন ধরে উপোস করে আছ ?

ভূত ॥ আমার এই দুর্দশা কে করেছে ?

স্বামী ॥ কে করেছে ?

ভূত ॥ কে করেছে ! [টেবিলে কিল মারিয়া] আপনি।

স্বামী ॥ আমি নই তারাপদ, তোমার ভাগ্য। ঘটনার চাকার তলায় ফেলে ভাগ্য তোমাকে নিষ্পেষিত করছে।

ভূত ॥ [ক্ষেপিয়া] ভাগ্য ? আমার এই ভাগ্য কে তৈরী করলে শুনি ?

স্বামী ॥ তুমি নিজে।

ভূত। [ব্যঙ্গপূর্বক] আর আপনি কি করছিলেন ?

স্বামী ॥ [উদাসীন] আমি ? আমি নির্বিকার, নিরপেক্ষ—নেপথ্যে বসে তোমার জীবনকে যথাযথ বর্ণনা করাই আমার কাজ। তোমাকে খুব শ্রান্ত দেখাচ্ছে—চা খাবে ?

ভূত ॥ আপনি নির্বিকার বলেই আমার জীবনের কি পরিণতি হবে তারি জন্যে মাথা ঘামাচ্ছেন ! তবে এইখানেই আমাকে ছেড়ে দিন।

স্বামী ॥ না। তুমি যেখানে এসে পৌচেছ সেখান থেকে আর তোমার ফেরবার পথ নেই। মৃত্যুই তোমার বিশল্যকরণী !

ভূত ॥ [সোজা হইয়া] আমাকে মরতে হবে ? কেন ?

স্বামী ॥ [একটু পাইচারি করিয়া নিয়া] কেন, তার আবার কারণ কি ? এত নিদারুণ দুঃখের পর মৃত্যুই মধুর ! তোমার জীবনের মহৌষধি ! [পাইচারি করিতে-করিতে] কেন মরবে ? মরতে তোমাকে হবে। এ রকম অবস্থায় মানুষে মরলে ভারি মানায়।

ভূত ॥ [চেঁচাইয়া] ককখনো না। আমি মরব না। আমি বিদ্রোহ করব।

[স্বামী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। রাগে তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু মনে অজানিত কি-একটা ভয় ছিল বলিয়া কণ্ঠস্বরে সেই রাগ যথোচিত প্রকাশ হইল না।]

স্বামী ॥ [হাতের চুরুট দিয়া ইসারা করিয়া] তোমার সঙ্গে আমার তর্ক করবার সময় নেই। যাও।

ভূত ॥ আমি চলে যাবার জন্যে আসিনি।

স্বামী ॥ [স্তম্ভিত] কি চাও তা হলে ?

ভূত ॥ জবাবদিহি চাই।

স্বামী ॥ কিসের ?

ভূত ॥ আমার জীবনকে এমন বিশ্রী, বাজে করে শেষ করবেন কেন---তার।

স্বামী ॥ তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ করবার কথা নয়।

ভূত ॥ কিন্তু মরে আমি আপনার বাজে খেয়াল মেটাব না। না।

স্বামী ॥ [একটু হাসিয়া] কিন্তু না মরে তোমার উপায় কি ? তোমার ঘর নেই—

ভূত ॥ [থামাইয়া] পথ আছে।

স্বামী ॥ খাদ্য নেই। [ভূতের প্রতিবাদ শুনিবার আশায় একটু থামিলেন।] তা ছাড়া, এই খানিক আগে তোমার কাশি হচ্ছিল, তুমি রক্ত মুছছিলে। [সদর্প] না মরে তোমার আর কি করবার আছে ?

ভূত ॥ [নিরাশ] তার জন্যে আমাকে এমনি অসহায় অকর্মণ্য হয়ে রোগে ভুগে মরতে হবে ?

স্বামী ॥ [তেজস্বী] না। জানি, ও-রকম মৃত্যু তোমার জীবনের কলঙ্ক— ওই মৃত্যু তোমার দুঃখের পক্ষে অপমানকর। তোমার মৃত্যু মহান, গৌরবময়। তুমি আত্মহত্যা করবে।

ভূত ॥ [চমকিয়া] আত্মহত্যা !

স্বামী ॥ হাঁ, আত্মহত্যা।

ভূত ॥ [কঠিন] এই আপনার গৌরবময় মৃত্যুর উদাহরণ ? আমি কি এত কাপুরুষ ? আমার চরিত্র কি এত নির্জীব, এত দুর্বল ?

স্বামী ॥ না, অতিমাত্রায় ট্র্যাজিক্যাল। তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করবে, কিন্তু তিন দিন হাঁসপাতালে পড়ে থেকে ফের বেঁচে উঠবে।

ভূত ॥ [উৎফুল্ল] বেঁচে উঠব ?···যখন জ্ঞান হবে তখন দিন না রাত্রি ?

স্বামী ॥ শোনই না। বেঁচে উঠবে বটে, কিন্তু পুলিশের হাতে ধরা পড়বে।

ভূত ॥ কেন ?

স্বামী ॥ নিজের প্রাণ নিতে চেয়েছিলে বলে। সে-ও তো হত্যা-ই।

ভূত ॥ কই, নিজের প্রাণ নিতে চাই নি তো ! পাগল ! আমি করব আত্মহত্যা ?

স্বামী ॥ তারপর তোমার বিচার হবে। হাতকড়া বেঁধে তোমাকে আদালতে নিয়ে আসবে !

[ভূত ভীত হইয়া তাহার দুই হাত দেখিতে লাগিল]

শীর্ণ, পরিশ্রান্ত—দেখলেই মায়া হয়। কাঠগড়ায় যেই তুলতে যাবে তোমাকে, তুমি কনস্টেবলের কাঁধে ঢলে পড়েছ ; তুমি আর নেই।

ভূত ॥ না। না।

স্বামী ॥ [তন্ময়] জীবন-পলাতককে কে বাঁধবে, বল ? মরতে চেয়েছিলে বলে সমাজ তোমাকে আঘাত করতে চাবুক তুলেছিল, সেই চাবুক তারই পিঠে পড়বে। যার জন্যে শাস্তির আয়োজন, সেই হবে তার পরম পুরস্কার। তুমি মরতে কুণ্ঠিত হয়ো না, তারাপদ। সমাজের প্রতি তোমার এই অভিশাপ।

ভূত ॥ সমাজের থেকেও নিষ্ঠুর লোক আছে। [স্বামী চমকিত] সে আপনি ; স্রষ্টা।

স্বামী ॥ আমি ? আমি করুণাময় বলেই তোমাকে মৃত্যু উপহার দিচ্ছি। কল্যাণকর স্পর্শের মত কোমল !

ভূত ॥ আমার মৃত্যুর বিনিময়ে আপনি কীর্তি কিনতে চান। আমি তা দেব না। [খাতা নিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] আমি বিদ্রোহী।

স্বামী ॥ আমার বিরুদ্ধে ?

ভূত ॥ হ্যাঁ। সেই বিদ্রোহই আমার বাঁচা। আপনি মৃত্যুহীন, অনন্ত-আয়ু—মৃত্যুতে যে-বেদনা যে-অপমান নিহিত আছে, তা আপনি কি বুঝবেন ? বীরের মত সব দুঃখ আমি বুক পেতে সইব, কিন্তু পিঠ পেতে ভীরুর মত মার খেয়ে আমি মরতে পারবো না।

স্বামী ॥ [চেয়ারে বসিয়া] খাতাটা আমাকে দাও।

ভূত ॥ বলুন, মৃত্যু নয়—মানুষ যত দিন বাঁচতে পারে ঠিক ততদিনের আয়ু—সুদীর্ঘ, দুঃখময়—দিচ্ছি খাতা ফিরিয়ে। এই আকাশ আমার জন্যে খোলা থাক।

স্বামী ॥ কিন্তু মৃত্যুর পরেও একটা জগৎ আছে, তারাপদ। সেখানে আকাশ ফুরিয়ে যায় নি। সেই অপরিচিত জগতে গিয়ে বাসা বাঁধবে ভেবে তোমার রোমাঞ্চ হয় না ?

ভূত ॥ না। কে জানে সেই জগতেও হয় তো আপনারই মত স্বেচ্ছাচারী সম্রাট আছে কেউ। [দৃঢ়স্বরে] আমি তা সইবো না। সেখানকার আকাশ অন্ধকার, হিম, কঠিন। আমার এই আকাশের সঙ্গে তুলনাই চলে না। এত এর সঙ্গে আত্মীয়তা, তবু অপরিচয়ের মোহ ঘুচল না··· আপনি এখন ঘুমুন গে, আমি চললুম। [দুয়ারের দিকে পা বাড়াইল]

স্বামী ॥ [চেয়ার হইতে উঠিয়া] খাতা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

ভূত ॥ পথে। সুন্দরতর ভবিষ্যতের সন্ধানে। [আরেক পা বাড়াইল]

স্বামী ॥ [দৃঢ়স্বরে] খাতা ফিরিয়ে দিয়ে যাও।

[ভূত দাঁড়াইল বটে, কিন্তু কোন কথা কহিল না।]

স্বামী ॥ আমার হাত থেকে তোমার মুক্তি নেই। কোথায় তুমি যাবে ? অসীম আমার প্রতাপ, দুর্ধর্ষ আমার লেখনী। [টেবিল হইতে কলম তুলিয়া] এই রাজদণ্ড কে কাড়বে ? খাতা ফিরিয়ে দাও, তারাপদ। আকাশের দিকে চেয়ে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা তোমাকে শোভা পায় না।

ভূত ॥ [আগাইয়া আসিয়া বিরস বিবর্ণ মুখে] আপনার এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার কিছুই করবার নেই ?

স্বামী ॥ মৃত্যু ছাড়া কিছুই করবার নেই। [চেয়ারে বসিয়া] অত্যাচার নয়, তারাপদ, আশীর্বাদ।

ভূত ॥ আমি মহাসমুদ্রের পারে চুপ করে বসে থাকতে চাই—

স্বামী ॥ তোমাকে লাফিয়ে পড়তে হবে।

ভূত ॥ না ; পারে শুধু চুপ করে বসে থাকবো,—সামনে ফেনফণাময় মহাসমুদ্র, অস্থির, উদ্বেল, আকাশে কোটি-কোটি তারা, মর্ত্যে কোটি-কোটি জীবন। কী বিচিত্র ! আমি সমস্ত গতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে চুপ করে বসে থাকব শুধু। আপনার এত বড় জগতে আমার জন্যে এতটুকু স্থান হবে না ? এত কৃপণ !

স্বামী ॥ চলমান সৃষ্টির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখায় কৃতিত্ব কি ? মৃত্যুও তো চলা।

ভূত ॥ না, থেমে পড়া। যদি চলবার শক্তি না দিন, বিশ্রাম করবার ধৈর্য দিন। জল না দিন ক্ষতি নেই, কিন্তু পিপাসাটুকু কেড়ে নেবেন না।

স্বামী ॥ সে-বাঁচায় লাভ কি ? তুমি স্ত্রী-পুত্র সব গত বছরের বৈশাখী-ঝড়ে রাক্ষুসি পদ্মায় বিসর্জন দিয়েছ ; শোকে তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ—

ভূত ॥ তবু তাদের ভুলিনি। মরে তাদের ভুলতে চাইনে।

স্বামী ॥ তোমার চাকরি নেই, সাত দিন থেকে তুমি নিরন্ন উপবাসী। তার ওপর তোমার যক্ষ্মা হয়েছে।

ভূত ॥ আপনি ইচ্ছা করলে আবার সব হতে পারে,— পদ্মা শুকিয়ে যেতে পারে, উপোস করে আমার যক্ষ্মা সেরেও যেতে পারে। আপনি ইচ্ছা করলে—পারে না?

স্বামী ॥ পারে না।

[ভূত একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। চীৎকারটা মিলাইয়া যাইবার পর একটু স্তব্ধতা।]

স্বামী ॥ [যেন একটু নরম] তুমি এই বিশ্রী জীবন নিয়েই বা কি করবে? সুখ নেই, স্বাস্থ্য নেই, সংসার নেই।

ভূত ॥ [উচ্ছ্বসিত] আশা, তবু আশা আছে। এই প্রকাণ্ড আকাশের নিচে ছোট একটি আশা নিয়ে তবু বেঁচে থাকব। দিন যাবে, রাত্রি হবে—আবার দিন আসবে না?

স্বামী ॥ যদি না আসে? ফুটপাতে যে-সব ভিখিরি পড়ে থাকে, তাদের চেহারা তুমি দেখেছ?

ভূত। বেশ তো, ওদের মেরেই হাত পাকান। [কাকুতিপূর্ণ] আমাকে ছেড়ে দিন।

স্বামী ॥ এই অবস্থায়?

ভূত ॥ আপনি বলুন—মুহূর্তে আমার গা থেকে সমস্ত খোলস খসে পড়বে। মেঘলা রাতের পর সজীব সূর্যের মত দেখা দেব। দেহে আমার উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, অন্তরে আমার সুধা-সমুদ্র। আপনি ইচ্ছা করলে রাক্ষুসি পদ্মা আমার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—আপনি ইচ্ছা করলে—

স্বামী ॥ আমার চেয়ে তোমার ইচ্ছার দৌড় যে বেশি দেখছি!

ভূত ॥ বেশ, মরা লোককে ফিরিয়ে দিতে না চান, চাইনে। কিন্তু যে-লোক মরতে চায় না, তাকে মেরে ফেলে তার মনুষ্যত্বকে বিদ্রূপ করার আপনার অধিকার নেই। আমাকে বাঁচতে দিন—বুক ভরে [নিশ্বাস নিবার ভঙ্গী করিয়া] নিশ্বাস নিতে দিন। এই নিশ্বাস নেবার হাওয়াটুকুর ওপর ট্যাক্স বসিয়ে আপনার লাভ কি?

স্বামী ॥ তুমি বাঁচবে?

ভূত ॥ হ্যাঁ, বাঁচবো। বেশি কিছু চাহিদা আমার নেই। একটি ছোট গ্রামে একটি ছোট কুটীর। জানালার ওপারে অকূল আকাশ! দেবেন? [হাত পাতিল]

স্বামী॥ এতটা পথ এসে তুমি এত সহজে এমনি উলটো ফিরে যাবে?

ভূত॥ ফিরিয়ে নিয়ে চলুন। আমি আবার আমার শৈশব পেতে চাই। সহজ, পরিমিত জীবন; আকাশচারী ধূমকেতু না হয়ে একজন সামান্য সাধারণ কেরানি! স্বল্প আহার, স্বাস্থ্য, আর মাথা পাতবার জন্যে একটু আশ্রয়!

স্বামী॥ তোমার আবদার তো বেশ!

ভূত॥ আবদার নয়, দাবি। আমি এখুনি মরতে চাই না। বেশ, দুঃখ দিন, কিন্তু তার অবসান নয়। কোটি-কোটি দুঃখের মধ্যে আমি জীবনকে আবিষ্কার করব। [হাত পাতিয়া] দিন, আপনার ঐশ্বর্যের ভাণ্ডারে কত দুঃখ আছে দিন।

স্বামী॥ তোমার বাঁচতে এত সাধ?

ভূত॥ এত! আমার কণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন বটে, কিন্তু ব্যক্ত করতে পারছি না।

স্বামী॥ বেঁচে কি করবে?

ভূত॥ জানি না; খালি বাঁচব। কান পেতে ধাবমান রাত্রির পদধ্বনি শুনব।

স্বামী॥ আচ্ছা, দাও খাতাটা। [হাত বাড়াইলেন]

ভূত॥ [খাতা না দিয়া] অনেক দূর থেকে আসছি,—ভারি খিদে পেয়েছে। কিছু—

স্বামী॥ এত রাতে কোথায় মিলবে?

ভূত॥ এক গ্লাশ জল দেবেন? দারুণ তেষ্টা পেয়েছে।

স্বামী॥ [চারিদিকে চাহিয়া] এ-ঘরে জলের কুঁজো নেই। মিনু ভিতরে ঘুমিয়ে আছে, তাকে আমি জাগাতে পারবো না।

ভূত॥ তখন যে ভারি চা খাওয়াতে চেয়েছিলেন!

স্বামি॥ তখন কেন জানিনা তোমার উপর আমার একটু করুণা হয়েছিল; পরে ভেবে দেখলাম সে আমার দুর্বলতা। দাও খাতা, আমার সময়ের মূল্য আছে।

ভূত॥ কেন করুণা হয়েছিল শুনি?

স্বামী॥ তোমার মাঝে আমি আমার নিজের শ্রান্তি দেখেছিলাম বোধ হয়— আমার নিজের বিফলতা! হয় তো তুমি আমার বিফল সৃষ্টি! দাও খাতা, মৃত্যুর প্রসাদে তোমাকে গৌরবান্বিত করব। বুঝলে তারাপদ, মৃত্যু মমতাময়ী! [হাত বাড়াইলেন]

ভূত ॥ দেব না খাতা ফিরিয়ে। আমার চোখে আয়ুর পিপাসা, [পদাঘাত করিয়া] আমি বাঁচবো। মরতে আমি শিখিনি !
স্বামী ॥ দাও ; পঙ্গুতা জীবন নয়, তারাপদ। দাও, দেরি করো না।
ভূত ॥ দেব না।
স্বামী ॥ দাও। আমি নিষ্ঠুর, নির্মম। আমার কাছে ভিক্ষা কোরো না। ভিক্ষা করে নিজেকে অসম্মান করা তোমাকে শোভা পায় না। তুমি বীর, বীরের মতো মরবে।
ভূত ॥ [হাসিয়া] হ্যাঁ, বীর। বীরের মতো আমি বিদ্রোহ করব, বাঁচব। যদি পরিপূর্ণ জীবন না দেন, তবে দস্যুর মত আপনার থেকে আমি সব ছিনিয়ে নেব—স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য, সম্ভোগ—আপনার নিরুদ্বেগ ভবিষ্যৎ। আমার সঙ্গে আপনাকেও আকাশ-শেষের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়তে হবে।
স্বামী ॥ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তুমি পারবে? [কলম তুলিয়া] আমার অস্ত্র দেখেছ?
ভূত ॥ আমারো অস্ত্র আছে। [খাতা দেখাইল] আমার অসমাপ্ত জীবন !
স্বামী ॥ [শ্রান্ত] আমার মাথা ঘুরছে। দাও শিগগির খাতাটা। এই রাত্রির ও-পারে তোমার জগৎ আর নেই, তারাপদ। কেন বৃথা বিরক্ত করছ। দাও। [চেয়ার হইতে উঠিলেন]
ভূত ॥ [খাতাটা বুকের উপর আঁকড়াইয়া ধরিয়া] দেব না।
স্বামী ॥ [চীৎকার করিয়া] দেবে না?
ভূত ॥ [দৃঢ়] না।

[স্বামী সহসা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তারাপদর টুঁটি চাপিয়া ধরিলেন।]

স্বামী ॥ দেবে না? তোমার এতদূর স্পর্ধা? তুমি আমার হাতের পুতুল, তোমাকে আমি দূর শূন্যে ছুঁড়ে মেরে তোমার পতন দেখব, ভেঙে গেলে করতালি দিয়ে উঠব। দেবে না ! [খাতা ছিনাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিলেন]

[ভূত নিমেষে নিদারুণ বলপ্রয়োগ করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া নিল।]

ভূত ॥ [চুল বিপর্যস্ত, চাহনি কর্কশ] তবে এই নিন—[খাতাটা দুই হাতে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল]
স্বামী ॥ [চীৎকার করিয়া] তারাপদ ! তারাপদ ! এ কী করলে?
ভূত ॥ [দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইয়া] আমি মুক্ত, জয়ী। চললুম। লোকালয় অন্ধকার করে দিন—

[সহসা স্টেজ অন্ধকার হইয়া গেল। খোলা জানালাগুলি দিয়া নিমেষে রাশি-রাশি জ্যোৎস্না ঘরের মধ্যে লুটাইয়া পড়িয়াছে।]

স্বামী ॥ [আকুল স্বরে] তারাপদ! তারাপদ! দাঁড়াও—

ভূত ॥ [দুয়ারের কাছে আসিয়া] সময় নেই। চললুম।

স্বামী ॥ কোথায়?

ভূত ॥ নব-জীবনের দেশে।

[ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল]

স্বামী ॥ [চীৎকার করিয়া] যেয়ো না, যেয়ো না, তারাপদ! দাঁড়াও।

[ছুটিয়া তারাপদকে ধরিতে গিয়া চেয়ার ধরিয়া নিজেকে সামলাইলেন। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া খানিকক্ষণ খাতার ছিন্ন পাতাগুলির দিকে অর্থহীন চোখে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর টেবিলের ধারে মাথা গুঁজিয়া রহিলেন।

চীৎকার শুনিয়া পাশের ঘর হইতে মিনু ছুটিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। হাতে জ্বলন্ত মোম-বাতি। দুই চোখে উদ্বেগ, কণ্ঠস্বরে ভীতি।]

স্ত্রী ॥ [স্বামীর মাথা নাড়িয়া] কী হ'ল? কী?

স্বামী ॥ [ধীরে মাথা তুলিয়া] কে, মিনু?

স্ত্রী ॥ চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

স্বামী ॥ [স্ত্রীর বাঁ হাতখানি মুঠির মধ্যে ধরিয়া] এখন রাত ক'টা?

স্ত্রী ॥ [মোমবাতিটা টেবিলের একধারে খাড়া করিয়া রাখিয়া] অনেক। এখনো ঘুমুতে যাবে না? চেঁচিয়ে উঠলে কেন? সবে একটু ঘুম এসেছিল, চীৎকার শুনে জেগে দেখি ঘরে আলো জ্বলছে না। মেইন সুইচ 'অফ' ক'রে দিলে কেউ? তার ফিউজড হয়ে গেছে? কথা কইছ না কেন? ঘরে চোর এসেছিল? দরজা তো বন্ধই আছে।

স্বামী ॥ [স্ত্রীর হাতখানি আরো নিবিড় করিয়া ধরিয়া] মিনু!

স্ত্রী ॥ [ভীত] কী হয়েছে তোমার? [টেবিলের উপর ছিন্ন পাণ্ডুলিপির দিকে নজর পড়িতে] এ কী, তোমার গল্পের খাতা না?

[স্বামী নির্বোধের মত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

স্ত্রী ॥ এ কী করেছ? ছিঁড়ে ফেললে? [ছিন্ন পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিলেন] য়্যাঁ?

স্বামী ॥ জান মিনু, সে এসেছিল।

স্ত্রী ॥ [শঙ্কিত] কে?

স্বামী ॥ তারাপদ।

স্ত্রী ॥ তারাপদ?

স্বামী ॥ হ্যাঁ, তারাপদ। এই ঘরে, আমার চোখের সামনে। দুঃখে শোকে রোগে দারিদ্র্যে ভীষণ বিকৃত হয়ে গেছে। দেখলে তোমার মায়া হত, মিনু। আমার কাছে এসে এক গ্লাশ জল চাইল। আমি দিলুম না। বললুম, আমি নিষ্ঠুর, নির্মম ; ভিক্ষুককে আমি প্রশ্রয় দিই না। সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। মরতে সে চায় না, সে মরবে না, মরতে সে শেখেনি। তার স্পর্ধাকে শাসন করতে গেলাম, সে দু'হাতে আমার খাতা টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে দিয়ে গেল।

স্ত্রী ॥ [বিচলিত, ভীত] কোথায়, কোথায় সে ?

স্বামী ॥ চলে গেছে।

স্ত্রী ॥ [আশ্বস্ত] চুলোয় যাক সে। রাত জেগে মাথা গরম করে যত সব কুস্বপ্ন দেখা হচ্ছে। ওঠ! মাথা ধুয়ে শুতে যাবে চল। খাতাটা ছিঁড়ে ফেলে ভালোই করেছ। এখন আর প্রলাপ বকতে হবে না। ওঠ!

স্বামী ॥ [খাতার পাতাগুলি আরও ছিঁড়িতে-ছিঁড়িতে—অন্যমনস্ক] কেনই বা মারব তাকে ? তারই বা কি সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে ? [ছিন্ন খণ্ডগুলি ছড়াইয়া ফেলিতে-ফেলিতে] তাকে আমি সুখী করব। ইচ্ছা করলে আমি কী না করতে পারি ?

স্ত্রী ॥ তাই কোরো। এখন ওঠ দিকি।

স্বামী ॥ আবার নতুন করে লিখব।

স্ত্রী ॥ [হাসিয়া] আবার নতুন করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

স্বামী ॥ [চেয়ার ছাড়িয়া উঠিতে-উঠিতে] তুমি ঠাট্টা করছ, মিনু, কিন্তু তাকে তুমি তো দেখনি। মৃত্যুকে সে উপেক্ষা করে, জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা বলে বিশ্বাস করে না।

স্ত্রী ॥ কাজ নেই আমার দেখে। তোমাকে কে দেখে তার ঠিক নেই— তিন শ পাতা বই লিখে মাথা-গরম করে ছিঁড়ে ফেললে। তখন বললাম, এখানে একটু বসি, তা বসতে দিলে না। দেখতাম কে সে তারাপদ!

স্বামী ॥ [দাঁড়াইয়া] তাকে দেখবার সৌভাগ্য সকলের হয় না, মিনু। চল, আমি যাচ্ছি।

[দক্ষিণের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইলেন]

স্ত্রী ॥ আবার কী ? তারাপদ তো চলে গেছে।

স্বামী ॥ [জানালা হইতে ফিরিয়া] বাতিটা নিভিয়ে দাও, মিনু। তারাপদ আবার আসুক।

স্ত্রী ॥ [যেন ভয় পাইয়া] না। তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দেবে নাকি ?

স্বামী ॥ এবার তাকে দেখে তোমার একটুও ভয় লাগবে না, বরং খুসি হয়ে নিজেই তার সঙ্গে আলাপ করবে। সে মৃত্যুর অন্ধকার ছেড়ে নবজীবনের অমৃতলোকে এসে অবতীর্ণ হয়েছে। [টেবিল হইতে কলমটা তুলিয়া লইয়া] তাকে ডাকি। ভোর হতে এখনো অনেক দেরি !

স্ত্রী ॥ [বাধা দিয়া] আজ আর নয়। কাল, দিনের বেলায়। এখন ঘুমুবে চল।

আধিভৌতিক

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
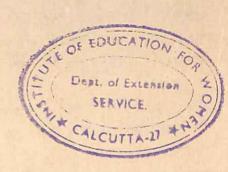
[রায়বাহাদুর বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইরের ঘর। সকাল আটটা। রায়-বাহাদুর বসে বসে তামাক টানছেন, আর কাগজ দেখছেন। তাঁর পত্নী মাতঙ্গিনী দাঁড়িয়ে আছেন।]

মাতঙ্গিনী ॥ শুনছো ?

রায় ॥ শুনছি, শুনছি, বলো।

মাতঙ্গিনী ॥ এই বিষ্যুৎবার শিবরাত্রি। আমি মঙ্গলবারে কিন্তু কাশী যাবো।

রায় ॥ বেশ ত, ঘেণ্টা-পেণ্টাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

মাতঙ্গিনী ॥ আর তুমি বুঝি ঐ দুটি নন্দী-ভিরিঙ্গী নিয়ে দিনরাত্রি গানে মেতে থাকবে!

রায় ॥ তুমিও ত দিব্যি মেতে থাকতে পারবে, ঠাকুর-দেবতা আর পূজো-আর্চা নিয়ে। একঘেয়ে লাগলে ঘেণ্টা-পেণ্টা আছে, একটু নাটক শুনিয়ে দেবে।

মাতঙ্গিনী ॥ ঝাঁটা মারি ওদের নাটকের মুখে। হ্যাঁ, শোনো, বয়স হয়েছে, এখন একটু ধর্ম-কর্মে মতি দাও। তোমাকেই যেতে হবে আমার সঙ্গে। আমি কোন আপত্তি শুনবো না।

রায় ॥ দেখি!

মাতঙ্গিনী ॥ দেখি না। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। দীনুকে দিয়ে আচার্যি মশায়কে ডেকেও পাঠিয়েছি। তিনি এলেই দিন-তারিখটা দেখিয়ে নাও।

[চাকর দীনুর প্রবেশ।]

দীনু ॥ বাবু, একটি সাহেব এসেছেন দেখা করতে।

মাতঙ্গিনী ॥ যত আপদ কি মরতে আসে এখানে! দুটো কথা কইবার পর্যন্ত উপায় নেই!

[প্রস্থান।]

রায় ॥ সাহেব? সাহেবরা ত সব দেশ ছেড়ে গেছে। নিশ্চয় কোন মোসাহেব এসেছে। তা, কি রকম সাহেব রে?

দীনু ॥ এই কালো-কালো গোছের, লম্বা-টম্বা!

রায় ॥ যা, নিয়ে আয়!

[দীনুর প্রস্থান। নিকল ড্যের প্রবেশ]

নিকল ॥ আপনি রায়বাহাডুর ভিনোড ভিহারী বোনারজী আছেন?

রায় ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাপু, কি চাও বলো ত?

নিকল ॥ আপনি একজন বেঙ্গলী এণ্ড ইংলিশ নোইং সেক্রেটারী চাহিয়াছেন। আমি হটে পারে। আমার নাম মিঃ নিকল ড্যে। আমি ইংরেজী ওর বাংলা ডুই-ই উট্টম জানে।

রায় ॥ তোমার ত যে অবস্থা দেখছি বাপু, তুমি ইংরেজীও শেখোনি, বাংলাও ভুলেছো। কথা বলো কি করে?

নিকল ॥ কঠা? কঠা আমি দস্তুর-মটো বলতে পারে। পুলপিট লেকচার ভি ডিতে পারে! শুনিবেন? সমাগট বড্রলোক, আউর নাড়ীগণ, অড্য এই মহটী জনসোভায় হামি···

রায় ॥ থামো বাপু, থামো। তোমাকে আর বক্তৃতার মহড়া দিতে হবে না। দরখাস্ত রেখে যাও, দরকার হলে খবর দোব!

নিকল ॥ ধন্যবাড। বাই বাই। [প্রস্থান]

রায় ॥ লক্ষীছাড়া গর্দভ কোথাকার! বাঙালীর ছেলে নিখিল দে পাৎলুন পরে হয়েছে নিকল ড্যে!

[দীনবন্ধুর প্রবেশ।]

দীনু ॥ এবার একটি সাধুবাবা এসেছেন বটে!

রায় ॥ গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় করতে পারলি নে? যা, নিয়ে আয়।

[দীনুর প্রস্থান। ব্যোমপ্রকাশানন্দের প্রবেশ।]

ব্যোম ॥ আপনার কাছেই এলাম একটু।

রায় ॥ তা ত দেখতেই পাচ্ছি। বক্তব্যটা কি?

ব্যোম ॥ আর্ত নরনারীর আশ্রয়ের জন্যে একটি সেবা-মন্দিরের গৃহনির্মাণ-কার্য স্থরু করেছি। সেই তহবিলে আপনাকে কিছু অর্থ দান করতে হবে।

রায় ॥ যেহেতু সেই অর্থে একদল অপদার্থ লোকের কিছু না করে দিব্যি আরামে খাওয়া-দাওয়া করা, আর পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে বসে দিন কাটানো দরকার!

ব্যোম ॥ জিনিষটাকে অত লঘু করে দেখবেন না। এই ভারতবর্ষ চিরদিনই···

রায় ॥ অলস আর নিষ্কর্মাদের দেশ !

ব্যোম ॥ আপনি সদাশয় ব্যক্তি, আপনার কাছে আমরা সেবা ও সহযোগিতাই যে আশা করি !

রায় ॥ খুব ভুল করেন। পরের পয়সা ঘরে ঢোকানোরই অভ্যেস আছে আমার, উল্টোটার নেই। তার চেয়ে বরং আমার গৃহিণীকে ধরবেন। কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। ঠাকুর-দেবতার নামে কলাটা-মূলোটা···

ব্যোম ॥ যে আজ্ঞে ! তাই ধরবো। আচ্ছা, আসি তাহলে এখন।

[প্রস্থান।]

রায় ॥ রাত পোহাতে না পোহাতে যেন ছেঁকে ধরেছে। ঠিকই বলছেন গিন্নী, দিন কতক কলকাতা থেকে পালানো দরকার। শরীরও বইছে না আর।

[একদিক দিয়ে প্রস্থান, অন্যদিক দিয়ে কাশতে কাশতে মোক্ষদা ডাক্তারের প্রবেশ।]

মোক্ষদা ॥ কৈ হে দীনবন্ধু, খো-খো, ভেতরে খবর দাও। বলো, খো-খো, ডাক্তার বাবু এসেছেন। কর্তাবাবুর ব্লাডপ্রেসারটা, খো-খো, মাপতে হবে যে !

[দীনবন্ধুর প্রবেশ।]

দীনু ॥ চলেন আজ্ঞে। কিন্তুক আপনার ত দেখি, লিজের চিকিচ্ছাই আগে করানো দরকার।

মোক্ষদা ॥ ভারী জ্যাঠা হয়েছিস ত ! খো-খো, ঘঙ ঘঙ !

[উভয়ের প্রস্থান।]

[কয়েক মিনিট পরে রায়বাহাদুর ও আচার্যির প্রবেশ।]

রায় ॥ কিছুদিন থেকেই মনটা যেন কাশী কাশী করছে। ভাবছি, মঙ্গলবার দিন সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়বো।

আচার্যি ॥ মানে সে ত অতি সৌভাগ্যের কথা। শাস্ত্র বলছেন কাশীবাস না স্বর্গবাস। তার উপর যদি সভার্যা কাশীবাস হয়, তা হলে ত আর কথাই নেই। একেবারে মণি-কাঞ্চনবৎ !

রায় ॥ আমার ত দেখতেই পাচ্ছো পণ্ডিত, ছেলে নেই, পুলে নেই, থাকার মধ্যে আছে ভাগ্নে ঘেন্টুটা আর শালীর ছেলে পেন্টুটা। এই দুটোকেই

দু-জনে এতকাল মানুষ করেছি। এখন ওরা বড় হয়েছে, ওদের হাতেই সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, এবার সরে পড়বো ভাবছি আমরা।

আচার্যি॥ মানে সে ত অতি আনন্দের কথা। শাস্ত্রে বলেছেন, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা! অর্থাৎ কিনা ত্যাগ করলেই ভোগ করা যায়! কিন্তু মানে এত অল্প বয়সে বানপ্রস্থ···

রায়॥ অল্প বয়স বলছো কি হে পণ্ডিত? তোমাদের শাস্ত্রে ত পঞ্চাশ পার হলেই বনে পালানোর পরামর্শ দিয়েছে। সে জায়গায়' এই আশ্বিনে আমি ত পা দিলাম পঁয়ষট্টিতে। তাহলে দেখো, পনের বৎসর এক্সটেনশন ত এর মধ্যেই পাওয়া হয়ে গেছে!

আচার্যি॥ মানে সে ঠিকই হয়েছে। শাস্ত্র বলেছেন, সংসারে থেকে যতখানি ধর্ম করা যায়, সংসার ছেড়ে, মানে, মানে···

রায়॥ তা শোন পণ্ডিত, তোমাকে দিন-তারিখটা একবার দেখে দিতে হবে ভালো করে। গিন্নীর ব্যাপার ত জানো, অশ্লেষা, মঘা, হাঁচি, টিকটিকি, হেন জিনিষ নেই, যা তিনি মানেন না!

আচার্যি॥ মানে অতি উত্তম কার্যই করেন। শাস্ত্র বলেছেন, পুরুষ বিত্ত উৎপাদন করবেন, আর নারী করবেন ধর্ম উৎপাদন। তবেই না ধর্ম-অর্থ এক সঙ্গে লাভ হবে! আর তাতেই মোক্ষ···

[চাকর দীনবন্ধুর প্রবেশ।]

দীনু॥ বাবু, মা বললেন, ঠাকুর মশাইকে দিয়ে এই পঞ্জিকাখানা একবার ভালো করে···

রায়॥ ঐ দেখো, তিনি এর মধ্যেই পাঁজী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আচার্যি॥ মানে বড়ই বারাণসীমনা হয়েছেন মা জননী। তা তাঁকে বলগে যা বাবা যে মঙ্গলবার বেশ ভালো দিন। উত্তরে ও পূর্বে যাত্রা শুভ। শুধু নৈঋতে যোগিনী।

রায়॥ তোমাদের এই যোগিনী ব্যাপারটার মানে কি হে পণ্ডিত?

আচার্যি॥ যোগিনী মানে এই ডাকিনী প্রেতিনী আর কি। তার মানে যাত্রা অশুভ।

রায়॥ দূর, তোমাদের এই সব কেতাবী কচ-কচির কোন মাথামুণ্ডু বুঝিনে। এই দীনে, দেখ তোর মা যেন কি বলছেন!

দীনু॥ বলছেন, বাজারে কি আনতে হবেক, তার নিষ্টি করে দিতে।

রায়॥ চল, দিচ্ছি। তাহলে পণ্ডিত মঙ্গলবার দিন যাত্রা শুভ, কেমন? আচ্ছা, এসো কাল আর একবার।

আচার্যি॥ মানে, মানে, আসবো বৈকি। অবশ্যই আসবো! কল্যাণ হক, মা জননীর শুভ যাত্রা হক। [সকলের প্রস্থান]

[লাফাতে লাফাতে এসে ঘরে ঢুকলো রায়বাহাদুরের ভাগ্নে ঘেণ্টু ও শ্যালিকাপুত্র পেণ্টু। ঘেণ্টুর হাতে একখানি বই, পেণ্টু হাতজোড় করে তার সামনে দাঁড়ালো।]

ঘেণ্টু॥ বল : দেব মূঢ় আমি,
না জেনে দিয়েছি ব্যথা হৃদয়ে তোমার।
একবার কৃপা করো,
শিষ্য বলে, পুত্র বলে,
পদচ্ছায়া দেহ অভাজনে।

পেণ্টু॥ একদমে এতখানি বলে গেলে, রিপিট করা যায় নাকি? আমার কি পার্ট মুখস্থ হয়েছে?

ঘেণ্টু॥ এখনো মুখস্থ হয়নি? আর ত মোটে দশদিন। তুই দেখছি ডুবিয়ে ছাড়বি!

পেণ্টু॥ আরে ঘাবড়াস কেন? আমার মুখস্থ করতে একদম সময় লাগে না। আর কোন জিনিস একবার মুখস্থ হলে, এ জন্মে তা আমি কক্ষণো ভুলিও না। দেখবি, ছেলে-বেলায় পড়া পদ্যমালা থেকে বলবো?
আহা কত গুণ পেয়ারার!
কাঁচা খাই, পাকা খাই,
ডাঁশার ত কথা নাই...

ঘেণ্টু॥ থাম, থাম,! তোর পদ্যমালা শুনতে চাচ্ছে কে?
বল : দেব, মূঢ় আমি!
না জেনে দিয়েছি ব্যথা...

পেণ্টু॥ দূর! ওটা কেমন যেন কায়দায় আসছে না। এই জায়গাটা রেখে দিয়ে আগে সেই যুদ্ধের সিনটা ধর। সেই :
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আর গভীর সাগর,
জল-স্থল, মহাশূন্য, আকাশ-পাতাল,
প্রকম্পিত,
মহাভীত আমার প্রতাপে...

[নিঃশব্দে কেদারের প্রবেশ।]

ঘেণ্টু ॥ আরে ওটা তো শেষ সিন। ওটা এখনি ধরবো কেন?

পেণ্টু ॥ দূর, তুই বুঝিস না কিচ্ছু। বলছি গরম সিনটা দিয়ে মুডটা আগে জমিয়ে নে। এই রে, সেরেছে!

ঘেণ্টু ॥ মুন্সীজী বুঝি?

পেণ্টু ॥ মুন্সীজী, পাঠকজী, দু-জনেই মনে হচ্ছে।

কেদার ॥ ওরা কারা রে?

ঘেণ্টু ॥ একজন গায়েন, আর একজন বায়েন।

পেণ্টু ॥ আর দু-জনেই মেসোমশায়ের মোসাহেব!

কেদার ॥ এখানেই বসবে বুঝি ওরা?

পেণ্টু ॥ শুধু বসবে? বেলা বারোটা পর্যন্ত একটানা ভ্যা-ভ্যা করে চেঁচাবে, আর পাখোয়াজ ঠেঙাবে!

কেদার ॥ বিদায় করে দিতে পারিস নে ঘাড় ধরে?

ঘেণ্টু ॥ সর্বনাশ! তাহলে আমাদেরই বিদেয় হয়ে যেতে হবে। এমনিতেই ওরা সব সময় তাল কষছে, কি করে আমাদের দু-জনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে, বাড়ী-ঘর টাকা-পয়সা দখল করবে, তার উপর যদি....

কেদার ॥ সে কি রে?

পেণ্টু ॥ ওরা মেসোমশায়কে দু-বেলা কি বোঝায় জানিস? বলে, আপনার ছেলে নেই, পুলে নেই। ঘেণ্টা আর পেণ্টার মতো দুটো দামড়া সর্বস্ব পাবে, এ কি ঠিক হচ্ছে রায়বাহাদুর? তার চেয়ে উচ্চসঙ্গীতের একটা বিশ্ববিদ্যালয় করে যান যে...

কেদার ॥ উচ্চসঙ্গীতের বিশ্ববিদ্যালয়?

ঘেণ্টু ॥ হ্যাঁ রে, তার নাম হবে নাকি স্বরব্রহ্ম নিকেতন!

কেদার ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন গেরস্ত নাম?

পেণ্টু ॥ কে জানে ব্যাটারা কি বুঝেছে!

কেদার ॥ মোদ্দা, এ ত ভালো কথা নয়। তোরা জলে পড়লে ত দু-দিনেই রঙ্গভারতী পটল তুলবে। শীগ্রী চল গুপীর ওখানে। একটা ভালো রকম ফন্দী না আঁটলে ত তোর মুন্সীর ঘুন্সী ছেঁড়া যাবে না চট করে!

ঘেণ্টু ॥ আর পাঠককেও ফাটকে পোরা যাবে না কান ধরে!

[তিনজনের প্রস্থান। বিপরীত দিক দিয়ে ঢুকলেন বরকত মুন্সী ও পাঠকজী। মুন্সীর গলায় ঢোলক, পাঠকের হাতে তানপুরা।]

মুন্সী ॥ বাপ, ছুটাছুটি কর‍্যা আর পারতেছি না !

পাঠক ॥ বৈঠ যাইয়ে ভাইয়া, আজ ত বিলাস-খানি টোড়ি লাগাই।

মুন্সী ॥ হ্যাহেন উস্তাদজী, আগে দুগা কিছু খাওন লাগবো। প্যাটের মধ্যে চুরচুরাইয়া বিরাল চিল্লাইতেছে, তানারে ঠাণ্ডা করন চাই।

পাঠক ॥ আরে খাওন ত জরুর হোবে। লেকেন আগে গাওন। বাত ইয়ে হ্যায় কি জানকে লিয়ে খানা, ঔর প্রাণকে লিয়ে গানা !

মুন্সী ॥ আরে রাহেন মুশায়, এই হকল বালো বালো কথা। এই যে রাইত পুহাইতে না পুহাইতে দুই মূর্তি আইসা জুটছি রায়বাহাদুরের লগে, এ কিসের লাগ্যা ? প্যাটের, না সঙ্গীতের ? কন ত হুনি !

পাঠক ॥ আরে শুনিয়ে ভাই,

ইনসানকে জিন্দীগি পর
সবসে বড়া ফর্মাণ,
ভুখ মরো ত মরো হসকে,
না ছোড় হরি গুনগান।

মুন্সী ॥ হঃ হঃ রাহেন রাহেন। আমি এট্টা সামসুল উল-উলেমা, খোদাবন্দের পাক কালাম পাইছি। আমি আপনাগো হরির নাম করুন ক্যান মুশায় ?

পাঠক ॥ আরে যিনহে খুদা হরি উনহে,

বানায়া ইস জমীন-আসমান,
আঁধি মে লোগ বাউরা হো কর
হুয়া হিন্দু মুসলমান !
ইনসানোকে জিন্দীগি পর....

মুন্সী ॥ বাহাবা, বাহাবা ! তাক, তাক, তেরেকেটে, তেরেকেটে, ধেইয়া !

[ডাক পিয়নের প্রবেশ।]

পিয়ন ॥ টেলিগ্রাম !

মুন্সী ॥ ত্যালের দাম ? আমাগো কর্তার ত ঘি ছারা কিছু চলে না !

পিয়ন ॥ আরে বাবু টেলিগ্রাম ! রায়বাহাদুর আছেন ?

মুন্সী ॥ হঃ আছেন। পূজা করতিছেন।

পিয়ন ॥ তাঁকে খবর দিন তাড়াতাড়ি।

মুন্সী ॥ কইছি না পূজা করতিছেন ! পূজা ফেলাইয়া আইবো ? তুমি কে এমন লাট সাহেবের বগিনীপতিডা আইছো !

পিয়ন ॥ বলছি ত টেলিগ্রাম !

মুন্সী ॥ টেলিগেরাম তো হইল কি ?

পিয়ন ॥ যান, যান, শীগ্রী খবর দিন। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

মুন্সী ॥ যামু কেমতে ? পর্দানশীন ঔরতরা আছেন নি ?

পাঠক ॥ আরে ছোড়দো ভাইয়া, ফালতু ঝামেলা। সঙ্গত করো।

ইনসানোকে জিন্দীগি পর…

পিয়ন ॥ টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম !

[রায়বাহাদুরের প্রবেশ।]

রায় ॥ কৈ, টেলিগ্রাম কোথায় ?

[টেলিগ্রাম দিয়ে পিয়নের প্রস্থান।]

পাঠক ॥ ক্যা ভৈল ?

রায় ॥ কিছু না, তোমরা যাও এখন। রেওয়াজ টেওয়াজ পরে হবে।

পাঠক ॥ বহুৎ আচ্ছা বাবুজী। [প্রস্থান।]

মুন্সী ॥ ফজরের থন ভুখ লাগছে, দুগা শুখা মুরিও পাইলাম না। কলিমুদ্দী মিঞায় কইতো, কপালে নাইরে ঘি, ঠকঠকাইলে হইব কি ? [প্রস্থান।]

রায় ॥ দীনু, দীনু, তোর মাকে শীগ্রী আসতে বলত।

[দীনুর প্রবেশ।]

দীনু ॥ মা ডালে সম্বরা দিচ্ছেন বটে বাবু।

রায় ॥ সেটা পরে দিলেও চলবে। আমার এক মিনিট দেরী করার উপায় নেই !

দীনু ॥ গরম হাতা লিয়ে মারতে আসবেক বাবু। মাকে ত চিনো আপনি।

[গৃহিণীর প্রবেশ। এক-পা এক-পা করে দীনবন্ধুর প্রস্থান।]

মাতঙ্গিনী ॥ কি হয়েছে কি ? হাঁক-ডাকে ত বাড়ী মাথায় করে তুলেছো একেবারে !

রায় ॥ হয়েছে সর্বনাশ ! হেড গোমস্তা রায়চরণ টেলিগ্রাফ করেছে, গ্রেট গোলমাল ইন মহাল, নায়েব কিল্ড !

মাতঙ্গিনী ॥ তা নায়েবগিরি করতে গেলে অমন কিলটা-চড়টা খেতেই হয় ! ও নিয়ে আদিখ্যেতা করলে চলবে কেন বাপু ?

রায় ॥ আহা-হা কিল না, কিল না, কিল্ড, খুন। পীতাম্বর খুন হয়েছে !

মাতঙ্গিনী ॥ খুন হয়েছে ? অ্যাঁ ? পীতাম্বর যে আমার পিসতুতো বোনের ভাসুরপো ছিল ! ওগো, আমার কি হল গো !

রায় ॥ আহা, কান্নাকাটি রাখো এখন। আমাকে সাড়ে বারোটার ট্রেণে রওনা হতে হবে। এখন এগারোটা বেজে পাঁচ। বুঝেছো!

মাতঙ্গিনী ॥ এই খুন-খারাবির মধ্যে?

রায় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর দেরী করার সময় নেই।

মাতঙ্গিনী ॥ দাঁড়াও, আচার্যি মশাইকে ডাকাই তাহলে।

রায় ॥ আরে রাখো তোমার আচার্যি মশাই॥ ওটা জানে কি? আস্ত বলদ একটা!

মাতঙ্গিনী ॥ নারায়ণ রক্ষে! মাথার উপর এই বিপদ। এমন সময় দেব-দ্বিজ নিয়ে কি বলো যা-তা!

রায় ॥ চুলোয় যাক তোমার দেব-দ্বিজ! আমার এখন ধন-প্রাণ নিয়ে টানা-টানি। আমি তোমার দেব-দ্বিজ কি ধুয়ে খাবো?

[সবেগে প্রস্থান।]

মাতঙ্গিনী ॥ দীনে, শীগ্রী ঘেণ্টা-পেণ্টাকে ডাক ত। [প্রস্থান।]

[ঘেণ্টু ও পেণ্টুর প্রবেশ।]

ঘেণ্টু ॥ ডানদিক থেকে দৌড়ে ঢুকেই তুই হাঁটু গেড়ে বসবি, তারপর তলোয়ারটা...

পেণ্টু ॥ তার চেয়ে এই রকম এক-পা, এক-পা করে হেঁটে এসে, যদি তলোয়ারটা পায়ের কাছে নামিয়ে দিই?

ঘেণ্টু ॥ দূর, তাহলে আর আর্ট হল কি? ভীষণ রেগে ছুটে এলো, তার-পরই বিনয়ে স্রেফ কাদা হয়ে গিয়ে বললো,

এই মোর রহিল কৃপাণ
তোমার চরণপ্রান্তে।
আজি হতে বিদ্যাবুদ্ধি যা আছে আমার
সকলই তোমার কাজে করিনু নিয়োগ!
দাস আমি তব।

পেণ্টু ॥ দূর, ঠিক মনের মতন হচ্ছে না। তার চেয়ে...

[মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।]

মাতঙ্গিনী ॥ দিন-রাত্তির ত মেতে আছো থিয়েটার নিয়ে। এদিকে মানুষটা যে একলা খুনের মধ্যে ছুটে যাচ্ছে, সে হুঁস আছে?

পেণ্টু ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও মাসীমা, ভারী গণ্ডগোলের জায়গায় এসে আটকে গেছে নাটকটা। এটা এখনি ঠিক করে না নিলে...

মাতঙ্গিনী ॥ ঠিক করাচ্ছি আমি, দাঁড়া। ঘেণ্টা আয় ত তুই আমার সঙ্গে।

ঘেণ্টু ॥ কি যে করো তুমি মামীমা, কিচ্ছু আর্টের ভ্যালু বোঝো না। চলো! পেণ্টা তুই ততক্ষণ ভাব, বুঝলি!

মাতঙ্গিনী ॥ ওরে লক্ষীছাড়া, উনি সাড়ে বারোটার গাড়ীতে ধুবড়ী যাচ্ছেন। সেখানে মহালে গণ্ডগোল। নায়েব খুন হয়েছে!

পেণ্টু ॥ অ্যাঁ? তাহলে চলো মামীমা, আমিও যাচ্ছি।

ঘেণ্টু ॥ চলো মামীমা, শীগ্রী চলো। [তিন জনের প্রস্থান]

[পরের দিন সকাল। আচার্যি মশায়, মাতঙ্গিনী ও দীনবন্ধু। দীনবন্ধুর হাতে বাজারের ঝুড়ি।]

মাতঙ্গিনী ॥ দিন-ক্ষণ না দেখিয়ে হুট করে চলে গেলেন। ভাবনায় ত সারা হয়ে যাচ্ছি আমি। একটা যজ্ঞ-টজ্ঞ, করুন কিছু, যাতে কার্য সিদ্ধি করে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে আসেন!

আচার্যি ॥ মানে সে ত উত্তম কথা। শাস্ত্র বলেছেন, সব চিন্তা, সব ভয় দূর হয়, দেবলোক আর পিতৃলোকের উদ্দেশে হবি নিবেদন করলে।

মাতঙ্গিনী ॥ অত শাস্তর-টাস্তর বুঝি না। যা করলে ভালো হয়, করুন। তবে বেশী লোক হলে পেরে উঠবো না।

আচার্যি ॥ মানে, মানে, লোক নয়, লোক নয়, দেবলোক।

মাতঙ্গিনী ॥ ও একই কথা। বামুন ত! তা কত করে পেন্নামী লাগবে এক-এক জনের?

আচার্যি ॥ চতুরধিকমেকং শুভ্রং রজতখণ্ডম্, মানে পাঁচ টাকা করে। ঈশ্বরের পরিতৃপ্তি সাধনের জন্যে, মানে এ আর বেশী কি?

মাতঙ্গিনী ॥ আচ্ছা, ভেতরে যান, বাজারের ফর্দ করে দিন দীনুকে। শুভ কাজটা আজই সেরে ফেলতে চাই, নইলে মনে শান্তি পাচ্ছিনে!

আচার্য ॥ মানে তা বেশ, তা বেশ। চলো বাবা দীনু।

দীনু ॥ বিটলে ব্যাটা মারবেক মোটা রকম, মুখে তাই হাসি আর ধরছে নি! তা হরি করেন ত আমারও দু-পয়সা হবেক এই ফাঁকে।

[আচার্যি ও দীনুর প্রস্থান।]

মাতঙ্গিনী ॥ কুসুম? ও কুসুম?

[কুসুমের প্রবেশ।]

কুসুম ॥ কি বলছো ঠাকমা?

মাতঙ্গিনী ॥ আচার্যি মশায় কি করছে রে?

কুসুম ॥ বড় ঘরের রোয়াকে বসে বসে ফর্দ বানাচ্ছে।

মাতঙ্গিনী ॥ এই বেলা চট করে তোর সেই ফকিরকে নিয়ে আয় ত। বলবি ঠাকমা ডাকছে। চুপি চুপি আনবি, ঠাকুর মশায় যেন জানতে না পারে।

কুসুম ॥ আচ্ছা ঠাকমা।

[প্রস্থান।]

মাতঙ্গিনী ॥ লক্ষ্মীছাড়া ঘেণ্টা আর পেণ্টাকে দিয়ে যদি এতটুকু কাজ পাবার জো আছে! রাত-দিন খালি বসে বসে খাওয়া, আর থিয়েটার। কর্তা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়। ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করি যদি এই সব আপদ-বালাই ত আমার নাম মাতঙ্গিনী নয়। দুষ্টু গোরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।

[ফকির ও কুসুমের প্রবেশ।]

ফকির ॥ আদাব মাইজী। বান্দাকে কেনে ডাকিয়েছেন?

মাতঙ্গিনী ॥ শুনলাম তুমি খড়ি পেতে গুণতে জানো?

ফকির ॥ হাঁ, খোদাকে মেহেরবাণীসে হাম থোড়া থোড়া কাকচরিত্তির জানে। কাউয়া তামাম পিথিমীমে ঘুমতা। উনহে দেখতে আউর জানতে পারতা সব কুছ। উহ কাউয়াকে বাত শুন কর কুছ কুছ সমাচার আদমিয়োঁকো হাম ফর্মাইতে পারে।

মাতঙ্গিনী ॥ তাহলে তুমি গুণে বলে দাও ত তোমাদের কর্তাবাবু এখন কোথায় আছেন, আর কেমন আছেন?

ফকির ॥ উহ গিণতি ত এখন না হোবে মাইজী। রাতকে আঁধেরি টুটেছে, লেকেন সকালভি না হয়েছে, এইসা বেলে পর চারগো বাতিয়া জালাকে, উসমে লোবান ঔর মুসব্বর পোড়াতে হবে। কুঁকড়াকে লোহু তোড়কে ইসিসে বাদে উহী ধোঁয়ামে কাউয়া লোককে লোককে বোলাতে হোবে!

মাতঙ্গিনী ॥ আঃ মলো যা। কিড়মিড় করে ছাই-ভস্ম কি বলে!

কুসুম ॥ ওগো বলছে, চারটে মোমবাতি জেলে তাতে কি-কি সব পোড়াতে হবে। তারপর সেই ধোঁয়ায় কাগ ধরে, তাকে দিয়ে খবর বলাতে হবে।

ফকির ॥ হাঁ, হাঁ, খোকীদিদি ঠিক সমঝিয়েছে। লেকেন হামি তাল-বেতাল গিণতি ভি জানে। উসিসে আভি বাৎলিয়ে দিতে পারে, কোরতাবাবু কেমন আছে, ফির কি করছে!

কুসুম ॥ ইকড়ি মিকড়ি রেখে তাই দাও না বাছা!

ফকির ॥ করিমা বিবকসায়ের বরহালেমা! ইস ফুট ফুট, চোঁ! বোল ত

বেটা বেতাল, কোরতা বাবু হামার কি কোরছে ? ভালো আছে ? দুধে-
ভাতে খাচ্ছে ? বেশ বেটা, বেশ ! মাইজী শুনিয়েছে ?

মাতঙ্গিনী ॥ শুনেছি। ঠিকই বলেছে রে কুসুম, দুধ-ভাত ছাড়া ত কিচ্ছু
খান না ! এ-বেলা এক সের দুধ, ও-বেলা এক সের দুধ, আর সেই সঙ্গে
এই ক-টি ভাত।

কুসুম ॥ এখন ওকে বিদেয় করো ঠাকমা। ঐ দেখো, আচার্যি ঠাকুর উঠে
দাঁড়িয়েছে। এখনি এলো বলে !

মাতঙ্গিনী ॥ শোনো ফকির, তুমি আজ ভোর বেলা তোমার ঐ গণাগুন্তি
যা করার করো। কাল সকালে এসে খবর বলে যেয়ো।

ফকির ॥ বহুৎ খুব মাইজী। লেকেন চার বাতিয়াকে চার আঢ়াইয়ে দশ,
কুঁকড়াকে পাঁচ পন্দেরা, ঔর…

কুসুম ॥ আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যাও তুমি। কুড়ি টাকা দিয়ে আসছি আমি
একটু পরে।

ফকির ॥ সালাম মাইজী। [প্রস্থান।]

[আচার্যির প্রবেশ।]

আচার্যি ॥ মানে ফর্দটা বুঝিয়ে দিতে হবে যে একটু মা জননী।

মাতঙ্গিনী ॥ চলুন, যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান]

[ঘেণ্টু ও পেণ্টুর প্রবেশ। দু-জনের হাতে দু-খানি বাঁকারি।]

ঘেণ্টু ॥ যুদ্ধের রিহার্সেলটা বার কতক ভালো করে দিয়ে না রাখলে, শেষ-
কালে কিন্তু মুস্কিলে পড়তে হবে। বল…

পেণ্টু ॥ তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আর গভীর সাগর,
জল-স্থল, মহাশূন্যে, আকাশ-পাতাল,
প্রকম্পিত…

[একখানা খবরের কাগজ হাতে সবেগে কেদারের প্রবেশ।]

কেদার ॥ ওরে ঘেণ্টা, ওরে পেণ্টা, তোদের ত বরাত খুলে গেল রে। এক
রাত্রের মধ্যে তোরা ত স্রেফ 'মার দিয়া কেল্লা' করলি রে।

ঘেণ্টু ও পেণ্টু ॥ কি রকম ? কি রকম ?

কেদার ॥ জানিস না ? এই দেখ।

পেণ্টু ॥ ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা : কলিকাতা হইতে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে নর্থ বেঙ্গল
এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত—শতাধিক ব্যক্তি নিহত—আহতের সংখ্যা এখনো
অনিশ্চিত !

ঘেণ্টু ॥ তা এতে বরাত খোলার কি আছে ?

কেদার ॥ এইখানটা পড় !

পেণ্টু ॥ নিহতদের মধ্যে যাঁহাদিগকে সনাক্ত করা গিয়াছে : কুড়নচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী, সোনারপুর, বনমালী সাঁপুই, বেহালা, রায় বাহাদুর বিনোদ-বিহারী ব্যানার্জী, নিউ আলিপু···

ঘেণ্টু ॥ অ্যাঁ? পেণ্টারে ?

পেণ্টু ॥ কিরে ঘেণ্টা ?

কেদার ॥ দেখ, সুখবর এনে দিলাম কিনা! এবার ঐ মুন্সী-ফুন্সীদের তাড়িয়ে আরামসে চেপে বস দু-জনে, কেষ্ট-বলরাম হয়ে। আর রঙ্গ-ভারতীটাকে খাড়া করে তোল স্রেফ শিশির ভাদুড়ীর ষ্টাইলে! কি বল ?

ঘেণ্টু ॥ সে আর বলতে !

পেণ্টু ॥ আমার কিন্তু নাচতে ইচ্ছে করছে !

ঘেণ্টু ॥ ধেৎ! কাঁদ, কাঁদ, ডুকরে কেঁদে ওঠ। নইলে লোকে বলবে কি ?

পেণ্টু ॥ ঠিক, ঠিক। ভুলেই গিয়েছিলাম! ও মাসীমা গো, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে গো !

ঘেণ্টু ॥ মামীমা গো, আজ আমরা পথে বসলাম গো !

[দৌড়ে আচার্যি, দীনবন্ধু, মাতঙ্গিনী ও কুসুমের প্রবেশ।]

মাতঙ্গিনী ॥ কি হয়েছে রে ঘেণ্টা ? চেঁচাচ্ছিস কেন রে পেণ্টা ? হয়েছে কি ?

আচার্যি ॥ মানে, মানে···

দীনু ॥ কিটা হইছে বটে ?

ঘেণ্টু ও পেণ্টু ॥ ও হো-হো, ই হি-হি।

মাতঙ্গিনী ॥ শীগ্রী বল কি হয়েছে। লক্ষ্মী বাপ আমার !

ঘেণ্টু ও পেণ্টু ॥ এহেঁ-হেঁ !

মাতঙ্গিনী ॥ কি হয়েছে রে কেদার ?

কেদার ॥ কালকে দুপুরের ট্রেণ উল্টে রায়বাহাদুর বিনোদবিহারী অকালে দেহরক্ষা করেছেন। খবরের কাগজে লিখেছে···

মাতঙ্গিনী ॥ অ্যাঁ ? ওরে আমার কি হলরে ? ওগো তুমি কোথায় গেলে গো ? তোমার জন্যে আজই যে আমি এক সের ডালের বড়ি দিয়েছি গো! আচার্যি মশায়কে দিয়ে তোমার জন্যে আমি যে···

আচার্যি ॥ মানে, মানে, অপঘাতজনিত মৃত্যু। কান্নাকাটি রেখে, এখনি

দেবকর্ম অর্থাৎ কিনা প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার। মানে শুভস্য শীঘ্রং। নচেৎ মৃতের পুষ্করা প্রাপ্তি হলে···

মাতঙ্গিনী ॥ ও হো হো!

ঘেণ্টু ॥ আ হা-হা!

পেণ্টু ॥ ই হি-হি!

[দীনবন্ধু ও কেদার সকলকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেল।]

কুসুম ॥ গেল মাসে আমার চার দিনের মাইনে কেটেছিল। শয়তান ব্যাটা মরেছে, না হাড়ে বাতাস লেগেছে। [প্রস্থান।]

(হরিপদ, ষষ্ঠীচরণ ও ধনঞ্জয়ের প্রবেশ। তারা শুনে ছুটে এসেছে।)

হরি ॥ ব্যাপার কি বলো ত খুড়ো? মেয়ে-মদ্দ কেঁদে পাড়া মাথায় করতে সুরু করেছে কেন সাত সকালে?

ষষ্ঠী ॥ কেমন করে জানবো বাবা? ঘেণ্টা-পেণ্টার ঠিয়েটার হচ্ছে বোধ করি। রায়বাহাদুরের যেমন কাণ্ড! ভাত দিয়ে আস্ত দুটো জানোয়ারকে···

ধন ॥ আরে না, না, একটা কিছু হয়েছে। আচ্ছা দাঁড়াও, ডাকছি আমি। দীনু, ও দীনু?

দীনুর প্রবেশ।]

দীনু ॥ কেনে চিল্লাচ্ছো বটে?

ধন ॥ হয়েছে কি? এত কান্নাকাটি···

দীনু ॥ কান্নাকাটি না হবেক কেনে? কর্তাবাবুর যে কম্ম কিলিয়ার হৈ গিইছে মশয়!

ষষ্ঠী ॥ কম্ম কিলিয়ার কিরে?

দীনু ॥ হ্যাঁ গো বাবু, রেলগাড়ী উল্টাই পড়লে, কিলিয়ার হবেক না ত কি হবেক?

হরি ॥ রেলগাড়ী উল্টেছে?

দীনু ॥ তবে আর বলছি কিটা?

ষষ্ঠী ॥ আহা- হা, একটা ইন্দ্রপাত হয়ে গেল বাবা হরি!

হরি ॥ শুধু ইন্দ্র? একেবারে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ সবগুলো পাত হয়ে গেল খুড়ো!

ধন। চুক, চুক! পরমেশ্বরী বিদ্যালয়ের বাড়ীটা আর তৈরি হল না তা হলে!

ষষ্ঠী ॥ সত্যি আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে বাবা। এ হে-হে!

হরিপদ ॥ করছে আমারও খুড়ো। উমাশশী হাঁসপাতালটাও…ও হো-হো!

দীনু ॥ কান্নাকাটি করো নি বাবু। ঘেন্টুদাদা পাগল হৈ গিইছে। এখনি ঠ্যাঙা লিয়ে তেড়ে আসবেক। ঐ দেখো! [প্রস্থান।]

ধন ॥ তাই ত, তাই ত! সত্যিই ত ঠ্যাঙার মতো কি-একটা হাতে নিয়ে লাফাচ্ছে যেন ঘেন্টাটা!

ষষ্ঠী ॥ তাহলে চলো বাবাজী, মানে মানে সরে পড়া যাক আগে থেকেই!

হরি ॥ সে আর বলতে খুড়ো!

[সকলের প্রস্থান। একটু পরে ঘেন্টু ও পেন্টুর প্রবেশ]

ঘেন্টু ॥ কোন লোককে পাত্তা দিবিনে! কাঁঠাল ভাঙলে যে রকম করে মাছি এসে জোটে, এখন ঠিক তেমনি করে লোক আসবে!

পেন্টু ॥ কিন্তু তাড়াব কি করে?

ঘেন্টু ॥ সে ব্যবস্থা আমি করবো। এত দিন ধরে রঙ্গভারতী চালালাম কি অমনি-অমনি?

পেন্টু ॥ তুই একা চালালি?

ঘেন্টু ॥ তা কেন? তোরাও আছিস, কিন্তু মেন এক্টর ত আমি!

পেন্টু ॥ আচ্ছা, দেখি তোর এক্টিং-এর দৌড়টা!

(উভয়ের প্রস্থান! কাশতে কাশতে মোক্ষদা ডাক্তারের প্রবেশ।)

মোক্ষদা ॥ কৈ হে দীনু, খো খো, একবার, খো খো, খবরটা দাও ভেতরে…

(দীনুর প্রবেশ)

দীনু ॥ আর খবর দিতে হবেকনি গো বাবু।

মোক্ষদা ॥ আহা, কর্তার ব্লাড-প্রেসারটা…খো খো!

দীনু ॥ আর বেলাড পেসার লেই গো মশয়। কর্তাবাবু আমাদের এখন সগ্‌গে বসে বাবা মহাদেবের সঙ্গে সিদ্ধির হালুয়া খাচ্ছে বটে!

মোক্ষদা ॥ খো খো, ভারি ফাজিল হয়েছিস ত!

দীনু ॥ ফাজিল লয় গো বাবু, কাগজ দেখোনি আপনি? কর্তাবাবু যে কাল ফৌত হইছেন!

মোক্ষদা ॥ অ্যাঁ? দিনরাত্রি খো খো, এত চিকিৎসা করেও…

দীনু ॥ রেলগাড়ী উল্টাই মরলে চিকিচ্ছায় কি করবেক গো বাবু? রেলগাড়ী কি তোমার ওষুধ খায়?

মোক্ষদা ॥ খো খো, তাহলে ঘেন্টা পেন্টার সঙ্গে…

দীনু ॥ দেখা-শোনায় আর কাজ নেই গো বাবু। টাকা পয়সা কিচ্ছু দিবেক নি। ওরা তেমন ছেলেই লয়!

মোক্ষদা ॥ খো খো, বটে? তাহলে তোমাদের গিন্নি মাকে…

দীনু ॥ সে কি গো বাবু? গিন্নি মা বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবেক?

মোক্ষদা ॥ বাইরের লোক নয়, বলো গে, ডাক্তারবাবু…খো খো।

দীনু ॥ আহা, ডাক্তার ত আর উঠনের সজনে গাছে জন্মায় না গো বাবু!

মোক্ষদা ॥ রায়বাহাদুরের কাছে আমার যে কিছু টাকা পাওনা ছিল।

দীনু ॥ সে আপনি লিজেই মেগে লিওগো বাবু সগ্‌গে গিয়ে।

মোক্ষদা ॥ ভারী চ্যাংড়া ত! গেল একটা পার্টি হাতছাড়া হয়ে। খো খো।

[প্রস্থান।]

[মুন্সীজী ও পাঠকজীর প্রবেশ।]

মুন্সী ॥ কর্তাবাবুর ত এন্তেকাল হৈল। এখন আমাগো কি হইবে?

পাঠক ॥ যো হোগা ঐ হোগা। লেকেন জলদি ইঁহাসে চলিয়ে ভাইয়া।

দীনু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ পালাও, লইলে ঢোল ফাঁসবেক মশায়।

[তিন জনের প্রস্থান। কুসুমের প্রবেশ।]

কুসুম ॥ রঙ্গ দেখে আর বাঁচিনে! কান্নায় ত চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। এদিকে ভাঁড়ারের চাবিটি ঠিক আঁচলে বাঁধা রয়েছে। দুটো যে চাল-ডাল সরাবো, সে উপায়ও নেই।

[বাইরে কোলাহল। ঘেণ্টা ও পেণ্টার প্রবেশ।]

পেণ্টু ॥ সদর দুয়োরটা শীগ্‌গীর বন্ধ করে দে কুসুম। নইলে কিন্তু দুঃখ জানাতে এসে ব্যাটারা সর্বস্বি লুঠে নিয়ে যাবে।

কুসুম ॥ ঠাকমা যে বললে, পাশের ঘর খুলে দিয়ে সক্কলকে বসাতে!

পেণ্টু ॥ মাসীমার যেমন কাণ্ড! কিরে ঘেণ্টা, দেখা এবার তোর এক্টিংএর কেরামতি।

ঘেণ্টু ॥ কিচ্ছু ভাবিস নে তুই। দেখলি ত মুন্সীদের তাড়ালাম কি করে! ঠিক এই রকম মাথায় গামছা বেঁধে ডাণ্ডা হাতে লাফিয়ে পড়বো ভীড়ের মধ্যে। তারপরই…তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ আর গভীর সাগর! দেখি কেমন না পালায় ব্যাটারা!

পেণ্টু ॥ তা ভালোই প্ল্যান করেছিস। তুই এই রকম পাগলামি করবি, আর আমি তোকে সামলাবার চেষ্টা করবো। কি বল?

ঘেণ্টু ॥ দূর, তাহলে কাজ হবে না। তুই আমার ভাব-গতিক দেখে ডুকরে কেঁদে উঠবি। একদম মড়া-কান্না!

পেণ্টু ॥ আচ্ছা, তাই হবে।

[ঘেণ্টু ও পেণ্টুর প্রস্থান।]

কুসুম ॥ পাগল আর সাজবে কি? বরাবরই ত গাছ-পাগল! আনছি গো ঠাকমা!

[প্রস্থান।]

[মাতঙ্গিনী, আচার্যি, ঘেণ্টু, পেণ্টু, কুসুম ও দীনুর প্রবেশ।]

মাতঙ্গিনী ॥ আমি তখনি পই পই করে বারণ করেছিলাম, দিন-ক্ষণ না দেখে বেরিও না।!

আচার্যি ॥ আহা, মানে ভাবীচেদ্ ন তদন্যথা। অর্থাৎ কিনা, এখন আর অন্য কিছু ভাবাভাবিতে লাভ নেই। এখন মানে, মৃতের কল্যাণে প্রায়শ্চিত্তটা তাড়াতাড়ি...

ঘেণ্টু ॥ একে মামার শীত সহ্য হয় না, তার ওপর এই শীতের মধ্যেই...

আচার্যি ॥ আহা-হা, মানে শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখদা। অর্থাৎ জীবনান্তের পর আর শীতই বা কি, আর গ্রীষ্মই বা কিরে দাদা?

পেণ্টু ॥ কতবার বলেছি মেসোমশাই, সম্পত্তি-ফম্পত্তিতে কাজ নেই। কলকাতায় জাঁকিয়ে একটা থিয়েটার করো!

মাতঙ্গিনী ॥ ওরে তোরা চুপ কর। শোকে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তার ওপর সকাল থেকে পেটে চা-টুকুও পড়েনি!

ঘেণ্টু ॥ একটু চটপট করো না ঠাকুর মশাই!

পেণ্টু ॥ মাসীমার কষ্ট যে আর দেখতে পারছিনে!

আচার্যি ॥ মানে মানে, এই হল আর কি। তা বাবা দীনু, তাহলে শীগ্রী নিয়ে এসো, গামছা বারোখানি, ধুতি-শাড়ী ছ-খানি, আতপ চাল আধ মণ, তিল, যব, চিনি...

দীনু ॥ দাঁও পেয়েছে, লুঠে লিবেক দু-হাতে। তা আমিও ভাগের ভাগ ছাড়বনি বাবা!

কুসুম ॥ ও ঠাকমা গো, সর্বনাশ হয়েছে গো! ঐ দেখো কত্তা বাবা!

[হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রায় বাহাদুরের আবির্ভাব।]

আচার্যি ॥ অ্যাঁ? মানে মানে, রায় বাহাদুরের পুষ্করাপ্রাপ্তি হয়েছে। পালাও, পালাও, সব্বাই পালাও! রামো রামো, ওঁ হরি, ওঁ হরি!

[পলায়ন।]

দীনু ॥ মরেছে, রে খেয়ে ফেলবেক রে ! [পলায়ন ।]

ঘেন্টু ও পেন্টু ॥ অঁ-অঁ, ওঁরে বাঁবারে, কি হঁল রে ! [পলায়ন ।]

কুসুম ॥ দেখছো কি ঠাকমা ? পালিয়ে এসো । এক্ষুণি ঘাড় মটকে রক্ত শুষে নেবে । ও কি আর কত্তা বাবা ? ও দানা, বেম্মদত্যি ! সব্বাইকে খেতে এসেছে !

মাতঙ্গিনী ॥ দাঁড়া, দেখি আর একটু ।

কুসুম ॥ আমার দাঁড়ানোর দরকার নেই বাবা ! আমি সরে পড়ি । [পলায়ন ।]

রায় ॥ ওরা এমন করে পালালো কেন গিন্নি ? অ্যাঁ ? সবাই মিলে তোমরা কি করছিলে এখানে ? যেন কি একটা যজ্ঞি-টজ্ঞির ফর্দ হচ্ছিল ! কি, কথা কইছো না যে !

মাতঙ্গিনী ॥ কেমন করে জানব বাপু ? কাগজে লিখেছে, রেলগাড়ী উল্টে তোমার মিত্যু হয়েছে । তাইতেই একটা প্রায়চিত্তির···নইলে ত আবার ছাদ্দ হবে না !

রায় ॥ আরে না, না, অল্প একটু লেগেছিল মাথায়, আর হাতে-পায়ে । একটা রাত্তির হাঁসপাতালে থেকেই ভালো হয়ে গেছে ।

মাতঙ্গিনী ॥ ওরা কি ভেবেছে জানো ? ভেবেছে তোমাকে দানোয় পেয়েছে । তাইতেই ভয়ে পালিয়ে গেল ।

রায় ॥ তা তুমি পালালে না যে !

মাতঙ্গিনী ॥ আমি ত আর ওদের মতো বোকা নই !

রায় ॥ কি রকম !

মাতঙ্গিনী ॥ আমি যে আগেই তোমার হাতে সিগরেট দেখেছি । ভূতে কি আগুন ছুঁতে পারে নাকি ?

রায় ॥ সত্যি, তোমার কি মাথা ! ভাগ্যিস ধরতে পেরেছিলে !

সাপ্তাহিক সমাচার

পরিমল গোস্বামী

[সাপ্তাহিক পত্রিকার অফিস। সম্পাদক ইন্দুবাবু নিজের সুসজ্জিত কক্ষে ব'সে আছেন। টেবিলে কাগজপত্র ছড়ানো। কতকগুলি খাম থেকে চিঠি বা'র করতে করতে…]

ইন্দু॥ তিন মাস হ'ল সাপ্তাহিক কাগজ চালাচ্ছি, কিন্তু গ্রাহক কোথায়? দুশো ক'রে ছাপা হ'চ্ছে অথচ নগদ বিক্রি দশখানার বেশি নয়। কি করলে গ্রাহক বাড়ে তাও তো ঠিক বুঝতে পারছি না। …ক্রস্‌-ওয়ার্ড আরম্ভ করব? কিন্তু সেও তো পুরনো হয়ে গেছে। একমাত্র ভরসা প্রশ্নোত্তর বিভাগটার উপর। কিন্তু তাতেও খুব সুবিধে হচ্ছে না। চিঠির পর চিঠি আসছে, কাগজে এত চিঠি ছাপার জায়গা কোথায়? কিন্তু যাক, আর ভাবব না এখন—তবু তো এই চিঠির জন্যে একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে!… কিন্তু আর সময় নেই। এখনও তিনখানা চিঠির উত্তর লিখতে হবে—কম্পোজিটর ব'সে আছে। চিঠি তিনখানা এখনি প'ড়ে যা হয় একটা কিছু লিখে দিই। [একখানা খাম হাতে নিয়ে]…এই চিঠিখানা নিশ্চয় কোনো মেয়ের লেখা। [ছিঁড়ে]…হুঁ, যা ভেবেছি তাই। কি লিখেছে?

"…সম্পাদক মহাশয়, আমার রাত্রে ঘুম হয় না, অথচ দিনের বেলা ঘুমে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে থাকি। এর কোনো প্রতিকার আপনার জানা আছে?……
শ্রীমতী প্রমদা দেবী।"

…কি সাংঘাতিক প্রশ্ন। নাঃ কোনো ডাক্তারকে এই বিভাগে নিযুক্ত করতে হবে—সবাই ওষুধের কথা জানতে চায়। কিন্তু আপাতত কি উত্তর দেওয়া যায়? …হুঁ ঠিক হয়েছে।

[প্যাডে লিখতে আরম্ভ করল]

"আপনার রাত্রে ঘুম হয় না, দিনে বেশি ঘুম হয় লিখিয়াছেন; কিন্তু সামান্য এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলা শক্ত। পত্র পড়িয়া মনে হয় খুব অল্পদিন আপনার বিবাহ হইয়াছে। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে এ ব্যাধি সারানো দেবতার অসাধ্য।

কিছুকাল পিত্রালয়ে থাকিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন, হয় তো তাহা হইলে দিনে জাগিতে এবং রাত্রে ঘুমাইতে পারিবেন। আর যদি বিবাহ না হইয়া থাকে তাহা হইলে অবিলম্বে বিবাহ করুন।"

...আচ্ছা এইবার আর একখানা চিঠি পড়া যাক।

"সম্পাদক মহাশয়, অল্পদিন হইল আমার টাক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। চুল এত তাড়াতাড়ি ঝরিয়া যাইতেছে যে বোধ হয় মাসখানেকের মধ্যেই মাথার চাঁদিতে মুখ দেখা যাইবে। আপনারা তো অনেক কিছু জানেন, টাকের প্রতিকার কিছু জানা আছে? শ্রীগৌরহরি চক্রবর্তী"

—এ তো আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি। টাকের ওষুধও আমাকে বলতে হবে? নাঃ, প্রশ্নোত্তর বিভাগটা একটা হাসপাতালে পরিণত হ'ল দেখছি। কিন্তু কি উত্তর লেখা যায়? একটা কিছু লিখতেই হবে। আসলে যা লেখা উচিত সে হচ্ছে, মশাই আপনার টাক সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। আপনার মাথার চুল না থাকা দূরের কথা, আপনার ঘাড়ের উপর মাথাটিও না থাকলে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করবার উপায় নেই। লিখে দিই, "মশাই টাক সারে না। কারণ আমার বিশ্বাস ভগবানও স্বয়ং টাকগ্রস্ত।" বাস্, এর বেশি আর লেখা যায় না। [অপর একখানি খাম হাতে নিয়ে] এ চিঠিখানা তো দেখছি মেয়েলি হাতের লেখা।

"সম্পাদক মহাশয়, আমি একটি সমস্যায় পড়িয়া আপনার দ্বারস্থ হইতেছি। এটি আমার জীবন মরণ সমস্যা। আমার মা আমাকে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু যাঁহার সঙ্গে বিবাহ দিতে চান তাঁহাকে আমি বিবাহ করিতে চাই না। অথচ এই কথাটি আমি মায়ের নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। মায়ের মনে তাহাতে আঘাত লাগিবে। কিন্তু বিবাহ করিলে আমার জীবন দুঃখের হইবে। এই পাত্রকে আমি চিনি, তিনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন। এ অবস্থায় যথাকর্তব্য উপদেশ দিয়া আমাকে বাধিত করিবেন। ইতি শ্রীমতী পরিতৃপ্তি দেবী।"
"পুনশ্চ—আমার নামটি দয়া করিয়া ছাপাইবেন না।"

...তা তো ছাপব না, কিন্তু আপনার সমস্যাটি যে আমার সকল সমস্যা ছাপিয়ে উঠছে।

[কড়া নাড়ার শব্দ]

—কে?

বঙ্কিম ॥ ভিতরে আসতে পারি?

[দরজা খুলে বঙ্কিম ভিতরে এসে দাঁড়াল]

ইন্দু ॥ কি চাই আপনার ?

[টেবিলের কাছে এগিয়ে চেয়ারে বসল]

বঙ্কিম ॥ আমি আপনার কাগজের গ্রাহক হ'তে চাই।

ইন্দু ॥ ভাল কথা। তা হ'লে তিন টাকা জমা দিন—আর ঐ সঙ্গে আপনার নাম ঠিকানা বলুন। আমাদের কাগজ আপনার ভাল লেগেছে নিশ্চয় ?

বঙ্কিম ॥ কাগজ আমি এখনো পড়িনি। তবে মনে হচ্ছে পড়ব।

ইন্দু ॥ তা হ'লে লোকের মুখে প্রশংসা শুনেছেন বোধ হয় ?

বঙ্কিম ॥ অনেকটা তাই। শুনেছি আপনার কাগজে একটা প্রশ্নোত্তর বিভাগ আছে—সেইটে সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে।

ইন্দু ॥ পাঠকের কৌতূহল বাড়াবার জন্যেই ঐ বিভাগটা খোলা হয়েছে। যদি সফল হই কৃতার্থ বোধ করব।

বঙ্কিম ॥ মশাই, আমার নিজের কতগুলো প্রশ্ন আছে। সেইগুলো আপনার কাগজে আলোচনা করাতে চাই। তার মানে কি জানেন ? একটা সমস্যায় পড়েছি, নিজের বুদ্ধিতে সমাধান হচ্ছে না।...কিন্তু আপনিই তো সব প্রশ্নের উত্তর লিখে থাকেন ?

ইন্দু ॥ আপাতত আমি লিখছি। কিন্তু মনে করেছি, ডাক্তার, উকিল, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে ডেকে একটা বোর্ড করব, তাঁরাই এ বিভাগের ভার নেবেন।

বঙ্কিম ॥ তা বেশ ভালই হবে। আমার সমস্যাটি কিন্তু—

ইন্দু ॥ মাথার টাক সম্বন্ধে নয় নিশ্চয়ই ?

বঙ্কিম ॥ আজ্ঞে না। সমস্যাটা মাথার বাইরের নয়—ভিতরের।

ইন্দু ॥ বলেন কি ! ডাক্তারি পরামর্শ চাই নাকি ? কিন্তু ডাক্তার তো মাথার ভিতরে বাইরে দু'দিকেই দরকার !

বঙ্কিম ॥ না, ধন্যবাদ। ডাক্তার কিংবা উকিলের পরামর্শ চাই না। আপনি নিজেই হয়তো কিছু সুবুদ্ধি দিতে পারবেন। এই দেখুন আমার প্রশ্ন—কাগজে দেবার জন্যে লিখেই এনেছি। আচ্ছা পড়েই শোনাচ্ছি :

"সম্পাদক মহাশয়, আমি একটি মেয়েকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। মেয়ের মাতাও তাঁর কন্যাকে আমার হাতে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু মেয়েটির মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিতেছি না। যদি ইচ্ছুক না হয় এবং যদি এ অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে ক্রমে সে আমাকে পছন্দ করিবে এমন সম্ভাবনা আছে কি না ? প্রশ্নে উত্তর দিবার সুবিধা হইবে বিবেচনায় আরও জানাইতেছি যে উক্ত মেয়েটি অন্য কাহারও প্রতি আকৃষ্ট নয়। বড় ভাল মেয়ে। ইতি—শ্রীবঙ্কিমবিহারী সরকার।"

ইন্দু ॥ চমৎকার চিঠি। এ রকম প্রশ্ন আর তার উত্তর ছাপলে আর পাঁচ-জনেরও উপকার হবে। তা হ'লে আপনার চাঁদাটা—

বঙ্কিম ॥ এই নিন।

ইন্দু ॥ ধন্যবাদ [টাকা বাজাল]…আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হ'লে মেয়েটির নাম জানতে পারি কি?

বঙ্কিম ॥ মেয়েটির নাম? কেন, নাম জেনে কি হবে?

ইন্দু ॥ ওতে সমস্যা সমাধানের সুবিধা হতে পারে। ধরুন, সেও যদি এই প্রশ্নোত্তর বিভাগে কোনো চিঠি পাঠিয়ে থাকে, তা হ'লে তার মনের কথাটি যে আপনারই সম্বন্ধে সেটা বুঝতে পারব, আর তা হ'লে দুজনেরই সমস্যা সমাধান করা সহজ হবে।

বঙ্কিম ॥ বুঝতে পেরেছি! আপনি ঠিকই বলেছেন। তা হ'লে বলি—তার নাম হচ্ছে পরিতৃপ্তি দেবী।…কিন্তু সে কি আগেই কোনো চিঠি লিখেছে এখানে?

ইন্দু ॥ দেখুন, প্রত্যেক ব্যবসাতেই একটা গোপনীয়তা আছে—যাকে সাহেব পাড়ায় বলে 'বিজ্‌নেস্ সিক্রেট'। সেইটেই হচ্ছে ব্যবসার প্রাণ। কাজেই সব কথা আপনাকে বলি কি ক'রে।

বঙ্কিম ॥ সে তো ঠিকই। কিন্তু আমি আমার মনের কথা সবই আপনাকে খুলে বলেছি, এখন একটা ব্যবসায়িক প্যাঁচে ফেলে আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না।

ইন্দু ॥ চিঠি একখানা পেয়েছি বটে।

বঙ্কিম ॥ অ্যাঁ। পেয়েছেন? কি লিখেছে? কোনো আশা নেই বুঝি?

ইন্দু ॥ আশা নেই তা বলা যায় না, আশার উপরে সমস্ত জগৎ সংসারটাই দাঁড়িয়ে আছে।

বঙ্কিম ॥ বলছেন বটে, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি যে আরও নিরাশ হচ্ছি!

[কড়া নাড়ার শব্দ]

পরিতৃপ্তি ॥ আসতে পারি কি? ও মা গো—!

[একটি নারীমূর্তি উঁকি মেরে অদৃশ্য হ'ল]

ইন্দু ॥ ও কি পালিয়ে গেলেন কেন? কি সর্বনাশ! এক মহিলা এসে হঠাৎ পালিয়ে গেলেন! আপনি একটু বসুন, আমি দেখে আসি ব্যাপারটা।

……[একটু পরে ফিরে এসে]……মশাই, আপনার সামনে মহিলা আসতে পারছেন না। যদি কিছু মনে না করেন—

বঙ্কিম ॥ না না, মনে করবার কি আছে? আমি এখনি উঠছি! মেয়েরা কি যে বিপদ ঘটায় পদে পদে! অসূর্যম্পশ্যারা পথে বেরিয়ে আরও হয়েছে বিপদ। পথেও চলবে অথচ আবরণটাও থাকা চাই!—কিন্তু যাক, আমি এখনি আবার ঘুরে আসছি।

ইন্দু ॥ কেন আসবেন না? নিশ্চয় আসবেন। আমি সর্বদা এখানে আছি। —এই যে, এই দরজা দিয়ে যান। [বঙ্কিম অদৃশ্য হ'ল]

[অপর দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে]

—এইবার আপনি ভিতরে আসতে পারেন।

[পরিতৃপ্তি দেবীর প্রবেশ]

পরিতৃপ্তি ॥ নমস্কার। আপনিই কি সম্পাদক?

ইন্দু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ঘোমটা খুলতে পারেন, এখানে আর কেউ নেই।

পরিতৃপ্তি ॥ ধন্যবাদ। দেখুন, আমার নাম পরিতৃপ্তি দেবী। কাল সন্ধ্যায় একখানা চিঠি পাঠিয়েছি আপনার নামে। একটা সমস্যায় পড়েছিলাম, কিন্তু আমি সেই চিঠিখানা ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

ইন্দু ॥ কেন, সমস্যা সমাধান হ'য়ে গেছে বুঝি?

পরিতৃপ্তি ॥ না।

ইন্দু ॥ তবে তো চিঠি ফিরিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না। আমাকে সমাধানের সুযোগ দিয়ে সমস্যাটাই ফিরিয়ে নেওয়া কি উচিত? তা ছাড়া ধরুন, আপনার চিঠিখানা ছাপা হ'লে কত লোকের উপকার হবে। এ রকম সমস্যা তো সবারই হতে পারে।

পরিতৃপ্তি ॥ কিন্তু আমার বড় লজ্জা করছে। মনে হচ্ছে যেন নিজের হাঁড়ি নিজে ভাঙছি হাটের মাঝখানে।

ইন্দু ॥ আধুনিক যুগে তা ছাড়া উপায় কি? এতকাল মেয়েরা নিজের হাঁড়ি নিজে ভেঙেছে…অবশ্য…রান্নাঘরে। কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে তাতে হাঁড়ি এখন হাটের মাঝখানেই ভাঙতে হবে।

পরিতৃপ্তি ॥ কি বিশ্রী বলুন তো! তা ছাড়া ঐ যে যিনি এখানে বসে ছিলেন। উনি কি শুনেছেন যে আমি চিঠি পাঠিয়েছি?

ইন্দু॥ অসম্ভব। ছাপার আগে এখানে কেউ কিছু জানতে পারে না। যিনি এসেছিলেন তিনিও এক সমস্যায় প'ড়ে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন।

পরিতৃপ্তি॥ তাই নাকি? তাঁর সমস্যাটা কি?

ইন্দু॥ প্রায় আপনারই মতো। তিনি জানতে চান, তিনি এমন একজনকে বিয়ে করতে পারেন কি না যিনি তাঁকে বিয়ে করতে রাজি নন। এবং এ অবস্থায় বিয়ে করলে স্ত্রী তাঁকে আস্তে আস্তে ভালবাসতে শিখবে কি না।

পরিতৃপ্তি॥ পুরুষের দেখছি দাম্ভিকতার সীমা নেই। কিন্তু যাক, ভাবী-স্ত্রী সম্বন্ধে আর কিছু তিনি বলেছেন?

ইন্দু॥ সে সব কথা বললে, আমি এক্ষুনি যা বললাম সেটা মিথ্যা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ এখানে কোনো কথা প্রকাশ হবার উপায় নেই, এই কথাটি ব'লে এখনি কি সব প্রকাশ করা উচিত?

পরিতৃপ্তি॥ ঐ ভদ্রলোকই আমাকে বিয়ে করতে চান। সেই জন্য একটু কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু ওঁর কথা আর জানতে চাই না—জেনে আমার কিছু লাভও হবে না। এখন বলুন, আমার চিঠিখানা ফেরৎ নেব কি না? আর যদি মনে করেন ওটা ছাপলে পৃথিবীর উপকার হবে, তা হ'লে থাক। কিন্তু আমার মনে হয় আপনার সম্পাদকীয় মতটা কাগজের জন্যে থাক— আমি ব্যক্তিগত ভাবে আপনার সঙ্গে এ নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

ইন্দু॥ আমার মতে ওকে বিয়ে না করাই উচিত। এ বিষয়ে আপনার যে ধারণা হয়েছে আপনি সুখী হবেন না, সেইটেই ঠিক।

পরিতৃপ্তি॥ কিন্তু মা সুখী হবেন, উনি সুখী হবেন।

ইন্দু॥ তৃতীয় ব্যক্তির কথা ছাড়ুন। আপনাদের দু'জনের সম্পর্কে দু'জন সমান সুখী না হ'লে বিবাহ ব্যর্থ হয়।

পরিতৃপ্তি॥ আত্মত্যাগ ব'লে একটা জিনিষ আছে তো?

ইন্দু॥ তার আর এক অর্থ হচ্ছে আত্মহত্যা। ওটাকে শাস্ত্রে পাপ ব'লে উল্লেখ করেছে।

[কড়া নাড়ার শব্দ]

বঙ্কিম॥ সম্পাদক মশাই, ভিতরে আসতে পারি?

ইন্দু॥ [বিচলিতভাবে] সর্বনাশ, বঙ্কিমবাবু আবার এসেছেন।

পরিতৃপ্তি॥ তা হ'লে আমি উঠি—আমি থাকতে ওঁকে ডাকবেন না।

বঙ্কিম॥ আসতে পারি কি?

ইন্দু ॥ একটু দাঁড়ান।···দেখুন পরিতৃপ্তি দেবী, আপনি বাড়ির ভিতরে গিয়ে বসবেন ?

পরিতৃপ্তি ॥ আপত্তি নেই। ভিতরে মেয়েরা আছেন তো ?

ইন্দু ॥ কোনো চিন্তা নেই, ভিতরটা একেবারে ফাঁকা।

পরিতৃপ্তি ॥ মেয়েরা কেউ নেই, তা হ'লে যাওয়া কি ঠিক হবে ?

ইন্দু ॥ ঠিক সেই কারণেই যাওয়া ঠিক হবে।···আপনি যান···আমি এই দরজাটা একেবারে বন্ধ ক'রে দিচ্ছি।

পরিতৃপ্তি ॥ অগত্যা তাই করি।···

[পিছনের একটা দরজা দিয়ে পরিতৃপ্তি দেবীর প্রস্থান]

ইন্দু ॥ বঙ্কিমবাবু···এবার আসতে পারেন।

[বঙ্কিমবাবু প্রবেশ করলেন]

বঙ্কিম ॥ ধন্যবাদ। আমার কথাটা আবার আলোচনা করতে এলাম, তখন শেষ হয়নি। আশাকরি কথাটা পুনরায় আরম্ভ করলে আপনার অসুবিধে হবে না।

ইন্দু ॥ কিছুমাত্র না। তবে কি জানেন······আমরা অসহায় মানুষ, সব কিছু আরম্ভ করতেই পারি···শেষ করতে পারি না।

বঙ্কিম ॥ তা জানি, কিন্তু তবু আরম্ভ করব।

ইন্দু ॥ করুন।

বঙ্কিম ॥ হ্যাঁ, তখন বলছিলেন আশা ছাড়া উচিত নয়। তাই না ?

ইন্দু ॥ আমি নিজে বানিয়ে কিছু বলিনি, এটা লোকাচার। রোগী মরছে নিশ্চিত জেনেও ডাক্তার বলে কোনো ভয় নেই।

বঙ্কিম ॥ আপনি লোকাচারের কথা ছাড়ুন। বিশ্রী সব কথা বলছেন লোকাচারের নামে।

ইন্দু ॥ তা হ'লে শাস্ত্রের কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"কর্মে তব অধিকার ফলে নহে কভু।"

বঙ্কিম ॥ গীতার কর্মের কথা বলছেন ? কিন্তু সে কর্ম আর এ কর্ম কি এক ?

ইন্দু ॥ কেন, আপনি কি ভাবছেন আপনার এটা কুকর্ম ?

বঙ্কিম ॥ না, কিন্তু ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাই। কিন্তু সে কথা যাক, এখন তো সবটাই আপনার হাতে। মশাই, আপনি যদি দয়া ক'রে লেখেন যে পরিতৃপ্তির পক্ষে বিয়ে করাই উচিত, তা হ'লে আমার পথটা পরিষ্কার হ'য়ে যায়। দয়া ক'রে করুন না এই কাজটা !

ইন্দু॥ সে দেখা যাবে। কিন্তু দেখুন, সম্পাদকের নিজস্ব একটা মতও তো থাকা উচিত। আপনার মত সম্পাদকীয় মত ব'লে চালানো কি ঠিক হবে?

বঙ্কিম॥ না তা বলছি না। আপনি আমাকে নিরাশ হ'তে নিষেধ করাতে মনে হয়েছিল আমাদের মধ্যে মতভেদ নেই। সে কথা কি মিথ্যা?

ইন্দু॥ মিথ্যা হবে কেন? আপনি কিছু ভাববেন না। দেখাই যাক না কি হয়। ঘটনাস্রোত যখন বইতে আরম্ভ করে তখন সে নদীর স্রোতের মতোই নিজের পথ নিজে কেটে চলে, কোনো সম্পাদকের মতের অপেক্ষায় ব'সে থাকে না। ···আমরা তো দর্শক মাত্র। যা ঘটবার তা ঘটবেই, আমরা কেউ তা রোধ করতে পারি না।···[ঘড়িতে চারটে বাজল]। কি আশ্চর্য! চারটে বেজে গেল! এখনি এখানে আমাদের একটা সভা বসবে যে! কথায় কথায় ভুলেই গিয়েছি—যদি কিছু মনে না করেন—

বঙ্কিম॥ না না, মনে করবার কি আছে! আমি উঠছি—সভা শেষেই না হয় আবার আসব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বোধ করি শেষ হ'য়ে যাবে?

ইন্দু॥ হ্যাঁ তা হয়ে যাবে।

বঙ্কিম॥ সভায় লোকজন তো কেউ আসেননি এখনো!

ইন্দু॥ এসেছেন বৈ কি! অভ্যাগতরা ভিতরে আছেন। এটা আমাদের প্রাইভেট সভা কিনা!

বঙ্কিম॥ আচ্ছা, তা হ'লে আপাতত আসি!

[প্রস্থান]

ইন্দু॥ আসুন।

পরিতৃপ্তি॥ [দরজা খুলে] বঙ্কিমবাবু চলে গেলেন বুঝি?

ইন্দু॥ হ্যাঁ, আপদ বিদেয় হয়েছে, আপনি আসতে পারেন এখন।

পরিতৃপ্তি॥ ওঃ! একা একা এতক্ষণ কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম! ঘরটি যেন কাগজের পাহাড়! ছাদসমান উঁচু কাগজের গাদা!

ইন্দু॥ ও কিছু না, সপ্তাহে যত কবিতা আসে ঐখানে রাখি—তারপর ওজন-দরে বিক্রি করি।

পরিতৃপ্তি॥ সাত দিনে এত কবিতা আসে?

ইন্দু॥ ও তো সামান্য। কাগজ যখন নতুন বা'র করলাম মাস তিনেক আগে, তখন ওর তিনগুণ আসত!···কিন্তু এ ব্যাগটি কার?—এ ঠিক বঙ্কিমবাবু ফেলে গেছেন। ভদ্রলোক তো ভয়ানক অন্যমনস্ক দেখছি!

পরিতৃপ্তি ॥ অন্যলোকের ব্যাগ নিয়ে আলোচনা করবার সময় নেই এখন। আমার কথাই বলি। আমার প্রশ্নের উত্তর আপনার কাগজে যা দেবার তা তো দেবেন, কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত মতটাই আমার কাজে লাগবে বেশি।

ইন্দু ॥ আমার ব্যক্তিগত মত তো আপনাকে আগেই বলেছি। আপনি বিয়ে না করলে বঙ্কিমবাবু আর আপনার মা—এ দু'জনের আশাভঙ্গ হবে। কিন্তু আকস্মিক আশাভঙ্গ থেকে যে দুঃখ সেটা সাময়িক। ওটা দু'দিনেই চলে যায়। কিন্তু হৃদয় মন এবং প্রাণের সঙ্গে যার স্থায়ী সম্বন্ধ হবে তাকে ভাল না বেসে জীবনসঙ্গী করায় যে দুঃখ সেটা স্থায়ী দুঃখ।

পরিতৃপ্তি ॥ আপনার কথাগুলো এমন চমৎকার!

ইন্দু ॥ আপনার কথাগুলোও ভারি সুন্দর।

পরিতৃপ্তি ॥ তাই না কি? [হাসতে লাগল]

ইন্দু ॥ সত্যিই তাই। [হাসতে লাগল]

[দুইজনে অকারণ কিছুক্ষণ হাসল]

পরিতৃপ্তি ॥ জীবনের প্রথম চলার মুখে হৃদয়কে এমন ক'রে পিষে দিলে জীবনটা ব্যর্থই হ'য়ে যাবে···আপনি ঠিকই বলেছেন।

ইন্দু ॥ হৃদয়টা হচ্ছে কুঁড়ির মতো।

পরিতৃপ্তি ॥ ধীরে ধীরে তার জাগরণ।

ইন্দু ॥ সে জন্যে চাই বাইরের আলো-বাতাস।

পরিতৃপ্তি ॥ আর চাই মাটির রস। কিন্তু ইন্দুবাবু, আপনি কি সুন্দর বলতে পারেন!

ইন্দু ॥ পরিতৃপ্তি দেবী, আপনার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

[দু'জনে কিছুক্ষণ উচ্চহাস্য করল]

পরিতৃপ্তি ॥ তারপর সেই কুঁড়ি চোখ মেলে বাইরের পৃথিবীর দিকে—

ইন্দু ॥ চায়, স্নেহ ভালবাসা, চায় সহানুভূতি—

পরিতৃপ্তি ॥ চায় এমন একজনকে, যে তাকে সম্পূর্ণ ক'রে বুঝবে। হবে তার সুখে সুখী, তার দুঃখে দুঃখী।

ইন্দু ॥ তার যদি কোনো দোষত্রুটি থাকে তবে সেইটেকেই সে বড় ক'রে দেখবে না। সেটাকে সে দেখবে ক্ষমার চোখে। পরিতৃপ্তি দেবী, এইসঙ্গে আমি নিজের মনটাও বিশ্লেষণ করছি।

পরিতৃপ্তি ॥ বিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতা আপনার!

ইন্দু ॥ আপনার আরও বেশি।...[দু'জনের উচ্চহাস্য] দেখুন, আমার যে স্ত্রী হবে তাকে আমি শ্রদ্ধা করব, সম্মান করব—

পরিতৃপ্তি ॥ আমার স্বামী হবে তাকে আমি সর্বস্ব সমর্পণ করব।

ইন্দু ॥ কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা পেয়েও কেউ কাউকে সম্পূর্ণ ক'রে পাই না। আমাদের পাওয়ার উর্ধ্বেও আমাদের ব্যক্তিত্ব জেগে থাকে, সেইখানে আমরা যেন কেউ কাউকে অধিকার করার চেষ্টা না করি।

পরিতৃপ্তি ॥ ইন্দুবাবু, অদ্ভুত বলেছেন আপনি। আমার সঙ্গে আপনার মত একেবারে মিলে যাচ্ছে। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেখানেই দেখেছি মনান্তর—তারই মূলে আছে সম্পূর্ণ অধিকারের চেষ্টা। মনের একটা দিক যদি স্বাধীন না থাকে তা হ'লে মনের ধর্মই হয় নষ্ট।

ইন্দু ॥ কি সুন্দর বলছেন আপনি! ঐটেই তো চিরকালের সত্য। আমি আমার স্ত্রীকে বলতে চাই তোমাকে আমি পেয়েছি, পেয়ে ধন্য হয়েছি।

পরিতৃপ্তি ॥ আমিও স্বামীকে তাই বলতে চাই। আমার মন দিয়ে তোমার সব কিছুর বিচার আমি করব না। আমার ভালবাসা দিয়ে তোমার যেটুকু পাই, তার বেশি আমি দাবী করব না।

[কড়া নাড়ার শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমের পুনঃ প্রবেশ]

বঙ্কিম ॥ ক্ষমা করবেন, আমার ব্যাগটা ফেলে গিয়েছিলাম, সেইটে নিতে এসেছি। এ কি! পরিতৃপ্তি, তুমি এখানে!

পরিতৃপ্তি। [সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে ইন্দুবাবুর প্রতি] কারণ আমি জানি, দাবী যার উগ্র, সেই জীবনে কিছু পায় না। অধিকার করে, কিন্তু অধিকারী হয় না।

ইন্দু ॥ [বঙ্কিমকে অগ্রাহ্য ক'রে পরিতৃপ্তির প্রতি] আমিও তাই বলতে চাই। তোমাকে আমি জোর ক'রে অধিকার করব না। আমাদের জীবন হবে—

বঙ্কিম ॥ আপনার জীবন কি হবে সেটা আমি পরে শুনব—আপনি এখন থামুন। আর পরিতৃপ্তি, তুমি বোধ হয় এসেছ সম্পাদকীয় মত জানতে, কিন্তু যা শুনছি তা তো সম্পাদকীয় মত নয় - ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস। এ সব কি হচ্ছে কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

ইন্দু ॥ পরিতৃপ্তি দেবী, আপনার কথায় আমি ধন্য হয়েছি—আমি ধন্য—আমি আজ মহৎ—

বঙ্কিম ॥ আপনি ছোটলোক।

পরিতৃপ্তি ॥ ইন্দুবাবু, আপনি থামবেন না, আপনি চালিয়ে যান।

ইন্দু॥ থামব কেন? আমাদের জীবন হবে অনন্ত সুন্দর, আমাদের মনে জাগবে চিরবসন্ত।

বঙ্কিম॥ মনে নয়, সমস্ত মুখেচোখে জাগুক, হাতেপায়ে জাগুক, ভণ্ড, প্রতারক!

পরিতৃপ্তি॥ আমার মনের সামনে একটা নতুন জগৎ খুলে গেল—

ইন্দু॥ আমার অনেক আগেই গিয়েছে। কি বিচিত্র জগৎ! লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি—

বঙ্কিম॥ শুনছেন, আমি যে আরও পাঁচজন গ্রাহক জুটিয়েছি আপনার জন্য—তাদের চাঁদা নিয়ে এসেছি—

ইন্দু॥ চাঁদা নয়, চাঁদ। চাঁদ উঠেছে আমার আকাশে—জ্যোৎস্নার প্লাবন ব'য়ে গেল—

পরিতৃপ্তি॥ পায়ে পায়ে জাগছে গান, ফুটছে ফুল, আকাশে বাতাসে জাগল মিলন-সঙ্গীত। মন উঠল ভ'রে—

ইন্দু॥ নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারছি না। আমি দাম্পত্য জীবনের যে কল্পজগতে প্রবেশ করেছি তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ একেবারে দেখতে পাচ্ছি না। পরিতৃপ্তি দেবী, এ আমার কি হ'ল বলুন তো!

বঙ্কিম॥ আপনার মাথা খারাপ হয়েছে···শুনছেন···আপনার—

পরিতৃপ্তি॥ [ইন্দুর প্রতি] আপনার কি হ'ল বলতে পারি না, কিন্তু আমি যে একেবারে ডুবলাম। এমন একটা মধুর জগতে ঢুকে গিয়েছি—

বঙ্কিম॥ আমাকে ছেড়ে কোথায় ঢুকলে পরিতৃপ্তি?

পরিতৃপ্তি॥ পায়ের নীচের যেন মাটি নেই···যেন চলেছি শূন্যে ভেসে···কথার পাকে পাকে আচ্ছন্ন চেতনার ঢাকা যাচ্ছে খুলে—আমি যেন সত্যকে দেখতে পাচ্ছি···চোখের সম্মুখে!

ইন্দু॥ আমিও পাচ্ছি। আমিও ভাসছি যেন তোমারই সঙ্গে—অনন্ত শূন্যে। চলেছি আমরা গ্রহ-উপগ্রহের পথে।

পরিতৃপ্তি॥ আর নক্ষত্রের পথে।

ইন্দু॥ আমাদের রাত্রি আর দিন সব এক হ'য়ে গেছে। কি হ'ল আমার?

বঙ্কিম॥ মৃত্যুদশা ঘটেছে আপনার, চলেছেন শ্মশানে।

পরিতৃপ্তি॥ পৃথিবী এখান থেকে কত ছোট দেখাচ্ছে···

ইন্দু॥ চললাম, মাটির স্পর্শ ছেড়ে চললাম···কেউ এই চলা রোধ করতে পারবে না।

পরিতৃপ্তি॥ আমিও চললাম আপনার সঙ্গে।

বঙ্কিম ॥ কিন্তু আমি যাব কোথায় ? তা হ'লে আমার কি আশা নেই ? দোহাই আপনার, এই কথাটা বলে যান, নইলে আপনার চাদর ছাড়ব না। আমার আশা আছে কি নেই—একটি কথা বলে যান।

ইন্দু ॥ আশা নেই। কারণ আশা মিথ্যা। আশা ছলনা। আশা মরীচিকা। ওর পিছনে ছুটবেন না। এই পৃথিবীতে একমাত্র সত্য দু'খানা পা। তার সদ্ব্যবহার করুন। পৃথিবী বিস্তীর্ণ—কোনো অসুবিধে হবে না—

পরিতৃপ্তি ॥ কিন্তু ইন্দুবাবু, আমি আমি আনন্দের ভার সইতে পারছি না—উঃ আমার বড় কষ্ট হচ্ছে !

ইন্দু ॥ সেকি ! চলেছি আকাশ পথে, এখন ওসব কষ্টের কথা ব'লো না।

[পরিতৃপ্তি বুকে হাত চেপে মাটিতে ব'সে পড়ল, তা দেখে ইন্দু ছুটে এসে তাকে ধ'রে তুলল।]

কি হ'ল, কি হ'ল পরিতৃপ্তি দেবী ?

পরিতৃপ্তি ॥ [কাতরভাবে] মনে হচ্ছে একটা বড় রকম আত্মত্যাগ করি, নইলে আনন্দের বোঝা আর বইতে পারছি না।

বঙ্কিম ॥ [এক লাফে পরিতৃপ্তির কাছে এসে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মত্যাগ কর পরিতৃপ্তি—ইন্দুবাবুর পাল্লায় প'ড়ে তুমি কিছুই করতে পারছ না—কিছুই করতে পারছ না।—বড় রকম আত্মত্যাগ কর এবং মত বদলাবার আগে কর।

পরিতৃপ্তি ॥ [অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে] মনে হচ্ছে মায়ের কথাই শুনি।

বঙ্কিম ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় শুনবে। [হেসে] মায়ের মতো গুরুজন আর কেউ নেই। পরিতৃপ্তি, কেউ নেই।

পরিতৃপ্তি ॥ তাই হবে।

বঙ্কিম ॥ তাই হবে? (গদগদ ভাবে) অ্যাঁ! তাই হবে ? ঠিক বলছ ?

পরিতৃপ্তি ॥ হ্যাঁ, মায়ের কথাই শুনব। বঙ্কিমবাবু, আপনিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

বঙ্কিম ॥ আমার এত আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ইন্দুবাবুকে খুন করি। পরিতৃপ্তি, অনুমতি দাও, ইন্দুবাবুকে খুন করি।

পরিতৃপ্তি ॥ না না, খুনোখুনি নয়, আমি স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলাম, ইন্দুবাবুই আমার মনের গ্লানি দূর ক'রে দিয়েছেন।

বঙ্কিম ॥ তবে চল চল, সম্পাদকের ত্রিসীমানায় আর থাকবো না⋯চল।

ইন্দু॥ তা হ'লে আকাশ-পথ বন্ধ হ'ল? এ পথে চলার তা হ'লে আর আশা নেই? পরিতৃপ্তি, আশা নেই?

বঙ্কিম॥ না। কারণ আশা মিথ্যা। আশা ছলনা। ওর পিছনে ছুটবেন না। পৃথিবীতে একমাত্র সত্য দু'খানা পা। তার সদ্ব্যবহার করুন। পৃথিবী বিস্তীর্ণ, কোনো অসুবিধে হবে না।

[বঙ্কিম ও পরিতৃপ্তির উচ্চ হাস্য]

ইন্দু॥ [নিজের মনে] আশা মিথ্যা, আশা ছলনা?

বঙ্কিম॥ হয় তো সম্পূর্ণ নয়, এই মাত্র তুমি আমার তিনটে টাকা চাঁদা-বাবদ হাত করেছ, ঐ নিয়ে ব'সে থাক, এবং আশা করতে থাক, আরও টাকা হাতে আসবে। বুঝলে?

ইন্দু॥ বুঝেছি।

[ইন্দু নির্বোধের মতো বঙ্কিম আর পরিতৃপ্তির দিকে চেয়ে রইল—বঙ্কিম এবং পরিতৃপ্তি উচ্চহাস্যে ঘর মুখরিত ক'রে চ'লে গেল।]

উজান যাত্রা
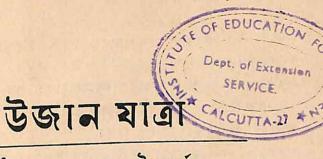
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

[অপর্ণা সেনের বাড়ীর উঠান। দাওয়া। দর্শকের দিক থেকে মঞ্চের ডান দিকে একটি বড় চালাঘর। দাওয়া। মঞ্চের পিছনে আর একটি ছোট চালাঘর ও দাওয়া। এই দাওয়াটি ছোট। মঞ্চের বামে মাটির পাঁচীল ও দরজা। কোলকাতার কাছাকাছি এক আধা সহর আধা গ্রাম। অপর্ণা নামে একটি মহিলা, বয়স বছর পঁয়ত্রিশ, দেখে বোঝা যায় এককালে সুন্দরীই ছিলেন, আজ এত ময়লা হওয়া সত্ত্বেও অংগের সমস্ত গৌরাভা এখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। দেখে মনে হয়—দেহের কোথাও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। পুকুর থেকে এক কলসী জল এনে দাওয়ায় রাখলেন। তারপর চেয়ে দেখলেন। উঠানের এক কোণে দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বসে জগৎ বন্ধু সেন, অপর্ণার স্বামী। তিনি একটা ছোট ঝাঁপ মাটিতে ফেলে বাঁধছিলেন।

বিকেল বেলা। একটা ঠাণ্ডা ছায়া উঠানে নেমেছে। বাড়ীর পিছনে একটি বড় গাছ, তাতে পাখী ডাকছে। অপর্ণা এসে ঘরে উঠবার সিঁড়িতে বসলেন। কিছুক্ষণ ক্লান্ত চোখে চেয়ে রইলেন—স্বামীর দিকে। তারপর বললেন—]

অপর্ণা ॥ ওটা হচ্ছে কি আমার মাথা ?

জগৎ ॥ (মুখ ঘুরিয়ে) তোমার মাথা কেন হবে ? হচ্ছে একটা ঝাঁপ।

অপর্ণা ॥ কেন ?

জগৎ ॥ তোমার ঘরের জানালাটার পাল্লা ভেঙে গেছে। এখন একটা মিস্ত্রী ডাকিয়ে সেটাকে মেরামত করতে গেলে অন্ততঃ আট গণ্ডা পয়সা লাগবে। কোথায় পয়সা ? তাই—

[উঠে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর দিকে আসতে সুরু করলেন। এইবার দেখা গেল ভদ্রলোকের বাঁ দিকটা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। বাঁ পাটা টেনে চলেন এবং বাঁ হাতটা শক্ত, কাঁপে থর থর ক'রে। পা টেনে টেনে এসে বসলেন অপর্ণার পাশে সিঁড়িতে।]

জগৎ ॥ তাই বাড়ীর আশেপাশে কাঠ কুটো কঞ্চি খড় যা ছিল, তাই দিয়ে একটা ঝাঁপ তৈরী করে ফেললাম। বোশেখ মাস যাচ্ছে,—জষ্টিও দেখতে দেখতে চলে যাবে, তারপরই তো আসবে বৃষ্টি। ঝাঁপ্‌টা না দিলে ঘর দোর তোমার ভেসে যাবে যে !

অপর্ণা ॥ তাই বলে তুমি নিজে এগুলো করবে? জান তুমি ঝাঁপ তৈরী করতে? করেছ কখনো?

জগৎ ॥ না। তা করিনি সত্যি। কিন্তু এগুলো তো শক্ত কাজ কিছু নয়। সামান্য জিনিষ। নিজে ক'রে নেওয়াই ভাল।

অপর্ণা ॥ কিন্তু শরীর যে তোমার অসুস্থ।

জগৎ ॥ না না, এটুকু অসুস্থতাকে মেনে নিলে সে আরো পেয়ে বসবে অপর্ণা। তাই মনকে বলছি যে এটা কিছুই নয়। অপর্ণা, বাঁ হাত আর বাঁ পাটা আমার গেছে বটে, কিন্তু আমি তাতে দমিনি। এই ভাবে চলাটা অভ্যেস হ'য়ে গেলে তুমি দেখে নিয়ো আমি কোনো চাকরীও করতে পারবো। [একটু থেমে] তুমি কাঁদছো অপর্ণা?

অপর্ণা ॥ তোমার কথা শুনে। কত তো দেখলাম জীবনে। দুঃখ দেখলাম, দারিদ্র্য দেখলাম—পথে ঘাটে কুকুরগুলো যেমন ক'রে মারামারি করে আর চ্যাচায়, তেমনি ক'রে মানুষগুলো মারামারি করলো—তাই দেখলাম। নিরাশ্রয় নিঃসম্বল হ'য়ে ছেলেমেয়ে আর স্বামীর হাত ধরে পথে নামলাম। ঘর ছাড়লাম, বাড়ী ছাড়লাম, জমি-জমা, পুকুর, গরু-বাছুর সব পড়ে রইল,—তাও দেখলাম। এখানে এসে ছেলেটা গেল—সেও দেখলাম।

জগৎ ॥ অপর্ণা!

অপর্ণা ॥ কোলকাতায় এসে তুমি মাষ্টারী আরম্ভ করলে—তাও দেখলাম। এবার এই পক্ষাঘাতে পঙ্গু দেহটাকে নিয়ে আবার নতুন ক'রে আমাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য বেরোও,—এটাও দেখি! নইলে সবটা পূরণ হবে কি করে!

জগৎ ॥ অপর্ণা! আমি তা বলিনি। দ্যাখো—আমিতো মাষ্টারী করেই এই এক ফালি জমিটুকু কিনেছিলাম। ওই ছেলে পড়িয়েই তো এই চালা দুখানা তুলেছিলাম। কেন আমি নিজে এতটা কাজ কর্মের কথা বলি—বুঝিয়ে বলি শোন!

[অপর্ণা স্বামীর দিকে চেয়ে চোখ মুছলেন।]

জগৎ ॥ এই যে বিনু খেয়ে দেয়ে রোজ বেলা ১০টা ১১টায় বেরিয়ে যায় কোলকাতায়, সন্ধ্যায় ফিরে আসে ঝড় খাওয়া পালের মতো,—বলে কোন অফিসে নাকি টেলিফোন গার্লের কাজ করে। হয়তো আরো ভাল কিছু হ'তে পারতো। কিন্তু হবে কি করে? ম্যাট্রিকটাও পাশ করাতে পারিনি। ওর দোষ কি? দোষ তো আমাদের।

অপর্ণা ॥ দোষ ভাগ্যের।

জগৎ ॥ ভাগ্যকে আমরা নিজের হাতে অনেকখানি ভাঙচুর করি অপর্ণা। সবটাই কেন ভাগ্য হবে? তার কিছু ভাল, কিছু মন্দ আমাদের নিজেদের তৈরী। নইলে ভেবে ছাখো দিকিনি, তুমি আর সুপর্ণা তুই বোন। তোমার স্বামী যখন জমিদার, সুপর্ণার স্বামী খগেন মাঝেরপাড়া জমিদার বাড়ীর বাজার সরকার। কিন্তু আজ?

অপর্ণা ॥ হ্যাঁ, খগেন তো বালীগঞ্জে বাড়ী করেছে শুনেছি।

জগৎ ॥ শুধু বাড়ী? গাড়ী করেছে, ব্যাংকে টাকা করেছে, ভাল চাকরী করছে। এখন তারা সমাজের অভিজাত মানুষ।

অপর্ণা ॥ আচ্ছা, খগেন তো ম্যাট্রিক ক্লাস অবধিও পড়েনি।

জগৎ ॥ হুঁ। কিন্তু তাতে কি গেল এল?

অপর্ণা ॥ বলছিলাম যে তুমি তো বি-এ পাশ করেছ!

জগৎ ॥ পাশ ফেলের দিন আর নেই অপর্ণা। এখন দলের খেলা। আমার মনে আছে, তোমার বাবা যখন আমাকে জিগ্যেস করেছিলেন যে নপাড়ার খগেন ছেলেটির সঙ্গে সুপর্ণার বিয়ে দিলে কেমন হয়? আমি বলেছিলাম যে, তার চাইতে হাত পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়া অনেক ভাল। তখন আমি জানতাম না যে খগেনের সঙ্গে সুপর্ণার মেশামেশি এমন পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আর বিয়ে না দিলে কিছুতেই চলে না। তুমি তো জাননা—এসব ঘটনা।

অপর্ণা ॥ না, আমি তখন জামসেদপুরে মামার বাড়ীতে।

জগৎ ॥ হ্যাঁ। তুমি বছর দুয়েক বোধ হয় ছিলে সেখানে।

অপর্ণা ॥ দু বছর কয়েক মাস।

জগৎ ॥ বিয়ে হয়ে গেল ওদের। খগেনের বাড়ীতে নিত্য অশান্তি। কেননা ওদের দারিদ্র্যের সংসারে একজন মেম্বার বেড়েছে। বিয়ে করার পর বাজার সরকারী চাকরীটাও গেল। ফলে খগেন টো টো ক'রে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। এমন সময় নপাড়ায় সুরু হ'ল কংগ্রেস থেকে আবগারী দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ। খগেন একদিন সেখানে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে,—পুলিশ সত্যাগ্রহী মনে ক'রে তাকে ধরে নিয়ে গেল। হ'ল জেল। এই জেলে যাওয়াটাই ছিল ওর শুভগ্রহের নির্দেশ।

অপর্ণা ॥ কেমন ক'রে?

জগৎ ॥ খগেনের তো ছিল 'ক' অক্ষর গোমাংস। কিন্তু জেলে গিয়ে তিন চার জন বড় বড় কংগ্রেসী নেতার ও চাকর হ'য়ে গেল। তাদের ফরমাস

খাটতো, তামাক সেজে দিতো, পা হাত টিপে দিতো, আর চুপ করে বসে বসে শুনতো ওঁদের মধ্যেকার আলোচনা। এই শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে খগেন কংগ্রেস মাইণ্ডেড্ হ'য়ে গেল। এরপর তাঁরা বেরোলেন —খগেনও বেরোলো। এল কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা। সুদিনে তাঁরা দুর্দিনের ভৃত্যকে ভুললেন না। খগেনকে বললেন—কোলকাতায় এসে বাস করো। আমার তো মনে হয়—অপর্ণা, আসছে বছর ইলেক্‌শানে ওঁরা হয়তো খগেনেকে এম-এল-এ ক'রে এ্যাসেম্বলীতে নিয়ে যাবেন।

[অপর্ণা কিছুক্ষণ হাঁ করে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললেন—]

অপর্ণা ॥ বা! তাহ'লে লেখাপড়া শেখার কি দাম?

জগৎ ॥ লেখাপড়ার দাম লেখাপড়া। লেখাপড়ার দাম মাষ্টারী, প্রফেসারী বড় জোর ইউনিভারসিটির লেকচারার এবং খাতা পরীক্ষক। উন্নতির চৌরংগীতে পৌছবার জন্য যে বাই লেন দিয়ে খগেন চলাফেলা করে— সেখানে তুমি আমি দম আটকে মরবো। দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। বুঝেছ?

[নিশিকান্ত নামে পাড়ার একটি যুবক প্রবেশ করলো। সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। একটু যেন ধীর স্থির।]

নিশি ॥ মাসীমা।

অপর্ণা ॥ এস বাবা।

নিশি ॥ এবেলা দোকান থেকে কিছু আনতে হবে কিনা, তাই জানতে এলাম।

অপর্ণা ॥ হ্যাঁ বাবা হবে। একটু দাঁড়াও, আমি পয়সা নিয়ে আসি।

[অপর্ণা উঠে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।]

নিশি ॥ মেসোমশায়, এমনিভাবে চুপচাপ বসে আছেন যে!

জগৎ ॥ এমনি বসে আছি বাবা। বসে বসে ভাগ্যের কথা ভাবছি।

নিশি ॥ আর ভেবে কি লাভ হবে মেসোমশাই? যা হবার হ'য়ে গেছে। পুরোনো দিনের কথা ভেবে কিছু হবে না। নতুন ক'রে বরং বাঁচবার কথা ভাবা যাক্।

জগৎ ॥ তাইতো ভাবি বাবা, তাইতো ভাবি। দিনরাত ভাগ্যের কথাই ভাবি। কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, এবার যাবোই বা কোথায়। ভাবছি, ভাবছি, ভাবছি। উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথঃ।

[অপর্ণা একটা তেলের শিশি আর একটা ছোট, পুরোনো ঝোলা হাতে নিয়ে ফিরে এলেন।]

অর্পণা ॥ এই যে বাবা নিশি! এই নাও। রোজ যা আসে তাই আসবে। বেশীর মধ্যে শুধু আট আনার চাল।

নিশি ॥ আচ্ছা। আর মুদী বলছিল—বাকী দেনাটা থেকে যদি কিছু ছান—

অপর্ণা ॥ শিবুকে বোলো—আর কয়েকটা দিন। মেয়েটা সামনের মাসের মাইনে পেলে আমি ওটা শোধ করেই দেব।

নিশি ॥ আচ্ছা।

[নিশি চলে গেল।]

অপর্ণা ॥ বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। অন্যের বাড়ীতে ধান ভেনে, মুড়ি ভেজে, গোবর দিয়ে, ছেলেটাকে মানুষ ক'রে তুলেছে। এখন ছাখো মিলে নাইট ডিউটি করে,—দিনে টিউশনি করে, আবার নিজেও পড়াশুনা করে।

জগৎ ॥ ঈশ্বর ওকে দীর্ঘজীবী করুন। জান অপর্ণা, মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে জগতে মানুষের চোখের জলের একটা বিশেষ মূল্য আছে। এই দাম দিয়ে যারা ভাগ্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করে, ভাগ্য তাদের প্রতি পরিণামে প্রসন্ন হন।

অপর্ণা ॥ (ম্লান হেসে) আমরাই কি সে দাম কম দিয়েছি?

[নেপথ্য কে যেন ডাকলো]

বিনোদ! বিনোদ আছ?

অপর্ণা ॥ বিনোদকে কে ডাকছে?

জগৎ ॥ কী জানি! কে?

নেপথ্যে ॥ আজ্ঞে আমি। বিনোদ এসেছে?

জগৎ ॥ ভেতরে আসুন!

[একটি প্রৌঢ় লোক প্রবেশ করলো। মুখখানি পরিষ্কার কামানো। নাকে রসকলি। কপালে তিলক। লোকটি উঠানে ঢুকে চোখের পলকে যেন বাড়ীর অবস্থাটা দেখে নিলো। তারপর হাসি হাসি মুখে বললো]

লোকটি ॥ বিনোদ ফেরেনি বুঝি এখনো কোলকাতা থেকে?

জগৎ ॥ না। আপনি?

লোকটি ॥ আমায় বিনোদ চেনে। আমি—ধরুন—কী বলে গিয়ে—বিনোদেরই—ইয়ে, মানে বন্ধু।

জগৎ ॥ বন্ধু!

[অপর্ণা ভেতরে গেলেন]

লোকটি ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

জগৎ ॥ আমার মেয়ে বিনোদের বয়স ১৭।১৮, আপনার মনে হয় ৫৭।৫৮, কী করে বন্ধুত্ব হয় আপনার সঙ্গে তার ?

লোকটি ॥ হয় মশাই হয়। সাপের সঙ্গে বেজীর বন্ধুত্ব হয়, পায়রার সঙ্গে বাজের বন্ধুত্ব হয়,—আর গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের সঙ্গে বিনোদিনী সেনের ভাব হতে পারে না ? রাধে ! রাধে !

জগৎ ॥ কী বলতে চাইছেন ?

গোপীকান্ত ॥ কিছুই তো বলতে চাইনি। শুধু জানতে চেয়েছি যে বিনোদ ফিরেছে কিনা !

জগৎ ॥ না, সে এখনো অফিস থেকে বাড়ী আসেনি।

গোপী ॥ অফিস ! অফিস মানে ?

জগৎ ॥ কেন ? এত খবর রাখেন, আপনার সঙ্গে তার এত ভাব, আর এই খবরটা রাখেননা যে, সে কোলকাতার অফিসে টেলিফোন গার্লের কাজ করে !

[কিছুক্ষণ জগতের দিকে গোপীকান্ত চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যেন চমক ভাঙলো তার। বললো—]

গোপী ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। রাধে, রাধে ! আমারই ভুল হয়েছে। আচ্ছা, তা'হলে আমি আসি এখন ! বিনোদ এলে বলবেন যে গোপীকান্ত গোঁসাই এসেছিল।

জগৎ ॥ আচ্ছা বলবো !

গোপী ॥ নমস্কার !

[গোপী চলে যাবার পরও চুপ ক'রে পথের দিকে চেয়ে রইলেন জগৎ সেন। কিসের যেন একটা দ্বিধা, একটা দ্বন্দ্ব, একটা সন্দেহ, আলো ছায়ার মতো খেলে গেল তাঁর মুখের ওপর। দোকান সেরে নিশিকান্ত ফিরে এল। ডাকলো—মামীমা। ঘরের মধ্য থেকে জবাব দিলেন অপর্ণা—যাইরে নিশি। অপর্ণা বেরিয়ে এসে জিনিষপত্র নিলেন। জগৎও স্ত্রীর পিছু পিছু ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। মঞ্চ ফাঁকা। একটু পরে সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল উঠানে। আরো পরে জোনাকী জ্বলতে লাগলো। দূর থেকে শাঁখের শব্দ শোনা গেল। আরো দূরে তিনবার। বহু দূরে আরো তিনবার :

ঘর থেকে একটা সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন অপর্ণা। ক্ষীণ প্রদীপের আলোয় তাঁর মুখখানিকে আরো ম্লান, আরো রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। প্রদীপটি তুলসীবেদীর ওপর রেখে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলেন তিনি। মৃদু গলায় বললেন—]

অপর্ণা ॥ হরি ঠাকুর ! ধন দৌলত ঐশ্বর্য কিছুই চাইনে তোমার কাছে।

আমার বিনোদ যেন সুস্থ থাকে, ভাল থাকে। ওই দুরন্ত কোলকাতা সহরে যেন সে নিজের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে পারে।

[সঙ্গে সঙ্গে একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ ক'রে উঠলো। অপর্ণা চাইলেন সেদিকে পরক্ষণেই বলে উঠলেন—]

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল!

[ধীরে ধীরে উঠে ঘরের দিকে যাচ্ছেন। বাইরে কাশির শব্দ শোনা গেল। অপর্ণা দাঁড়ালেন। লাঠি ভর দিয়ে ভূপতি বিদ্যাবাগীশ প্রবেশ করলেন। অপর্ণা যেন খুসী হলেন। ছোট্ট ক'রে বললেন—]

আসেন দাদু!

[অপর্ণা তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠে আসন এনে সিঁড়ির উপর পেতে দিলেন। বিদ্যাবাগীশ বসলেন।]

বিদ্যা ॥ জগৎ কই?

অপর্ণা ॥ ভেতরে। আপনি বসুন। আমি অরে ডাকতেছি।

[অপর্ণা ভেতরে গেলেন। বিদ্যাবাগীশ অন্ধকারেই বসেছিলেন। অপর্ণা আবার এসে হ্যারিকেন রেখে গেলন। জগৎ বেরিয়ে এলেন। পাশে বসলেন।]

বিদ্যা ॥ কী করতে আছিলা?

জগৎ ॥ গীতা পড়তেছিলাম।

বিদ্যা ॥ হাঃ! গীতা পইর‍্যা কী হইব? গীতা তো আমরা করতেই লাগছি।

জগৎ ॥ গীতা করতে লাগছি? কেমুন?

বিদ্যা ॥ শোনবা? গীতা কথাটা তিন-চাইর-বার কওতো দেখি!

জগৎ ॥ ক্যান্! গীতা—গীতা—গী—তাগী—ত্যাগী—

বিদ্যা ॥ হইছে? গীতা হইয়া গেছে ত্যাগী। তা, গীতা পইর‍্যা লাভ কী? আমরাতো ত্যাগী হইয়া গীতা করতেই আছি।

জগৎ ॥ হ। এইটা ঠিক কইছেন?

বিদ্যা ॥ তয়! আমাগো লাখান্ ত্যাগ করছে কে? জমি-জমা-বারী-ঘর—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মান-সম্মান, মাইন্সের বলতে যা আছিল—হক্কলই তো রাইখ্যা আস্ছি। আমাগো কি অথন্ মানুষ কওন যায়! খবরের কাগজ আমাগো কয় সর্বহারা, কয় উদ্বাস্তু। ভাব্ছনি কথাটা! পূর্ববংগের পূরা হিন্দুগো নাম হইয়া গেছে উদ্বাস্তু। পশ্চিমবংগে আমাগো নাম আছিলো অ-মুসলমান, অথন্ হইছি উদ্বাস্তু।

জগৎ ॥ খবরের কাগজওলাগো ব্যাপারই আলাদা। পাখার নীচে বইস্যা, মদ্যপান করতে করতে—হ্যাশের ব্যথায় তান্গো বুক টন্ টন্ করে। আর

সাথে সাথে পিপর্যার সারির মতো কালো কালো বাণীর সারি বাইরইতে থাকে।

বিদ্যা ॥ ভোর বেলায় ঘুমের থনে উইঠ্যা পশ্চিম বংগের নাগরিকের দল হেই বাণী পইর‍্যা চক্ষের জল ফ্যালায়—আর কয়—উঃ! কী কষ্টটাই না পাইছে—পূর্ববংগের লোক।

জগৎ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! আমি পরছি—কিছু কিছু এই বাণী। তার মধ্যে বাশ আছে, বাশী আছে। পূজার ঢাক আছে, কাসী আছে, ধ্বনি আছে…প্রতি ধ্বনি আছে,—ক্যাবলা নাগ আছে, আবার আমাগো কেব্‌লু মিঞাও আছে।

বিদ্যা ॥ লোমহর্ষক রচনা। নিরাপদ দূরত্বের যীশু খৃষ্ট সব। এই সব মহা-পুরুষরা, হেইকালে কই আছিলেন, যখন ওই কেব্‌লু মিঞাই চুলের মুঠি ধইর‍্যা, টাইন্যা নিয়া গেছে আমার মাইয়া অন্নপূর্ণারে। দুইখান মাঠ পারের দূর থেইক্যাও শুনছি তার 'বাবা' 'বাবাগো' ডাক। [একটু চুপ করে থেকে] অখনও শুনি। অখনও।

[চুপচাপ। ঝিঁঝি ডাকছে উঠানে। একটু তফাতে কখন যে অপর্ণা এসে বসেছেন—কেউ দেখেনি। এইবার কথা কইলেন তিনি।]

অপর্ণা ॥ দাদু! হেই কথা আলোচনা কইর‍্যা আইজ্‌ আর কোন লাভ নাই।

বিদ্যা ॥ নাঃ! কোন লাভ নাই। আমি এই কথা ভাবি জগৎ যে আমাগো পাপ আছিল। আমার না থাকে—তোমার না থাকে, আমাগো পূর্ব পুরুষগো আছিল। হেই কথা তো আইজ্‌ গোপন কইর‍্যা কোন লাভ নাই যে মুসলমানগো আমরাও ভাল চক্ষে দেখি নাই। এমন বারীও আমি জানি, যেইখানে,—উঠানে মুসলমান ঢুইক্যা কথা কইয়্যা গেলে—গোবর জল দিয়া উঠানরে শুদ্ধ কইর‍্যা নিতো। হইবোনা? এত পাপ যাইবো কই? হইছে। অখন যাই। মাইয়া মানুষটা একলা বইস্যা রইছে। খা-ইছে? আরে—আসল কথাটাই তো অহনতরি কই নাই! আমারে আট আনা পয়সা দিতে পারো?

জগৎ ॥ পয়সা! [অপর্ণাকে] পারবা?

অপর্ণা ॥ হ, পারুম। [উঠে গেল]

বিদ্যা ॥ বাচাইছো। আইজ্‌ সারাটা দিন উপনিষদগুলা দেখতেছিলাম। খাইও নাই, খাওয়ার কথা মনেও পরে নাই। অখন সন্ধ্যাকালে গিয়া শুনি—ব্রাহ্মণীও খায় নাই। কারণ পয়সা নাই।

[অপর্ণা ঘর থেকে এনে পয়সা দিল।]

বিদ্যা ॥ আইচ্ছা অথন উঠি। যাওনের পথে চাল ডাল নিয়্যা যামু। দুর্গা দুর্গা। দুর্গতি নাশিনী!

[প্রস্থান]

জগৎ ॥ কী প্রচণ্ড ব্যথা ভূপতি দাদার বুকে,—তুমি অনুমান করতে পারো অপর্ণা! বাড়ীতে পিতামহের রেখে যাওয়া টোল ছিল, সারাটা জীবন অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক'রে কাটিয়েছেন। আমাদের তবু বিনোদ আছে, ওঁর অন্নপূর্ণার বিসর্জন হয়ে গেছে। কিন্তু বিনোদ এখনো এলোনা কেন? রাত্রি নটা বাজে বোধ হয়!

অপর্ণা ॥ এই সময়ই তো আসে। বলে—ওভারটাইম করি মা। নইলে চলবে কী ক'রে আমাদের?

জগৎ ॥ সেটা ভাল। কিন্তু এই বেশি খাটতে গিয়ে অসুখে না পড়ে।

অপর্ণা ॥ কী বলবো বলো! ভগবানকে ডাকা ছাড়া আমাদের আরতো কোন উপায় নেই।

জগৎ ॥ চলো, ঘরে গিয়ে বসি। সদরটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আসবে?

অপর্ণা ॥ না। বিনোদ আসবে এখুনি।

[দুজনে উঠে ঘরের মধ্যে যাবেন, এমন সময় বাইরে গলা শোনা গেল। মনে হয় গোপীকান্ত গোঁসাই। নিম্নলিখিত কথাগুলি নেপথ্য থেকে শোনা যাবে—সম্ভব হ'লে মাইকে]

গোপী ॥ বিনোদ!

বিনোদ ॥ কে?

গোপী ॥ আমি গো আমি। অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছি।

বিনোদ ॥ কেন দাঁড়িয়ে আছেন? এখানে আসতে কে বলেছে আপনাকে?

গোপী ॥ কোলকাতায় গিয়ে যে—

বিনোদ ॥ চুপ করুন! কী কোলকাতায় গিয়ে— ? আমার কোন ঠিকানা নেই? বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলেন বুঝি?

গোপী ॥ হ্যাঁ। তোমার বাবার সংগে—

বিনোদ ॥ চলে যান, চলে যান। শুনুন! আর কক্‌খনো আমার বাড়ীতে আসবেন না! এ কী হ্যাংলাপনা আপনার?

গোপী ॥ তুমি জানোনা বিনোদ—

বিনোদ ॥ জানি, জানি সব জানি। যান! চলে যান। এ্যাঁ! কী বলছেন? কোলকাতায় গেলে এসব কথা হবে। না—না—না, চলে যান।

[বাইরের কথা থেমে গেল। দাওয়ার ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন জগৎ আর অপর্ণা। বিনোদিনী বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। কাঁধে একটা হ্যাভারস্যাক্। দাওয়ার কাছে এসে ঝোলার মধ্যে থেকে একটা খাবারের কৌটা বার ক'রে দাওয়ার রাখলো। তখনো চুপ ক'রে চেয়ে আছে বাপমা তার দিকে। বিনোদিনী বাপমায়ের পাশ দিয়ে উঠে ঘরে যাচ্ছিল, অপর্ণা ডাকলেন—]

অপর্ণা ॥ বিনোদ!

বিনোদ ॥ [ফিরে] কী মা?

অপর্ণা ॥ ওই লোকটা কে?

বিনোদ ॥ [ভয়ে ভয়ে] কোন লোকটা?

অপর্ণা ॥ বাইরে দাঁড়িয়ে যার সঙ্গে কথা বলছিলি?

বিনোদ ॥ ও! ওই লোকটা? ও সম্পূর্ণ একটা বাজে লোক মা? বাড়ীতে এসেছিল বুঝি? এমন বিরক্ত করে মাঝে মাঝে!

জগৎ ॥ কেন বিরক্ত করে?

বিনোদ ॥ সে আমি কেমন ক'রে বলবো?—আমি কেমন ক'রে—। আমার সঙ্গে আজই তো প্রথম দেখা।

অপর্ণা। প্রথম দেখা!

বিনোদ ॥ হ্যাঁ। প্রথম দেখা! প্রথম দেখাই তো!

[অপর্ণা চুপ করে মেয়ের দিকে চেয়ে রইলেন। বিনোদও কিছুক্ষণ মায়ের দিকে চেয়ে থেকে চোখ নীচু করলো। অপর্ণা স্বামীর দিকে চাইলেন। পরে আবার মেয়ের দিকে। কয়েক মুহূর্ত। জগৎ ভেতরে গেলেন।

বিনোদিনীর আনত চোখ থেকে টপ্ টপ্ ক'রে জল পড়ছে মাটিতে। অপর্ণা গিয়ে ধরলেন মেয়েকে। চীৎকার ক'রে বললেন—]

অপর্ণা ॥ কাঁদছিস্ কেন? কাঁদছিস কেন তুই?

[বিনোদ চোখ তুলে কাঁদতে কাঁদতে বললো—]

বিনোদ ॥ আমি আর পারছিনা মা! আমি আর পারছিনা!

অপর্ণা ॥ কী পারছিস না? কী হয়েছে আমাকে বল! বিনু!

বিনোদ ॥ [ক্লান্ত গলায়] আফিসে—ভয়ানক—খাটুনী পড়েছে মা! ভয়ানক খাটুনী পড়েছে! ভয়ানক খাটুনী। গা গতর সব চূরমার হ'য়ে গেল আমার। পারছিনা—আমি।

[তিন খানা পাঁচ টাকার নোট মায়ের হাতে গুঁজে দিয়ে ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন অপর্ণা, টাকা হাতে ক'রে দাওয়ায় বসে পড়লেন। দূর শূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। সমগ্র মঞ্চে আকাশ ভরা তারার ম্লান আলো। তাতে চরিত্রের উপস্থিতি

বোঝা যায় কিন্তু তার অভিব্যক্তি দেখা যায় না। অপর্ণা বসে আছেন, তাঁর হাতে সেই টাকা তখনো ধরা। তিনি দাওয়ায় উঠবার সিঁড়ির ওপর বসে আছেন দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে। উঠানের ম্লান ঝাপসা আলোতে মাঝে মাঝে জোনাকী জ্বলছে আর নিভছে। দূরে কোন ধনীর বাড়ীর পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে রাত্রি বারোটা বাজলো।
একটু দূরে একটা মোটর গাড়ী থামার শব্দ হল। দুবার মোটরের দরজা বন্ধের শব্দ শ্রুত হলো। আরো পরে একটা মোটা গলা শোনা গেল]

এই বাড়ী ?

[প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন মাতালের জবাব ভেসে এল]

মাতাল ॥ আগ্যেঁ হ্যাঁ। এগিয়ে যান, কড়া নাড়ুন। মাষ্টার মশায়ের ইস্-ত্রী খুলে দেবেন দরজা। যান! কিছু ভয় নেই মশাই। খুব ভাল লোক। বুঝেছেন, খুব ভাল লোক ওরা।

[এইবার সদর দরজার কড়া নেড়ে উঠলো। নেপথ্যে মোটা গলা শোনা গেল—]

কে আছেন ? বাড়ীতে কে আছেন ?

একটি মেয়েলি গলা ॥ আঃ! অত চীৎকার করছো কেন। আস্তে ডাকোনা !

নেপথ্যে পুরুষের গলায় ॥ আস্তে ডাকলে তো শুনতে পাবেনা। সবাই ঘুমোচ্ছে হয়তো !

[এইবার অপর্ণা উঠে ঘরের মধ্যে গিয়ে একটি হ্যারিকেন হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। খুলে দিলেন শেকলটা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠানে ঢুকলো একজন দামী স্যুটপরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক।]

প্রৌঢ় ॥ জগৎবাবু কি ঘুমোচ্ছেন ?

অপর্ণা ॥ [মৃদুগলায়] হ্যাঁ।

প্রৌঢ় ॥ একবার ডেকে দিতে হবে যে! খুব জরুরী দরকার।

অপর্ণা ॥ তিনি অসুস্থ মানুষ। তাঁকে এসময় ডাকা উচিত হবেনা। কী দরকার আমায় বলুন। আমি তাঁর স্ত্রী।

[পেছন থেকে আর একটি মহিলা এগিয়ে এসে অপর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় ডাকলো—]

সোনাদি !

[চোখের পলকে হ্যারিকেনের শিখা বাড়িয়ে আলোটা তুলে ধরলেন অপর্ণা সেন। মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে অস্ফুটে বললেন—]

সুপাই !

সুপর্ণা ॥ হ্যাঁ। আমি।

অপর্ণা ॥ তুই! হঠাৎ এত রাত্তিরে এখানে!

সুপর্ণা ॥ কেন? আসতে নেই?

অপর্ণা ॥ আসিস্ না তো কখনো, তাই বলছি। আয়, বসবি আয়।

[অপর্ণার পেছনে পেছনে এগিয়ে গেল সুপর্ণা ও তার প্রৌঢ় সঙ্গী। অপর্ণা দাওয়ায় উঠে একটা তালপাতার চ্যাটাই পেতে দিলেন।]

অপর্ণা ॥ বোস্। আপনিও বসুন। খগেন আসেনি সুপাই?

সুপর্ণা ॥ না, সোনাদি। তার এখন অনেক কাজ। দেশের কাজ বোলে কথা। পরিচয় করে দিই। ইনি আমার বন্ধু মিঃ তালুকদার।

অপর্ণা ॥ আমি দেখি তোর জামাইবাবু জেগে আছে কিনা।

সুপর্ণা ॥ বিনোদ কই?

অপর্ণা ॥ সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

তালুকদার ॥ তাহ'লে কাজের কথাটা বলে নাও; কারণ এর পর দেরী ক'রলে, কোলকাতা ফিরতে ফিরতে রাত দুটো বেজে যাবে।

সুপর্ণা ॥ কাউকে ডাকতে হবেনা। তুই বোস সোনাদি। তোর সঙ্গে দুটো কথা বলি।

[নিরুপায়ের মতো অপর্ণা বসে পড়লেন দাওয়ায় বোনের পাশে।]

অপর্ণা ॥ খগেন আছে কেমন?

সুপর্ণা ॥ ভাল।

অপর্ণা ॥ বেবী!

সুপর্ণা ॥ তার কথাই জানতে এসেছি তোমার কাছে সোনাদি!

অপর্ণা ॥ কী রকম?

সুপর্ণা ॥ বেবী এসেছিল তোমার এখানে?

অপর্ণা ॥ বেবী!

তালুকদার ॥ হ্যাঁ। ওর মেয়ে।

[অপর্ণা তালুকদারের মুখের দিকে চাইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলে আবার সুপর্ণার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—]

অপর্ণা ॥ বেবী, এখানে আসবে কেন?

সুপর্ণা ॥ ভেবেছিলাম—তাই আসবে। কিশলয় বলে একটি ছেলে—ওর প্রাইভেট টিউটার, তার সঙ্গে ইলোপ করেছে সে।

অপর্ণা ॥ কী ক'রেছে?

তালুকদার ॥ পালিয়ে গেছে।

অপর্ণা ॥ সেকি !

সুপর্ণা ॥ হ্যাঁ। আজকে সন্ধ্যের সময় আমার লজ্‌ ছিল. তালুকদারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি—তখনো দেখে গেছি বেবী বসে পড়ছে। ওই কিশলয় বলে ছেলেটা—গোড়াগুড়ি থেকেই আমি ওকে ঠিক ভাল চোখে দেখিনি। আমাদের এই তালুকদারেরই ভাগ্নে সে।

তালুকদার ॥ তার আমি কী করবো! আমার ভাগ্নে হ'তে পারে। কিন্তু তাকে পাহারা দেবার দায়িত্ব তো আমার নয়। সে এ্যাডাল্ট, তাছাড়া বেবীও—

সুপর্ণা ॥ না। বেবী এ্যাডাল্ট হয়নি এখনো। আরো একবছর বাকী। তুমি যদি আমাকে একটু ইংগিত করতে, তাহ'লে কখনোই আজ এতবড় দুর্ঘটনা ঘটতোনা। কখনোই ঘটতোনা।

অপর্ণা ॥ কোথায় গেছে, বলে যায়নি ?

সুপর্ণা ॥ না। আমি আর পারছিনে সোনাদি। কতকগুলো ওয়ার্থলেস জানোয়ার নিয়ে ঘর করতে করতে আমি শেষ হ'য়ে গেলাম।

অপর্ণা ॥ কেন ? খগেন কিছু করেনা ? সে দেখেনা ?

সুপর্ণা ॥ না। তার দেশের কাজ, দলের কাজ আগে। এখন এম-এল-এ হবার স্বপ্ন দেখছে। তা দেখুক। আই ডোণ্ট মাইণ্ড। আমার চাকর যতটুকু পারে, তার সেটুকু করবারও ক্ষমতা নেই। মেয়েকে আদর দিয়ে দিয়ে সে-ই তো মাথা খেয়েছে।

অপর্ণা ॥ তুই বেবীকে বকাঝকা করিসনি তো ?

[ধীরে ধীরে দ্বারপথে দেখা গেল জগৎকে। তিনি সেইখানে দাঁড়িয়ে বললেন—]

জগৎ ॥ এত রাত্রে তুমি কার সঙ্গে বক্‌ বক্‌ করছো ?

অপর্ণা ॥ [মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে] সুপাই এসেছে।

জগৎ ॥ সুপাই এসেছে ? বল কি ! কী সর্বনাশ !

[কাছে এসে তার দিকে চেয়ে হাসলেন।]

জগৎ ॥ সুপাই ! তুই হালায় মোটা হইছস্‌ দেখি ! কই গেছিলি !

সুপর্ণা ॥ সোনাদির কাছেই এসেছি।

জগৎ ॥ ক্যান্‌। সোনাদিরে—তর পার্সোন্যাল সেক্রেটারীর পদটা দিতে আইছস্‌ নাকি ?

সুপর্ণা ॥ জামাইবাবু। প্লিজ। ভাল ভাবে কথা বলুন। ও ভাষা আমি

ভুলে গেছি। [আড় চোখে তালুকদারকে দেখে নিয়ে] মোর ওভার আই হেট্ বাঙাল্স্!

জগৎ॥ এ্যাঁ! ইউ হেট্ বাঙাল্স্?

তালুকদার॥ হ্যাঁ। উনি চাকর বাকরদের মধ্যেও যারা ওই ভাষায় কথা বলে তাদেরও বাড়ীতে রাখেন না। ওঁদের কথা বাদ দিন, কিন্তু বাড়ীতে ওঁর মেয়ে বেবী রয়েছে। তার পক্ষে তো এটা ব্যাড্ একজাম্পল্! তাই—

সুপর্ণা॥ আঃ! তালুকদার!

তালুকদার॥ না, আমি ওঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম—

সুপর্ণা॥ না, তুমি বোঝাবেনা।

জগৎ॥ সুপাই, তুই দেখতে আছি, সভ্য হইয়া নারী কালাপাহাড় হইছস্! এ্যাঁ! ইউ হেট্ বাঙাল্স্! খাসা! এইটা কী কোইলিরে! তা—তর যে বাপের বাড়ী, স্বামীর ব্যাড়ী—বাওন্‌বেইর‍্যা আছিল। হেই কথাও তো—

সুপর্ণা॥ জামাইবাবু প্লিজ! আমি একটা সিরিয়াস্ ব্যাপারে সোনাদির সংগে দেখা করতে এসেছি। এ সময় ঠাট্টা নয়!

জগৎ॥ [অপর্ণাকে] কী অইচে!

অপর্ণা॥ বেবী তার প্রাইভেট টিউটাররে নিয়্যা কই জানি পলায়্যা গেছে।

জগৎ॥ কই গেছে? কবে গেছে?

অপর্ণা॥ আইজ্। সুপাই বাড়ীত আছিলোনা—গজে গেছিলো—

সুপাই॥ আঃ! গজে নয় সোনাদি! লজে।

জগৎ॥ লজে! কে লজে গেছিলো? সুপাই?

[হাঁ ক'রে কিছুক্ষণ সুপর্ণার মুখের দিকে তারপর তালুকদারের মুখের দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন—]

বোঝলাম! [নিজের মনে বললেন] অফ্‌কোর্স ইট্ ইস এ নিউজ টু মি!

[এই বলে একপা একপা ক'রে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন।]

তালুক॥ সুপর্ণা! আমরা আর দেরী করলে—

সুপর্ণা॥ না। চলো! আমি যাই সোনাদি! কিছু বলা যায়না,—বেবী তোর কাছে আসতে পারে। যদি আসে তাকে আটকে রেখে আমায় একটা খবর দিবি কি টেলিফোন করে দিবি। এই আমার নম্বর [কার্ড দিল] তারপর হাণ্টার দিয়ে কেমন করে ওদের দুজনের পিঠের ছাল তুলে নিতে হয়,—আমি চললাম।

[সুপর্ণা ও তালুকদার বেরিয়ে গেল। আবার হ্যারিকেন নিয়ে অপর্ণা গেলেন পিছু পিছু। দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। গাড়ীর শব্দ হ'ল। অপর্ণা দরজা বন্ধ ক'রে আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে হ্যারিকেনটা নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। স্পষ্ট হ'ল আবার ঝিঝির ডাক···জোনাকী জ্বলছে এখানে সেখানে···মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার হ'য়ে আবার আলো ফুটতে লাগলো।]

ঃ পরদিন ভোর ঃ

[দাওয়ায় মাদুরের ওপর শুয়ে বুকের নীচে বালিশ দিয়ে জগৎ কী যেন লিখছিলেন। তাঁর কাছে শূন্য একটা কাপ ডিস পড়ে আছে। কথা বলতে বলতে বিদ্যাবাগীশ ও অপর্ণা প্রবেশ করলেন।]

বিদ্যা ॥ কয় কী? বাঙালগো ঘৃণা করি এই কথা কইলো সুপাই!

অপর্ণা ॥ হ।

[বিদ্যাবাগীশ ধপ্ ক'রে সিঁড়ির উপরে বসে পড়লেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন—]

বিদ্যা ॥ আশ্চর্য! অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি!

[তারপর ম্লান হেসে বললেন—]

বিদ্যা ॥ জগৎ! শোন্‌তেছো!

[অপর্ণা ঘরে ঢুকে গেলেন।]

জগৎ ॥ [মুখ তুলে] হুঁ! কাইল্ রাত্রে আমারেইতো কইছে!

বিদ্যা ॥ আরে, আমি যদি আমার পিতৃ-পিতামহের বারী পূর্ববংগে আছিল বোইল্যা লজ্জা পাই, তয়তো আমারে স্বয়ম্ভু হইতে হয়। না কি?

জগৎ ॥ হেই কথাইতো ভাবতে লাগছি।

বিদ্যা ॥ অগো কীর্তিকলাপ দেইখ্যা, আমার তো মনে হইতেছে যে আমাগো পূর্ববংগটা বোধ হয় চীন দেশে আছিলো। কী কও, জগৎ?

[দরজা দিয়ে একটি সুদর্শন তরুণ আর একটি সুন্দরী তরুণী উঠানে ঢুকলো। বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে এল দুজনে। মেয়েটি অগ্রসর হ'য়ে বিদ্যাবাগীশের সামনে দাঁড়িয়ে বললো—]

তরুণী ॥ মাসীমা আছেন?

বিদ্যা ॥ কে?

তরুণী ॥ আমার মাসীমা।

[জগৎ মুখ তুলে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।]

জগৎ ॥ ওগো! শুনছো? আরে, কে এসেছেন একটু বেরিয়ে ছাখো।

[অপর্ণা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। চিনতে না পেরে এগিয়ে যেতেই তরুণী তাঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিলো। তার দেখাদেখি তরুণও সেইভাবে তাঁকে প্রণাম করলো।]

অপর্ণা ॥ কে তোমরা মা? আমি তো ঠিক চিনতে পারছিনা।

তরুণী ॥ মাসীমা! আমি বেবী!
অপর্ণা ॥ বেবী!
জগৎ ॥ বেবী!
বেবী ॥ হ্যাঁ মেসোমশায়, আমি বেবী।
[দাওয়ায় উঠে গিয়ে প্রণাম ক'রলো, কিশলয়ও গিয়ে প্রণাম করলো]
বেবী ॥ আর ইনি হচ্ছেন আমার স্বামী। অধ্যাপক—, এই! বলোনা নামটা। কী মুস্কিল! আমি কী ক'রে বলি?
কিশ ॥ কিশলয় কর।
অপর্ণা ॥ [বিদ্যাবাগীশকে] চেনলেন?
বিদ্যা ॥ নাঃ!
অপর্ণা ॥ আমাগো সুপাইয়ের মাইয়্যা।
বিদ্যা ॥ সুপাইয়ের কন্যা। আ-চ্ছা!
অপর্ণা ॥ তোর মা এসেছিল কালকে রাত্রে তোর খোঁজে। বলছিলো, তুই নাকি তোর প্রাইভেট টিউটারকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিস্?
বেবী ॥ হাঁ। পালিয়েইতো এসেছি। কেন জান মাসীমা? মা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে একটা জন্তু, একটা যন্ত্র বানাতে চায়। কুড়ি বছর বয়স হ'ল আমার, এখনো আমি নাকি সাবালিকা হইনি!—এখনো আমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবো না, বাইরে বেরোতে পারবো না। মেপে মেপে হাসতে হবে, পথ চলতে হবে, কোন অতিথি এলে তার সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে হবে। কেন!
জগৎ ॥ তা' তোদের সমাজের তো এই নিয়ম!
বেবী ॥ বাজে নিয়ম মেসোমশায়। মায়ের বেলা সেই সমাজ তার সমস্ত বিধি নিষেধ তুলে নিয়েছে,—তালুকদারের সঙ্গে লজে বেরিয়ে মা দুদিন বাড়ী না ফিরলেও সেই সমাজ কিছু বলবে না,—অথচ কুড়ি বছরের মেয়েকে বলবে—তুমি নাবালিকা। সাবধানে চলো। আমি মানিনা এই সমাজ। মানবোনা এর মনগড়া আইন। কাল রাত্রে আমরা ওর এক কাকার বাড়ীতে ছিলাম। আমি কেন এসেছি বলতো মাসীমা?
[ঠিক এমনি সময় ঘর থেকে বিনোদ বেরিয়ে এল, কোলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে। কাঁধে হ্যাভারস্যাক। বেবী হাঁ ক'রে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।]
অপর্ণা ॥ কেন এসেছিস, কেমন ক'রে বলবো? তুই বল্! বিনোদ।
বিনোদ ॥ [গম্ভীর মুখে] কী মা?

অপর্ণা ॥ এ হ'ল তোর স্বপাই মাসীর মেয়ে—বেবী। ওরা ভালবেসে বিয়ে করেছে।

বেবী ॥ [খপ্ করে বিনোদের হাত ধরে] মাসীমা! আমি বড়, না ও বড়?

অপর্ণা ॥ উঁ? তোদের মধ্যে বড় হ'ল গিয়ে—ওর দাদা যদি বেঁচে থাকতো—তা'হলে। না, তুই বড়।

বেবী ॥ এইবার? [বিনোদকে] আমার পাওনা আমাকে বুঝিয়ে না দিয়ে পালাচ্চিস যে বড়? প্রণাম কর্ আমাকে!

[বিনোদ হেসে বেবীকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।]

বেবী ॥ কোথায় কাজ করে বিনোদ?

অপর্ণা ॥ কোন্ এক অফিসে টেলিফোন অপারেটার।

বেবী ॥ ও! আমরা কেন এসেছি জান মাসীমা? আমরা তো জিয়াগঞ্জ যাচ্ছি। শ্রীপৎ সিং কলেজে কাল থেকে ওর জয়েন করবার দিন। কাজেই এই গাড়ীতেই আমরা চলে যাব।

জগৎ ॥ সেকি! একটা বেলা অন্ততঃ থেকে যা।

বেবী ॥ না মেসোমশায়। ওখানে গিয়ে ঘর দোর সব ঠিক করতে হবে। চাকর দেখতে হবে একটা। যে কোন একটা ছুটিতে না হয় চলে আসবো। মায়ের আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ পেলাম তাও জানি। তবু নতুন সংসার আরম্ভ করবার আগে, গুরুজনদের প্রণাম না ক'রে, তাঁদের আশীর্বাদ না নিয়ে—যাই কী ক'রে? তাই ওকে বল্লাম, চলো এখানে আমার আপন মাসীমা মেসোমশাই থাকেন। মাও যা, মাসীমাও তাই। তাঁদের প্রণাম ক'রে চলে যাই আমরা।

[এই বলে বেবী অপর্ণাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি বল্লেন—]

অপর্ণা ॥ ওরে ওখানে, ওখানে আগে। গুরুর গুরু!

[দুজনে গিয়ে বিদ্যাবাগীশকে প্রণাম করলো]

বিদ্যা ॥ জগৎ! ঠিক কইর‍্যা কওতো! এ আমাগো স্বপাইয়ের মাইয়্যা।

জগৎ ॥ হ।

বিদ্যা ॥ এতো দেখি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্ম নিছে। তুমিও কি বাঙালগো ঘৃণা করো নাকি দিদি!

বেবী ॥ [অপর্ণা ও জগৎকে প্রণাম করতে করতে] কী করে করি? তা'হলে তো নিজেকেই ঘৃণা করতে হয়। আমিও তো বাঙাল।

বিদ্যা ॥ আঃ! বড় আনন্দ পাইলাম। বাইচ্যা থাকো।

কিশলয় ॥ আমরা কিন্তু অদ্ভুত ভাবে বিয়ে করেছি। ও বৈদ্য, আমি কায়স্থ। আপনি পণ্ডিত মানুষ, রাগ করছেন নাতো!

বিদ্যা ॥ আমি না হয় রাগটা হাতে আছে করলাম, কিন্তু যখন আকবর বাদশা জোর কইর‍্যা মানসিংহের বোনাই হইছিল, হেইকালে তো রাগ করতে পারি নাই? দুর্বলের বেলায় পণ্ডিত গো সমস্কৃত শোনা গেছে, কিন্তু সবলরা? সবলরা যখন করছে, তখন প্রাণ হানির ভয়ে পণ্ডিতের দল পলাইয়া রইছে, আর দুর্গানাম জপ করছে। হঃ। মানুষ মানুষেরে বিয়া করবো— হেইয়ার মধ্যে আবার মারামারি মতবিরোধ কি!

কিশলয় ॥ সুন্দর বলেছেন।

বেবী ॥ পাকা চুল, কিন্তু কী মডার্ণ মন দেখেছো! চলি মাসীমা। মেসোমশায়, দাদু যাচ্ছি। গাড়ী দাঁড়িয়েই আছে।

বিদ্যা ॥ খারাও। বিয়্যার কালে মন্ত্র পড়ছো—না,—

কিশলয় ॥ না। রেজেষ্ট্রী ম্যারেজ হবে।

বিদ্যা ॥ তাইলে হাটা দ্যাও। আমি মন্ত্র পড়তে লাগছি—

[অপর্ণা এক হাতে কিশলয়ের হাত আর এক হাতে বেবীর হাত ধরে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। বিদ্যাবাগীশ চললেন পেছনে পেছনে মন্ত্র পড়তে পড়তে।]

ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বৃষ গজ তুরগা দক্ষিণাবর্ত বহ্নি—
দিব্যাস্ত্রী পূর্ণকুম্ভ দ্বিজ-নৃপ-গণিকা পুষ্পমালা পতাকা,
সদ্যোমাংসং ঘৃতং বা দধি-মধু-রজতং-কাঞ্চনং-শুক্ল ধান্যম্।
দৃষ্ট্বা, শ্রুত্বা, পঠিত্বা ফলহি লভতে মানবো গন্তু কামঃ।

[শ্লোকের মাঝখানেই ওরা বেরিয়ে গিয়েছিল, বাইরে থেকে শ্লোক শোনা যাচ্ছে। রিক্সার আওয়াজ হ'ল। একটু পরে ফিরে এলেন অপর্ণা। চুপ ক'রে বসলেন— সিঁড়িতে। একটু পরে রৌদ্র এসে পড়লো তাঁর মুখে। তিনি বসেই রইলেন। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আবার আলো জ্বললো—]

ঃ এক মাস পরে ঃ

[দাওয়ায় চুপ ক'রে মাথা নীচু ক'রে বসে আছে বিনোদ। একটু তফাতে বসে গোপীকান্ত গোঁসাই।]

গোপী ॥ এতে এত ভেঙে পড়বার কী আছে বিনোদ, আমি তো বুঝতে পারছিনা।

বিনোদ ॥ তুমি কিছুই বুঝতে পারছোনা, না? এটা বুঝতে পারছোনা যে মা গেছেন ডাক্তারখানায়। বাবার শরীর অসুস্থ, মনের উত্তেজনায় তাঁকেও তিনি টেনে নিয়ে গেছেন।

গোপী ॥ কী হ'য়েছে তাতে ?

বিনোদ ॥ কী হ'য়েছে তাতে ? বাবা মা ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে এলে কী হবে আমার ? বলো ! কী হবে ? তুমি চলোনা—আমায় নিয়ে তোমাদের বাড়ী ? তোমার স্ত্রী আছে তো কী হ'য়েছে ? তোমাদের তো ঝিয়েরও দরকার। দাসীবৃত্তি করবো আমি !

গোপী ॥ না-না। তুমি ক্ষেপেছ না পাগল হ'য়েছ ! তোমার মতো সুন্দরী মেয়েকে ঝি সাজিয়ে নিয়ে গেলে সেই খাণ্ডারনী আমার আর হাড় চামড়া আস্ত রাখবেনা। তাছাড়া, তুমি কেবল আমাকেই বলছো, দোষ কি খালি আমারই ? তুমি হোটেলে কাজ করতে। সেখানে আরো লোকজন যাওয়া আসা করতো,—কী হ'য়েছে না হ'য়েছে—

বিনোদ ॥ চুপ করো ! লজ্জা করছেনা এসব কথা বলতে ? সকাল ১১টা থেকে রাত্তির ৮টা পর্যন্ত রোজ তুমি যক্ষের মতো আমাকে আগলে রাখতে ! বলো—রাখনি !

গোপী ॥ রাধে, রাধে ! রেখেছি। কিন্তু তার মানে যদি এই হয়, তাহ'লে তো নাচার !

বিনোদ ॥ হ্যাঁ, তার মানে এই হয়। এর আর অন্য মানে হয় না। কতবার তোমাকে বলেছি যে আমি গরীবের মেয়ে, টাকা নইলে আমার সংসার চলবেনা। বাবা মার কাছে মিথ্যে কথা বলেছি, যে আমি টেলিফোনে কাজ করি। [কেঁদে ফেললো] আমি রোজগার না করলে আমার বাবা মা খেতেও পাবে না। তুমি আমাকে টাকার লোভ দেখিয়ে—এই পথে টেনে নিয়ে এনেছ। আজ তুমি স্বচ্ছন্দে বলছো—আমি কিছু জানি না।

গোপী ॥ না-না, আমি তা বলছিনা। জানবোনা কেন ? আমি বলছি যে এ নিয়ে হৈ চৈ না ক'রে—যদি গোপনে দু দশ টাকা খরচ ক'রে—

বিনোদ ॥ লাম্পট্যের সময় এহিসেবটা মনে থাকে না, না ? আজ তোমাকে চিঠি লিখে ডেকে আনাতে হয়। আর তুমি এসে টাকা আনা পাইয়ের হিসেব কষছো !

গোপী ॥ বিনোদ ! আমি—

বিনোদ ॥ যাও, যাও এখান থেকে। আমি রেস্তোঁরায় কাজ করতাম। কুৎসিত প্রস্তাব—ঠাট্টা টিট্‌কিরী আমাকে অনেক শুনতে হ'য়েছে। কিন্তু তোমার মতো এত প্রলোভন আমায় কেউ দেখায়নি। তখন যদি

ঘৃণাক্ষরেও জানতাম যে এত নীচ তুমি,—তাহ'লে আমি,—যাও-যাও এখান থেকে। চলে যাও। আর কখনো আমার সামনে এসোনা।,

গোপী ॥ আহা! বিনোদ! রাগ করছো কেন?

বিনোদ ॥ [হঠাৎ মুখে তুলে বিকট চীৎকার ক'রে] যা—ও। পথের কুকুর কোথাকার!

[গোপীকান্ত পেছন ফেরার সংগে সংগে হাতের কাছের এলুমিনিয়ামের গেলাসটা তুলে তার দিকে ছুঁড়ে মারলো বিনোদিনী। গোপীকান্ত পালিয়ে গেল। বিনোদ হু হু ক'রে কেঁদে উঠলো। জানোয়ারের মত অব্যক্ত চাপা কান্না। সে কান্নার কোন ভাব নেই, ভাষা নেই। হঠাৎ দরজা দিয়ে তার মাকে প্রবেশ করতে দেখে সে আবার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজলো। দরজা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন অপর্ণা। স্বামীর হাত ধরে উঠানে নিয়ে এলেন। স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে জগৎ ধীরে ধীরে হেঁটে এসে দাওয়ায় বসলেন। তারপর বাঁশের খুঁটির গায়ে মাথাটা রাখলেন। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন অপর্ণা। এগিয়ে গিয়ে দাওয়ার কোণায় কুঁজোয় হাত দিয়ে গেলাসের খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন, যে গেলাসটা পড়ে আছে উঠানে এক কোণে। গেলাস নিয়ে এক গেলাস জল তিনি ঢক্ ঢক্ ক'রে খেয়ে এগিয়ে এলেন মেয়ের কাছে। তারপর আস্তে আস্তে অথচ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বললেন—]

অপর্ণা ॥ আমাদের আশংকা ঠিক। ডাক্তারও তাই বললেন। অর্থের দায়ে মেয়েকে বাইরে বেরোবার অনুমতি দিলে,—যে মেয়ে তার বংশের মান মর্যাদা বজায় রেখে উপার্জন ক'রে আনতে পারে না,—তার বাঁচা উচিত, না মরা উচিত, কথাটা একবার ভেবে দেখো। [একটু থেমে] ছি-ছিছিঃ, বরাবর তুমি হোটেলে কাজ করেছ, অথচ বার বার বলেছ—যে টেলিফোন গার্লের কাজ করি—! আজ? আজ কী হ'ল? কোথায় গেল তোমার মিথ্যে কথা বলা, কোথায় গেল তোমার টেলিফোনের চাকরী! [থেমে] আমরা গরীব, আমরা কোনদিন খেতে পাই, কোনদিন পাইনে।—অথচ যে পয়সা তুই এনে দিয়েছিস, তাই দিয়ে প্রতিদিন আমরা অন্নের গ্রাস মুখে তুলেছি। যাকগে। আমার একটা কথা মন দিয়ে শোন্!

জগৎ ॥ অপর্ণা! কী বলছো ওকে?

অপর্ণা ॥ চুপ করো তুমি। মনে রেখো আমি ওর মা। তোমার চাইতে কোন অংশে আমি ওকে কম ভালবাসিনা। কিন্তু কী করবো বলো, উপায় নেই। এর পরে পাড়ার লোক জানবে, লোক জানাজানি হবে, যা-ও দুটো খেতে

পাচ্ছি, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। [একটু থেমে] বিনোদ! কাঁদিস পরে! যা বলছি—শোন্! তুই এখনি আজই এবাড়ী থেকে চলে যা।

[ভয়ে বিনোদ মুখে তুলে মায়ের দিকে চাইল।]

বিনোদ ॥ [অস্ফুট] মা! কোথায় যাব মা!

অপর্ণা ॥ যারা তোমার এই অবস্থার জন্য দায়ী, তাদের কাছে যাও। সেখানে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করোগে। [হঠাৎ কেঁদে ফেললেন] আমি বলতামনা, আমি কক্খনো একথা তোকে বলতামনা, যদি তোর বাবার একটা পয়সা আনবার ক্ষমতাও থাকতো। কিন্তু সে ক্ষমতা যখন নেই, তখন প্রতিবেশীর কাছে মাথা হেঁট ক'রে থাকাই ভাল। তোর এই পয়সা খাওয়ার চাইতে তাদের কাছে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া অনেক সম্মানের। যা-যা ওঠ্! লোক জানাজানি হবার আগে চলে যা এবাড়ী থেকে।

[কিছুক্ষণ মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন দেখলো বিনোদিনী। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দাঁড়ালো।]

অপর্ণা ॥ ঘরে তোর সুটকেশ আমি গুছিয়ে রেখেছি। নিয়ে চলে যা। তোর শেষ আনা ত্রিশটা টাকাও আছে তার মধ্যে।

জগৎ ॥ অপর্ণা! কী করছো তুমি?

অপর্ণা ॥ তাই নিয়ে চলে যা!

[বিনোদ কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে গেল। সুটকেশ নিয়ে এল বাইরে। তারপর কাঁদতে কাঁদতেই বাপমায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় বিদ্যাবাগীশ ঢুকলেন। বিনোদ পড়লো তাঁর সামনে। তিনি সন্দিগ্ধ চোখে একবার উঠানের পরিস্থিতিটা দেখে নিলেন। তারপর বললেন—]

বিদ্যা ॥ কই যাচ্?

[বিনোদ আরো জোরে কেঁদে উঠলো। বিদ্যাবাগীশ হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত চেপে ধরলেন। তারপর বললেন—)

বিদ্যা ॥ তোমরাও দেখি এক্কারে বোবার লাখান চাইয়া রইছ! হইছে কী? কই যায় বিনোদ? কথা কয়না! অপাই!

অপর্ণা ॥ [মাথার কাপড়টা ঈষৎ টেনে দিয়ে] বিনোদ আমাগো কইছিলো যে টেলিফোনে কাম করে।

বিদ্যা ॥ হ! হেইয়্যাই তো জানতাম।

অপর্ণা ॥ আসলে ও কাম করতো এক হোটেলে। হেইখান্ থিক্য্যা টাকা আনতো, হেইয়্যা তো আমরা জানতামনা।

বিদ্যা ॥ এখন জান্‌ছো? তো হইছে কী?

অপর্ণা ॥ কয়েকদিন থিক্য়্যাই কইথে লাগছে—শরীরটা ভাল না। ডাক্তার আই ছিল। আর দেইখ্যা কইয়্যা গেল—আপনারা আসেন আমার ডিস্পেনসারীতে!

বিদ্যা ॥ গেছিল্য়্যা।

জগৎ ॥ হ, গেছিল্য়াম।

বিদ্যা ॥ কী কয় ডাক্তার?

অপর্ণা ॥ [মাথা নীচু ক'রে কেঁদে ফেললো] ডাক্তার কয়—আমার মাথা। কইলো—অসুখ বিসুখ কিছুনা। আসলে—

[বলতে পারলো না। বিদ্যাবাগীশ আবার একবার দেখলেন সবাইকে। তারপর বললেন—]

বিদ্যা ॥ বোঝলাম। তা' অখন কী করতে লাগছো?

অপর্ণা ॥ অরে কইছি বারীর থিক্য়্যা যাইতে।

বিদ্যা ॥ কই যাইবো?

অপর্ণা ॥ যাউক গিয়্যা যেখানে ইচ্ছা। অরে বারীত্ রাইখ্যা—আমাগো মান সম্মান তো জলাঞ্জলি দিতে পারুমনা।

বিদ্যা ॥ মান সম্মান? আছে নাকি অখনো অবশিষ্ট? বারী গেছে, ঘর গেছে, জমি জমা গেছে,—হেইখানে আমাগো মাইয়াগো ইজ্জৎ গেছে, পশ্চিম বংগে আইস্যা হেড্মাষ্টার জগৎ স্যান ব্যাড়া বাঁধতে লাগছে, তস্যপত্নী কাপড় সিয়াইয়া লইয়া পরতেছে। অখনো মান, অখনো সম্মান? আরে মূর্খ। হেই মান সম্মানের স্বপন দেইখ্যা, এই ছোট ছাতুর সরাখানরে ভাঙতে লাগছো ক্যান? ছিঃ!

জগৎ ॥ অপর্ণা কইথেছে যে বংশের রক্তটা তো খারাপ হয়্যা গেছে—

বিদ্যা ॥ বাংলা দেশের বুকের উপর দিয়্যা পাচশো বার গেছে বিদেশী আক্রমণ। আসছে মগ, হুণ, পাঠান, মোগল, বর্গী, ইংরাজ। এক একবার তারা আসছে, আর টান দিয়া বাইর করছে আমাগো মাইয়াগো, বৌঝি গো! হেড্মাষ্টারী করছো, আর এইডা বোঝনা যে জাতির কলংক নিয়্যা ইতিহাস চুপ কইর‍্যা গেছে! কিছু কয় নাই, পাছে গোটা জাতিটাই ধর্মভ্রষ্ট হয়। এট্টা পোলাপান মাইয়া তোমার রক্ত খারাপ করছে, না—পাচ পুরুষ আগে তোমার নিজের রক্ত খারাপ কইর‍্যা গেছে, হেই কথা ভাবো। বিনোদ বাইরে গেছিলো ক্যান? ফূর্তি করবো বইল্যা, না, বুরা বাপ মারে খাওয়াইবো বইল্যা? আয়রে দিদি।

বিনোদ ॥ কই যামু দাদু!

বিদ্যা ॥ আমার ঘরে—বুরা বুরীর কাছে। আইজই খবর আসছে—গবরমেণ্ট পঞ্চাশ টাকা কইরা বৃত্তি দিবো আমারে। খাওনের অভাব তো হইবে না? আরে আমি মনুসংহিতা পড়ছি, ভৃগু পড়ছি, পরাশর পড়ছি। শাস্ত্রের সাতটা পরীক্ষা দিয়া সপ্ততীর্থ হইছি,—আমি তরে কই, তুই দোষী না। আমি বিধান দিতে আছি, তুই নির্দোষ। আয়! আয় আমার লগে।

[বিনোদের হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন জগৎ সেন আর অপর্ণা সেন। সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে খুব লক্ষ্য করলে চোখের জলের রেখা চোখে পড়বে দর্শকের। সন্ধ্যার শাঁখ বাজলো দূরে তিনবার···ধীরে ধীরে নাটকের যবনিকা নেমে এল]

অপচয়

দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়

[রাত্রির প্রথম প্রহর। একটি টালির ঘরের পেছন দিক্‌কার দাওয়া। মাঝখানে ঘরে যাবার দরজা। দু'পাশে দরমার বেড়া। বেড়ার সঙ্গে খাড়া করা আলপনা দেওয়া একটা পিঁড়ে। এখানে সেখানে ছড়ান দু'একটা বাসন-কোসন দেখা যাচ্ছে। দাওয়ায় হ্যারিকেন জ্বলছে। দরমার বেড়ার ছিদ্র দিয়ে পেছনের উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে একটি মধ্যবয়সী বিধবা ও জনৈক কৃশকায় যুবক। বিধবা স্ত্রীলোকটিকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। যুবকটির মুখ গম্ভীর। নেপথ্যে মাঝে মাঝে স্ত্রী-পুরুষের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।]

সুশীলা ॥ কও কি মিলন! সব্বনাশের কতা না! বিয়ার সমস্ত আয়োজন সম্পূন্ন। চাইর দণ্ড বাদে লগ্ন! জাইত যাওনের কাণ্ড অইল যে! তুমি কি পরামর্শ দেও?

মিলন ॥ আমি আর কি কমু, মাসীমা! আপনে নিজেই তো সম্বন্দ ঠিক করছিলেন।

সুশীলা ॥ হ, আমিই তো করছিলাম। এই রকম যে অইব কে বাবছিল! বিক্ষা কইরা বিয়ার যোগাড় কল্লাম আমি···আমারে এই বা'বে ডুবাইল! ছেইলার মার কতাবাত্তা শুইনা তো কিছু বোজা গেল না! মুখে তো একেবারে মদু। তার মদ্যে যে এতো বিষ আছিল, আমি কি কইরা বুজুম? [খানিকক্ষণ নীরবতার পর] ছেইলা আসে নাই তা তুমি বালো কইরা খোঁজ নিছ?

মিলন ॥ হ, মাসীমা। পাড়াপড়শী দুই একজনেরে তো জিগাইলাম। তারাও কইল আসে নাই।

সুশীলা ॥ না লুকাইয়া রাখছে ঠিক কি!

মিলন ॥ কি কইরা কমু! ছেইলার মা তো কইল, রিপ্লাই টেলিগ্রাম করছে, তারও কোন উত্তর আসে নাই।

সুশীলা ॥ [বিরক্তিসূচক ভাবে] মিছা কতা মিছা কতা, সব মিছা কতা। ছেইলা সরকারী চাকরি করে, তাও মিছা কতা। নাইলে মা বিয়া ঠিক কল্ল আর ছেইলা আইল না! তাও কি সম্বব! অরা এই কইরাই খায়। পঞ্চাশ টাকা পাইল, পঞ্চাশ টাকাই লাব। আমারে আবার কইছিল একশ টাকা আগাম দিতে। দিলে তো তাও যাইত। এই হারামজাদাগো জেলে দেওন উচিত।

মিলন ॥ যে অবস্থায় ছ্যাখলাম তার থেইকা জেল খারাপ কি! [কাশি]

সুশীলা ॥ কইল, গবর্ণমেণ্ট কলোনী স্বীকার কইরা নেয় নাই, তাই গ'রদরজা বা'ল কইরা তোলে নাই। অখন তো মনে অয় সবৈ ফাঁকি। ছ্যাশগাও ছাইরা আইয়া কারোরে তো কারো চিননের উপায় নাই। ছোট-বড় সাত্থু-চোর বানের জলের মতন সব একাকার অইয়া গেছে। আর মানুষেরে যদি মানুষ বিশ্বাস না করতে পারে তবে মানুষ বাচব কি কইরা? জংলী জানোয়ারের মতো একটা আরেকটারে খাইব নাকি!

মিলন ॥ তব, একটা বিয়ার কতাবার্তা ঠিক করনের আগে আর একটু খোজ-খবর নেওন উচিত আছিল।

সুশীলা ॥ কি করুম! আমার কি মাতার ঠিক আছে? পরের দয়ায় বাইচা আছি। কোনো মাসে টাকা আইল, কোনো মাসে আইল না। চাইরটা প্যাট চালাই কি কইরা কও দেখি। কত লোকের আতে-পায়ে দল্লাম একটু খোজখবর নিতে। কে কার কতা বা'বে কও তো? আর সকলেই তো নিজের দান্দায় ব্যস্ত, কারে কি কমু! বা'বলাম বড়টারে যদি পার করতে পারি, একটা তো কমলো। বিপদে-আপদে আমারে ছ্যাখনের একটা লোকও তো অইব। আর অতবড় মাইয়া—চখের সামনে এই আগুন লইয়া আমি কি কইরা থাকি? তাই এই সম্বন্দটার খোজ পাইয়া নিজে গিয়া দেইখা আইলাম। তা আমার পোড়াকপালে যে এই রকম অইব আমি কি কইরা বুজুম? সবৈ আমার কপাল!

[হতাশভাবে আবার বসে পড়ে]

মিলন ॥ কি আর করন যাইব! যা অওনের তো অইল। আবার একটা দেইখা-শুইনা পরে··· [কাশি]

সুশীলা ॥ না না, তা কি অয়! লোকেরে আমি মুখ ছ্যাখামু কি কইরা? আর এই মাইয়ার কি বিয়া অইব? [নেপথ্যে কলরব বাড়ে] তুমি যা অয় একটা কিছু বাতলাও। আমারে লজ্জার আত থেইকা রক্ষা করো।

[দাওয়ায় উঠে দরজায় শিকলটা এঁটে দেয়। আবার ধীরে ধীরে উঠোনে নেমে আসে]

কি ? চুপ কইরা রইলা ক্যান্ ?

মিলন ॥ আমি কি করতে পারি মাসীমা !

সুশীলা ॥ করতে একটা কিছু অইবই। আইজ রাইতেই বিয়া দিতে অইব।

মিলন ॥ আপনে কি পাগল অইলেন, মাসীমা ?

সুশীলা ॥ হ, আমি পাগলই অইছি। ওই পোড়াকপালির লেইগা আমারে পাগলই অইতে অইব। দিয়া গেছে, আমারে বড় সম্পদ দিয়া গেছে ! তিন তিনটা মাইয়ার বোজা আমার গাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজে চইলা গেছে। বড় বা'লবাসতো কিনা আমারে—তাই আমার এই শাস্তি…

[কেঁদে ফেলে]

মিলন ॥ মাসীমা, ঝোকের মাতায় কিছু করবেন না। আমি কতা দিলাম, সন্ধ্যার লেইগা আমি বা'ল পাত্র খুজুম।

সুশীলা ॥ খুজুম না—অখনই খোজ ত্যাখ, আমাগো এইখানে কে আছে, কার লগে বিয়া দেওন যায়।

[ফটিকের প্রবেশ। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ]

ফটিক ॥ কি খুড়ীমা, বর কই ? বরের সঙ্গে যে অখনো দেখাই নাই !

[সুশীলা মিলনকে চোখে ইশারা করে]

সুশীলা ॥ তাইতো বাবা, বড় বা'বনার কতা অইল। অখন পজ্জন্ত আইল না !

ফটিক ॥ আইব তো শেষ পজ্জন্ত না, সবৈ ফাকি ?

সুশীলা ॥ কি জানি বাবা, কি কইরা কমু !

ফটিক ॥ বরেরে আনতে যাও নাই ক্যাও ?

[সুশীলা আবার মিলনকে চোখে ইশারা করে]

সুশীলা ॥ হ, গ্যাছে তো। অখন পজ্জন্ত যে ক্যান্ আইত্যাছে না…

ফটিক ॥ ত্যাখেন, অয়তো পদব্রজে রওনা অইছেন। লগ্ন কাটাইয়া আইবেন।

[মিলনের দিকে কটাক্ষপাত করে ভেতরের দিকে প্রস্থান]

সুশীলা ॥ জানে নাকি ?

মিলন ॥ ঠিক বুজা গেল না।

সুশীলা ॥ জানলে তো ওই সবের আগে পারায় গিয়া ডা'ক পিটাইয়া আইব। [খানিকক্ষণ নীরব থেকে] আইচ্ছা মিলন, ফটিকের লগে যদি বিয়া দেই ?

মিলন ॥ ফটিকের লগে ?

[সন্ধ্যা ভেতর থেকে জানালা দিয়ে চায় ও কান পেতে শোনে]

সুশীলা ॥ হ, মন্দ কি ? ফটিক তো দেখতে শুনতে বা'লই। আর চালাক-চতুরও। ল্যাখাপড়া বেশি না জানলেও একটা কিছু কইরা খাইতে পারবো। অরা বংশজ, আমরা কুলীন। তা অউক। এই রকম বিয়া তো অখন অয় ? তুমি কি কও ?

মিলন ॥ আপনে খুশি অইলে দিবেন। আমার এই সম্বন্ধে কোন মতামত নাই।

সুশীলা ॥ এইতো তুমি রাগের কতা কইলা।

মিলন ॥ [জোর করে হেসে] না না, আমার রাগের কি কারণ থাকতে পারে !

সুশীলা ॥ তোমরা রাগই করো আর যাই করো, এই ছাড়া উপায় নাই। আইচ্ছা, আমি ফটিক্‌রে ডাইকা আনি। [ভেতরের দিকে প্রস্থান।]

সন্ধ্যা ॥ [ঘরের ভেতর থেকে] মিলনদা, শোন।

[মিলন দাওয়ায় উঠে জানালার ধারে যায়। সন্ধ্যা তাকে কি বলতে থাকে। মিলন নিবিষ্ট মনে তা শোনে। ফটিক ও সুশীলার পুনঃ প্রবেশ।]

সুশীলা ॥ আমার কতা তুই রাখ্ বাবা,। ত'র দুইটা হাতে দইরা আমি তরে অনুরোদ করত্যাছি। এই বিপদ থেইকা আমারে তুই বাচা। আমারে তুই উদ্দার কর।

[ফটিক সুশীলার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নেয়]

ফটিক ॥ আপনে কি কন্, খুড়ীমা ! তা কি অয় ?

সুশীলা ॥ ক্যান্ অইব না ! সন্ধ্যা কি ত'র অযোগ্য ?

[মিলন দাওয়া থেকে নেমে আসে]

ফটিক ॥ না না, আমিই তার অযোগ্য, খুড়ীমা। আমারে দেখলে সে দশ আত দূর দিয়া চইলা যায়, অহংকারে তার মাটিতে পাও পড়ে না…

সুশীলা ॥ অই সমস্ত ছালিমাটি কতা ছাইড়া দে। ও পোলাপান, বোজেই বা কি ?

ফটিক ॥ খুব বোজে খুড়ীমা, খুব বোজে। আপনে যত অবুজ মনে করেন তত অবুজ না। কি কও মিলনদা ?

[মিলনের প্রতি কটাক্ষপাত করে ও বাঁকা ঠোঁটে হাসে। মিলন গম্ভীর হয়ে যায়।]

সুশীল ॥ বাবা, যদি কোনদিন কোন অপরাদ অইয়া থাকে, তুই ক্ষমা কর।

আমার মানকান বাচা। তর মা বাইচা থাকলে আমি গিয়া তার পাও জড়াইয়া দরতাম। তার কাছে বিক্ষা চাইয়া তরে আনতাম।

ফটিক ॥ কিন্তু বাবা তো আছেন···

সুশীলা ॥ ত'র বাবার অমত অইব না, জানি। সন্ধ্যারে তেনি বা'লবাসেন। তুই কতা দে। ত'র বাবার মত আমি আনুম।

ফটিক ॥ বেইশ, বাবা যদি মত দেন, অইব।

সুশীলা ॥ বাচালি বাবা, বাচালি। চল্ চল্, ত'র বাবার কাছে চল্। এই বিদবার অনুরোদ তেনি ঠেলতে পারবেন না। বাবা, মিলন তুমি সমস্ত আয়োজন কইরা রাখো। লগ্নের আর বেশি দেরি নাই। আমি যামু আর আমু।

[ফটিককে নিয়ে সুশীলার প্রস্থান। যাবার সময় ফটিক জানালার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি ফেলে যায়]

মিলন ॥ আমার এইখানে না থাকনই বা'ল। [প্রস্থানোদ্যত]

সন্ধ্যা ॥ [জানালার পেছন থেকে] মিলনদা [মিলন ফিরে চায়।] এই দিকে আস। [মিলন দাওয়ার ওপর যায়] ছিকলটা খুইলা দেও দেখি। [মিলন শিকলটা খুলে দেয়। সন্ধ্যা বেরিয়ে আসে ও আবার শিকলটা লাগায়] একটা কাজ করতে পারো ?

মিলন ॥ কি ?

সন্ধ্যা ॥ আমারে কইলকাতায় রাইখা আইতে পারো ?

মিলন ॥ কবে ?

সন্ধ্যা ॥ অখনই। ফিরনের গাড়ী না পাও, আইজ কইলকাতায়ই থাকবা।

মিলন ॥ কইলকাতায় আমার থাকনের জায়গা নাই।

সন্ধ্যা ॥ আমার মাসীর বাড়ীতেই থাকবা।

মিলন ॥ ত'র তো আরেকটু বাদেই বিয়া অইব !

সন্ধ্যা ॥ না, এই বিয়া অইব না।

মিলন ॥ সে কিরে ! ত'র মা গ্যালেন ফটিকের বাবার অনুমতি আনতে !

সন্ধ্যা ॥ তার বাবার অনুমতি আনলেও অইব না।

মিলন ॥ পাগলামি করিস না।

সন্ধ্যা ॥ পাগলামি না, মিলনদা। অই চোর লম্পটটারে আমি বিয়া করতে পারুম না।

মিলন ॥ চোর ?···কে না চুরি করে ? বড় বড় কর্তারাই চুরি করে। আর লম্পটরাই তো আজকাল বড় পিড়ি পায়।

সন্ধ্যা ॥ ঠাট্টা রাখো। তুমি আমারে লইয়া যাইবা কিনা ?

মিলন ॥ না। তুই অখন আমার লগে গ্যালে লোকে কইব কি ! ক্যালেংকারী করিস না।

সন্ধ্যা ॥ আরো বড় ক্যালেংকারী অইব, মিলনদা। তুমি না লইয়া গ্যালে সকলে মিল্যা জোর কইরা আমারে ওই পাজীটার লগে বিয়া দিব। ছিঃ ছিঃ ! লোকে কইব চোরের বউ। তুমি তা সহ্য করতে পারবা ?

মিলন ॥ [বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] সন্ধ্যা, তুই অমন কইরা কইস্ না। না না, আমি কি করুম ? আমার কিছু করনের নাই···

সন্ধ্যা ॥ মিলনদা, আমার মুখের দিকে চাও। তোমার পায়ে পড়ি, আমারে তুমি কইলকাতায় লইয়া চলো।

মিলন ॥ না না, সন্ধ্যা, আমারে তুই এমন অনুরোধ করিস না। আমি পারুম না···মাইয়া চোর অপবাদ নিতে পারুম না।···

[দ্রুত প্রস্থান। সন্ধ্যা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পরে ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে দোর বন্ধ করে দেয়। মিলন ধীর পদক্ষেপে পুনঃ প্রবেশ করে। পা টিপে টিপে দাওয়ায় উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়]

মিলন ॥ [চাপা গলায়] সন্ধ্যা ! সন্ধ্যা !

[সন্ধ্যা জানালার ধারে আসে]

আয় সন্ধ্যা, তরে আমি লইয়া যামু।

সন্ধ্যা ॥ [ভেতর থেকে] লইয়া যাইবা ?

মিলন ॥ হ হ, লইয়া যামু। তুই যেইখানে যাইতে চাবি সেইখানেই লইয়া যামু। আরেকবার নাইলে জেলে যামু। একবার গ্যাছিলাম স্বদেশী কইরা, অরেকবার যামু মাইয়া চুরি কইরা। আয় আয়, জলদি আয়।

সন্ধ্যা ॥ একটু সবুর করো মিলনদা, একটু সবুর করো। আমি যাইত্যাছি।

[সন্ধ্যা জানালার ধার থেকে চলে যায়। মিলন মন্থরপদে উঠোনে নেমে অসে ও চিন্তাকুল ভাবে পায়চারি করতে থাকে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটে। দরজা খুলে সন্ধ্যা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ও অকস্মাৎ মিলনের গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। মিলন বিস্মিত হয়ে যায়]

মিলন ॥ এইটা কি কল্লি সন্ধ্যা, এইটা কি কল্লি !

সন্ধ্যা ॥ ঠিকৈ করছি, মিলনদা। আমি কিছু বু'ল করি নাই।

মিলন ॥ না না, তা অয়না···তা অয়না···

সন্ধ্যা ॥ ক্যান্ অয়না ? তুমি বি'ন্ন জাইতের বইলা ? গরীবগো কি আলাদা-আলাদা জাইত আছে নাকি, মিলনদা ? তাগো অ্যাকৈ জাইত। তারা গরীব।

মিলন ॥ সেই কতা না···সেই কতা না। আমি যে হকার। ট্রেনে ট্রেনে লজেন্স ফিরি কইরা প্যাট চালাই।

সন্ধ্যা ॥ তব তুমি সৎপথে থাইকা রোজগার করো।

মিলন ॥ অসৎ পথে যাওনের সাহস নাই, তাই করি।

সন্ধ্যা ॥ ত্যামন সাহস য্যান্ তোমার কোনদিনই না অয়।

মিলন ॥ তাইলে সারাজীবন দুঃখভোগই কইরা যাইতে অইব।

সন্ধ্যা ॥ তাও বা'ল মিলনদা, তাও বা'ল।

মিলন ॥ হ, বা'লই তো কবি। এত দুঃখে থাইকাও ত'র দুঃখের বিলাসিতা গ্যাল না রে!

সন্ধ্যা ॥ সুখ কারে কয় তাতো জানিনা, মিলনদা। তুমি যাগো সুখী বা'ব, সত্যৈ কি তারা সুখী ? পরেরটা চুরি কইরা আনলে, পরের ঠকাইয়া খাইলে কি সুখ অয় ? নিজেগো বিবেকেরেও তারা চাবাইয়া চাবাইয়া খায়। বুনো ওল খাওয়া গলার মতো তাগো অন্তরটা খালি কুটকুট করে।

মিলন ॥ খুব বড় বড় কতা শিখছস্ তো ?

সন্ধ্যা ॥ এইগুলি তো তোমারৈ শিখান কতা।

মিলন ॥ বা'ল করি নাই, বা'ল করি নাই। এই সমস্ত কতা শিখাইছিলাম বইলাইতো তুই আইজ আমারে এই বা'বে বিপদে ফেললি।···না না, আমি পারুম না, আমি পারুম না···

সন্ধ্যা ॥ তুমি যদি আমারে না নেও, আমি আত্মহত্যা করুম।

মিলন ॥ আত্মহত্যা! আত্মহত্যার বাকী রাখলি কি হতবাগী ? যে দুই বেলা প্যাট বইরা খাইতে পায় না, পরনের কাপড় জোটে না যার, ঘোড়ার আস্তাবলে থাকে যে, তুই তার গলায় মালা পরাইলি!

[আবার মিলনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে এবং দুচোখ সজল হয়ে ওঠে]

সন্ধ্যা ॥ জানি মিলনদা, তোমার দুঃখ কোন্খানে। তোমারও কত সখ আছিল, গ'র বান্দনের কত আশা আছিল···

মিলন ॥ না না, কিছু আছিল নারে আমার, কিছু আছিল না···[কাশি]

সন্ধ্যা ॥ আমাগো এই শুভক্ষণটারে তুমি এমন কইরা নষ্ট কইরা দিও না, মিলনদা। দুইজনে আমরা গ'র বান্দুম, সুখের না অইলেও শান্তির গ'র···

মিলন ॥ না না, এই সমস্ত কতা তুই আমারে হুনাইস না। স্বপ্ন দেইখা কি অইব ?

সন্ধ্যা ॥ স্বপ্ন আছে বইলাই তো মানুষ বাইচা থাকে, মিলনদা।

মিলন ॥ [আবেগে] তুই তো জানসনারে, অবা'বের আগুনে মানুষের স্বপ্ন কিবা'বে পুইড়া ছাই অইয়া যায়···একটু চিহ্নও আর থাকে না।

[আবার মিলনের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে এবং দু'চোখ সজল হয়ে ওঠে।]

সন্ধ্যা ॥ তুমি বাইব না। আমি রোজগার করুম !

মিলন ॥ [কিঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করে] রোজগার করন অ্যাতৈ সোজা ! লোক হিমশিম খাইয়া যাইতেছে। তুই কইলি আর অম্নি রোজগার অইল !

সন্ধ্যা ॥ আমিও লজেন্স বেচুম।

মিলন ॥ তুই তো কইলকাতায় যাওয়া আসা করস। চখে পড়ে না ত'র ? একজন ? খাইতে না পাইয়া আইজ কতলোক লজেন্স বেচা দরছে। কয় পয়সা কামাই করে তারা ?

সন্ধ্যা ॥ না অয় অন্য কিছু করুম ! তুমি খাটতে পারলে আমিও খাটতে পারুম। আমার তো গতর আছে। মনের বেড়ি যখন বা'ঙ্গতে পারছি তখন পায়ের বেড়িও বা'ঙ্গতে পারুম, মিলনদা। চলো, আর দেরী কইর না।

[মিলনের হাত ধরে। প্রবেশ করে সুশীলা ও ফটিক। ফটিকের ফিটফাট পোষাক। দু'জনেই অবাক হয়ে যায়]

ফটিক ॥ [উত্তেজিত ভাবে] জানতাম, আমি এই সমস্ত জানতাম। আমারে ডাইকা আইনা খামাকা অপমান কল্লেন ক্যান্, খুড়ীমা। বর কি সাদে আসে নাই ? এই সমস্ত জাইনা শুইনা আসে কি কইরা !

[মিলন ফটিকের দিকে এগিয়ে যায়]

মিলন ॥ ফটিক, আমার একটা কতার জবাব দিবি ?

ফটিক ॥ দেওনের মতো অইলে দিমু।

মিলন ॥ বরের বাড়ি তুই কয়দিন আগে গেছিলি ক্যান্ ?

ফটিক ॥ কে কইল ?

মিলন ॥ আমি জানি। তুইই বাংচি দিছস এই সম্বন্দের।

ফটিক ॥ মিছা কতা, একেবারে মিছা কতা। আমি বাংচি দিতে যামু ক্যান ? আমার স্বার্থ ?

মিলন ॥ ত'র স্বার্থ তুইই জানস। তবে স্বার্থ ছাড়া যে তুই এক পাওও বাড়াসনা, তা আমি জানি। সন্ধ্যারে বিয়া করতে ইচ্ছা অইছিল, সোজা পথে করলেই অইত।

ফটিক ॥ উঃ! সন্ধ্যারে বিয়া করনের লেইগা তো আমার একেবারে মাথা-ব্যথা অইছিল। খুড়ীমা কাইন্দাকাইটা দল্লেন, তাই না রাজী অইছিলাম। নাইলে অমন মাইয়া গাটে-পথে গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়।

মিলন ॥ কিন্তু সন্ধ্যার কাছে কুপ্রস্তাব করতে তো মাথাব্যথা অইছিল?

ফটিক ॥ তোমার মতো আমি নষ্টামি কইরা বেড়াই না।

মিলন ॥ মুখ সামলাইয়া কথা কইস, ফটিক।

ফটিক ॥ অইছে অইছে। বেশি কতা কইও না। ট্রেণে ট্রেণে হকারি করো আর খালি মাইয়াগো পিছনে গো'র। সন্ধ্যারে তো তুমিই নষ্ট করছ।

[মিলন ছুটে গিয়ে বাঁহাতে ফটিকের জামার কলার ধরে ও ডান হাত তোলে।]

মিলন ॥ এক থাপ্পড়ে ত'র দাঁত ফালাইয়া দিমু কিন্তু।

ফটিক ॥ ছোটলোকের লগে থাকলে স্ববাবও ছোটলোকের মতোই অয়।

মিলন ॥ ত'র বদ্রলোকী ইতরামী আমি আইজ বাইর কইরা দিমু।

[মারতে উদ্যত হয়। সন্ধ্যা ছুটে গিয়ে মিলনকে বাধা দেয়। মিলন কাশতে থাকে]

সন্ধ্যা। ছাইড়া দেও, মিলনদা। মশা মাইয়া আত কালা কইরা লাভ কি!

[মিলন ফটিককে ছেড়ে দেয়।]

ফটিক ॥ খুড়ীমা, আপনে ডাইকা আইনা আমারে অপমান কল্লেন! আপনেরেও আমি ছাইড়া দিমুনা।

[ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফটিকের প্রস্থান]

সুশীলা ॥ ত'র মনে এই আছিল, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা ॥ কিছু খারাপ কাজ তো করি নাই, মা। তুমি তো আমারে বিয়াই দিতে চাইছিলা।

সুশীলা ॥ তা বইলা একটা বিন্ন জাইতের পোলার লগে? কুলে কালি দিলিনা তুই!

সন্ধ্যা ॥ দ্যাশ বা'ঙ্গলো, বাড়ি বা'ঙ্গলো, কপাল বা'ঙ্গলো—তব আমাগো কুল বা'ঙ্গলো না, মা! তোমারে তো জাইতকুল দেইখাই বিয়া দিছিল—জীবনে সুখ পাইছ কোনদিন?

সুশীলা ॥ এত বড় বেহায়া অইছস তুই! ত'র মুখে এই সমস্ত কতা!

সন্ধ্যা ॥ তোমাগো পরিবর্তনের বয়স নাই, মা। কিন্তু আমাগো আছে।

জীবনটারে একবার যাচাই কইরা দেখতে চাই—দেখতে চাই বাচনের নতুন পথ আছে কিনা।

সুশীলা॥ বাচন! না মরণ? মর্ মর্ তুই, মরণদশায় যখন তরে পাইছে তখন মরণই বা'ল।···কিন্তু মিলন, তুমি আমার লগে এত বড় বিশ্বাস-ঘাতকতা কল্লা!

মিলন॥ [উত্তেজিত ভাবে] আমি কিছু করি নাই মাসীমা, আমি কিছু করি নাই···[কাশি]।

সুশীলা॥ না না, তোমরা ক্যাও কিছু কর নাই, ক্যাও কিছু কর নাই। আমার কপাল···আমার কপাল···আমার কপালে করছে···

[কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে দ্রুত পদে প্রস্থান]

সন্ধ্যা॥ চলো মিলনদা। ওই লম্পটটারে বিশ্বাস নাই। কি দিয়া কি কইরা বসব ঠিক কি? আমরা এইখান থেইকা চইলা যাই।

মিলন॥ না না, আমি পারুমনা সন্ধ্যা, আমি পারুমনা। আমারে তুই ক্ষমা কর।

সন্ধ্যা॥ ও! আইচ্ছা, ঠিক আছে। না পাল্লে আমিও তোমারে আর অনুরোদ করুম না।···তুমিও একটা কাপুরুষ।

মিলন॥ এত বড় গাইল তুই আমারে দিলি, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা॥ হ, দিলাম।···আমি মরুম না, বাচুম। তবে তোমাগো মতন কাপুরুষের কাছে বাচনের লেইগা কাঙালের মতো য্যান্ আমারে আর না কানতে অয়।

[অশ্রুসিক্ত চোখে সন্ধ্যার দ্রুত পদে ঘরের মধ্যে প্রস্থান।]

মিলন॥ [বেদনাহত কণ্ঠে] সন্ধ্যা, রাগ কল্লি না বাচলি। নইলে মরতি তুই, মরতি। [গলার মালাটা খুলে নাকের কাছে নিয়ে শোঁকে ও দুই গাল দিয়ে স্পর্শ করে] ত'র আতের এই মালা পাইয়াও ত'রে যে ক্যান্ আমি নিতে পাল্লাম না সেই কতা আমি তরে ক্যামন্ কইরা কই? ডাক্তার একটা ফুসফুসে দোষ পাইছে—আরেকটাই কি বাচব? এই কয় বচ্ছরে বুকের বিতরটা আমার জাজরা অইয়া গেছেরে, সন্ধ্যা, জাজরা অইয়া গেছে। জাইনা-শুইনা আমি তরে মরণের পথে লইয়া যামু কি কইরা?···আমি কাপুরুষ?—হ হ, জন্মজন্ম য্যান্ আমি অ্যামন্ কাপুরুষ অইয়াই থাকি, তব তুই বাচ সন্ধ্যা, তব তুই বাচ।

[কাশতে কাশতে সজল চোখে প্রস্থান।]

এক সন্ধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

[নিমতলা স্ট্রীটে বিহারীলাল চক্রবর্তীর বাড়ির ছাত। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ত্রয়োদশী কিংবা চতুর্দশী তিথি—প্রায় সম্পূর্ণ চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে—জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে ছাতটি। দুখানি শীতলপাটি পাতা রয়েছে—একটির উপর মোটা তাকিয়ায় আধশোয়া ভাবে বসে আছেন বিহারীলাল ; দাড়িগোঁফ কামানো পরিপুষ্ট নধর শরীর—বছর বিয়াল্লিশ বয়েস হবে। খালি গা—শাদা মোটা পৈতাটি বুকের ওপর জ্যোৎস্নায় ঝক ঝক করে জ্বলছে। তাকিয়ার পাশে দু-গাছা বেল ফুলের মালা।
আর একখানা শীতলপাটির উপর গুটি তিনেক অল্পবয়েসী ছেলে বসে আছে। এরা সবাই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র]

বিহারী ॥ [মুগ্ধভাবে আবৃত্তি করছেন]

যশ্চাপ্সরোবিভ্রমমণ্ডনানাং
সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্তি।
বলাহকচ্ছেদবিভক্তরাগাম্
অকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্
আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং
ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে
শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ ॥

একটি ছাত্র ॥ হিমালয় আপনার খুব ভালো লাগে—না ?

বিহারী ॥ আশ্চর্য মনে হয়। যেন বিশাল জটা মেলে দিয়ে শঙ্কর ধ্যানে বসে আছেন। উপবীতের মত নেমে আসছে জাহ্নবীর ধারা—মাথার ওপর দিয়ে মেঘেরা ভেসে চলেছে দেবধূপের মত অনন্তকাল ধরে মহাসমাধিতে মগ্ন হয়ে আছেন দেবাদিদেব—অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্!

দ্বিতীয় ছাত্র ॥ কিন্তু আমাদের পণ্ডিতমশাই সেদিন বলছিলেন, কেবল অষ্টম-নবম-দশম সর্গই নয়—সমগ্র 'কুমারসম্ভব' কাব্যই রুচিহীন। এমন কি উমার রূপ বর্ণনাতেও মহাকবি কালিদাস সংযম রক্ষা করতে পারেন নি। বিশ্বনাথ যে বলেছেন—

বিহারী ॥ [ভ্রূকুটি করলেন] তোমাদের মল্লিনাথ-বিশ্বনাথের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। কাব্যের পণ্ডিতী ব্যাখ্যা আমার বোধগম্য হয় না। তত্ত্বকথা শিখতে চাও—'যোগবাশিষ্ঠ' পড় গে। আবার কাব্যের ছলে যদি ব্যাকরণ শেখার ইচ্ছা থাকে—তা হলে সেজন্য তো 'ভট্টিই' রয়েছে। ও-সব আমার কাছে কেন?

দ্বিতীয় ছাত্র ॥ [অপ্রতিভ ভাবে] না—না, তা বলি নি। আমরা আপনার কাছে কাব্যের রসাস্বাদন করতেই আসি, পণ্ডিতী ভাষ্য শুনতে নয়। কথাটা আমার মনে হল, তাই—

বিহারী ॥ হাসপাতালে ছাত্রেরা মড়া কাটে—জানো তো?

তৃতীয় ছাত্র ॥ [ঘৃণায় নাসাকুঞ্চন করে] জানি। বৈদ্যবংশের ছেলে হয়ে মধু গুপ্ত—

বিহারী ॥ [বাধা দিয়ে] মধু গুপ্তের কথা থাক্। ভালো করেছে কি মন্দ করেছে সে আলোচনা আমাদের নয়। আমি বলছিলুম, মড়া কেটে অনেক জ্ঞানই হয়তো লাভ হয়—কিন্তু একটি মানুষ যে সুন্দর সেটা বোঝাবার জন্যে চিরেফেড়ে একাকার করবার দরকার হয় না। রূপ দেখবার মতো চোখ থাকলেই যথেষ্ট। আমি সেই রূপের দৃষ্টি দিয়েই কাব্যকে দেখি।

প্রথম ছাত্র ॥ সেই জন্যেই তো আপনার কাব্যপাঠ আমাদের এত ভালো লাগে। ব্যাখ্যার চোটে হাঁপিয়ে উঠে আপনার কাছে ছুটে আসি।

বিহারী ॥ শ্রুতবোধ পড়েছ?

দ্বিতীয় ছাত্র ॥ পড়েছি।

বিহারী ॥ ওই বই থেকে ছন্দের তত্ত্ব শিখতে চাও শেখো—কিন্তু আর একটা জিনিস লক্ষ্য করতে বলি। ওর প্রত্যেক শ্লোকে প্রেয়সী নারীকে যে সম্বোধনটি করা হয়েছে—আমার মনে হয় রসিক পাঠকের দৃষ্টি সেদিকেই পড়া উচিত। উপেন্দ্রবজ্রা-হরিণীপ্লুতার তত্ত্বের চাইতে ওগুলো অনেক বেশী মূল্যবান।

[ষোল বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ সিঁড়ির দিক থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন। নবীন

শালতরুর মত দীর্ঘ দীপ্ত কান্তি, গায়ে জরির কাজ করা কামিজ, পরনে পাজামা, পায়ে সাদা কটকী চটিজুতো। কাছাকাছি এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় মনে হল গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি যেন। বিহারীলাল অন্যমনস্ক ছিলেন—আগন্তুককে দেখে সহসা যেন চকিত হয়ে উঠলেন]

বিহারী ॥ কে ?

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমি রবি।

বিহারী ॥ আরে এসো—এসো—বোসো।

[ছাত্রেরা উঠে দাঁড়াল]

প্রথম ছাত্র ॥ আমরা তবে আজ আসি। অনেকক্ষণ বিরক্ত করলুম আপনাকে।

বিহারী ॥ না—না, সে কিছু নয়। তোমরা এলে তো আমি খুশীই হই।

[ছাত্রেরা প্রণাম করে বিদায় নিল। রবীন্দ্রনাথ তখনো দাঁড়িয়ে আছেন]

দাঁড়িয়ে কেন রবি ? বোসো—বসে পড়ো।

[রবীন্দ্রনাথ সামনের পাটিতে বসলেন]

রবীন্দ্রনাথ ॥ দাদা আমাকে পাঠালেন।

বিহারী ॥ কে—জ্যোতি ? আচ্ছা, সে পরে হবে। তার আগে—[গলা চড়িয়ে ডাকলেন] ওগো, কোথায় গেলে ? ওগো—শুনছ ?

[বিহারীলাল-গৃহিণী কাদম্বরী দেবী ঘোমটায় মুখ ঢেকে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালেন]

আরে, লজ্জা কিসের ? এ তো ঘরের ছেলে—ঠাকুরবাড়ির রবি। বেশ করে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এসো দেখি ওর জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ। না না—মানে আমার জন্য—

বিহারী ॥ তোমার জন্যেই তো। এমন সুন্দর জ্যোৎস্না—এই হাওয়া–এর সঙ্গে একটুখানি ভালো সরবৎ না হলে জমবে কেন ? [গৃহিণীকে] আচ্ছা, তা হলে আমার জন্যেও আনো।

[কাদম্বরী দেবী বেরিয়ে গেলেন]

তারপর, খবর কী বলো।

রবীন্দ্রনাথ ॥ দাদা 'ভারতী'র জন্যে লেখা চেয়েছেন। আর নতুন বৌঠান মনে করিয়ে দিয়েছেন আপনি অনেকদিন আমাদের ওদিকে আসছেন না।

বিহারী ॥ তোমার নতুন বৌঠানের তৈরী খাবার বহুদিন আমারও খাওয়া হয় নি—সেজন্যে শীগগিরই যেতে হবে বইকি। কিন্তু 'ভারতী'র লেখা এ মাসে বোধ হয় দিতে পারব না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ দাদা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

বিহারী ॥ চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু কথাটা কি জানো? লেখার মেজাজ না এলে আমি শত চেষ্টাতেও কিছুতেই লিখতে পারি না। আসেই না।

রবীন্দ্রনাথ ॥ বাংলাদেশের পাঠকেরা আরও বেশী করে আপনার কাছ থেকে পেতে চায়।

বিহারী ॥ চায়? [হাসলেন] তা হবে। কিন্তু পাঠকদের জন্যে তো আমি লিখি না। আমি নিজের কাছে নিজের কথা বলি। সে কথা যদি আর কারও ভাল লাগে—খুশী হই। ভালো না লাগলেও আমার দুঃখ নেই।

"বিচিত্র এ মত্তদশা
ভাবভরে যোগে বসা
অন্তরে জ্বলিছে আলো, বাহিরে আঁধার—"

[কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর]

অন্তরে সেই আলোর শিখাটি জ্বলে না উঠলে কিছুতেই লিখতে পারি না। একটা লাইনও নয়।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আপনার 'সারদামঙ্গল' আমার আশ্চর্য মনে হয়েছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের পরে এমন কবিতা আমি আর পড়ি নি।

বিহারী ॥ বলো কী! [হাসলেন] অনেকে তো বলেন আমার কবিতা পাগলের লেখা—পাগলামি! তা ছাড়া ভারতচন্দ্র আছেন, মধুসূদন রয়েছেন—

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমাকে মাপ করবেন। রাজসভার কবি ভারতচন্দ্রকে না হয় ক্ষমা করা যায়, কিন্তু মধুসূদন—

বিহারী ॥ [আশ্চর্য হয়ে] মধুসূদন তোমার ভালো লাগে না! 'মেঘনাদ বধ'?

রবীন্দ্রনাথ ॥ 'মেঘনাদ বধ' সম্পর্কেই সব চাইতে বেশী আপত্তি আমার।

বিহারী ॥ সে কি হে! কেন?

রবীন্দ্রনাথ ॥ আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব কিনা জানি না। 'মেঘনাদ বধে' কল্পনার ঐশ্বর্য আছে, ভাষার সমারোহ আছে, আবেগেরও অভাব নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে আমি কেমন তৃপ্তি পাই না। মনে হয় বড় নাটকীয়, বড় উচ্ছ্বাসপ্রধান। যতটা চকিত করে ততখানি আকুল করে না। চক্ষু-কর্ণের বিস্ময় জাগায় কিন্তু অনুভূতির গভীরে গিয়ে দোলা দেয় না।

বিহারী ॥ এ তোমার ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন। বাঁশির সুর তোমার মন

ভোলায়, তাই মৃদঙ্গের ধ্বনিতে তুমি খুশী হতে পারো না। 'মেঘনাদ বধে'র মূল্য পরে তুমি একদিন বুঝবে।

রবীন্দ্রনাথ ॥ তা হতে পারে। কিন্তু আপাততঃ—

[দ্বিধাভরে নীরব হয়ে রইলেন ; কাদম্বরী দেবী একখানা রূপোর থালায় বসিয়ে ছুটি শ্বেতপাথরের গ্লাস নিয়ে উপস্থিত হলেন। দুজনের সামনে গ্লাস দুটি নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন]

বিহারী ॥ [গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে] নাও হে, নাও, লজ্জা ক'রো না।

[রবীন্দ্রনাথও একটি গ্লাস নিলেন, আলগাভাবে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দুজনে সরবত পান করলেন। তারপর]

বিহারী ॥ তুমি কি লেখাপড়া একেবারে ছেড়েই দিলে?

রবীন্দ্রনাথ ॥ [হাত থেকে গ্লাস নামিয়ে লজ্জিতভাবে] কী জানি! স্কুলের বাঁধা গণ্ডীতে আমার কিছুতেই মন বসে না। প্রাণ ছটফট করতে থাকে। শুনছিলুম, বাবামশাই আমাকে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পাঠাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু তাতেও আমার যে খুব সুবিধে হবে—তা মনে হয় না।

বিহারী ॥ [সশব্দে হেসে উঠলেন] তোমারও দেখছি আমার দশা। তুমি তো তবু ভালো ছেলে—শান্তশিষ্ট মানুষ, আমি ছিলুম যেমন ঘর-পালানো, তেমনি ডানপিটে। সংস্কৃত কলেজে দিনকয়েক আসা-যাওয়া—তারপরে ব্যাকরণের ভয়ে সোজা চম্পট!

রবীন্দ্রনাথ ॥ কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে আপনার এত অধিকার—ইংরেজি সাহিত্যে এমন অনুরাগ—

বিহারী ॥ কিছু না—কিছু না। অধিকার কোত্থেকে আসবে? নীলাম্বরবাবুর বুড়ো বাপের পাল্লায় পড়েছিলুম। সংস্কৃত কাব্যর রসে মাতাল —সেই বুড়োই আমায় নেশা ধরিয়ে দিলেন। আর ইংরেজি? সে তো নাছোড়বান্দা কৃষ্ণকমল হাতে ধরে যা দু-চার পাতা পড়িয়েছিল। কানাকড়ি নিয়েই কারবার করি—বিত্তের পুঁজি বলতে কিছুই নেই আমার।

রবীন্দ্রনাথ ॥ বি. এ. এম. এ. পাস তো আজকাল অনেকেই করছেন। কিন্তু আপনার মত এমন কবিতা ওঁরা কেউই লিখতে পারেন না।

বিহারী ॥ কী সর্বনাশ, শেষকালে তুমি আমার শিষ্য হতে যাচ্ছ নাকি? না না, ও সব কথা ভুলেও ভেবো না। লেখাপড়া করো, পণ্ডিত হও— তোমাদের বাড়ির সবাই অনেক আশা রাখেন তোমার ওপর।

রবীন্দ্রনাথ ॥ মিথ্যে আশা রাখেন ওঁরা। মেজদার মত আই-সি-এস আমি কোনদিনই হতে পারব না। আমি আপনার মতো কবিতা লিখতে চাই। কী আশ্চর্য কবিতা আপনার!

[আবৃত্তি করলেন]

"সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।
কিরণে কিরণময়
বিচিত্র আলোকোদয়
ম্রিয়মাণ রবিছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়
ঋষির ললাটে আজি না জানি কী জ্বলে!"

অপূর্ব!

[কিছুক্ষণ চুপ। বিহারীলাল উঠে দাঁড়ালেন। সরবতের গ্লাস পড়ে রইল। স্বপ্নাতুরের মত পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর:]

বিহারী ॥ "ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীলজলে মনোহর স্বর্ণ নলিনী"—

[বলতে বলতে ছাতের রেলিঙের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। শূন্যে আচ্ছন্ন দৃষ্টি ছড়িয়ে বলে চললেন]

"পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বালা পূর্ণিমা যামিনী।"

[মন্ত্রমুগ্ধের মত কিশোর রবীন্দ্রনাথও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বিহারীলালের আবৃত্তি শেষ হলো]

রবীন্দ্রনাথ ॥ এই তো **Spirit of Beauty**! এরই ধ্যানেই তো শেলী জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

বিহারী ॥ শুধু শেলী কেন? এই সৌন্দর্যলক্ষ্মীর স্পর্শ একবার যে পেয়েছে, এই অপরূপ দ্যুতিতে একবার যার দৃষ্টি আলো হয়ে গেছে—তার তো আর মুক্তি নেই! বুকের ভেতর দুঃখের প্রদীপ জেলে তার অনন্ত আরতি। সংসার, স্বার্থ,

চাওয়া-পাওয়া সব মিথ্যে হয়ে যায় তার কাছে। "হাসিয়ে পাগল বলে পাগল সকল!" শেলীর দিকেই তাকিয়ে দেখো। [একবার থামলেন—যেন নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন] থাক্ ওসব কথা। এমন জোৎস্না রাত—গান শোনাও দেখি একটা।

রবীন্দ্রনাথ॥ [কিছু কুণ্ঠিতভাবে] এখন ?

বিহারী॥ গান তো তোমার গলায় সব সময়েই রয়েছে। লজ্জা কেন? শোনাও।

রবীন্দ্রনাথ॥ কী গাইব ?

বিহারী॥ যা খুশি। তোমার নিজের লেখা কিন্তু।

[রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ গুনগুন করলেন, তারপর আস্তে আস্তে ধরলেন :]

"গোলাপফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ হোথা যাস্‌নে।
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে, কাঁটার ঘা খাসনে"।

বিহারী॥ পিলু? বাঃ!

[উৎসাহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ গলা খুলে গান ধরলেন। তীক্ষ্ণ মধুর কণ্ঠের গানে জ্যোৎস্না রাত্রিটি বিহ্বল হয়ে উঠলো]

"হোথায় বেলা, হোথায় চাঁপা শেফালী হোথা ফুটিয়ে
ওদের কাছে মনের ব্যথা বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে—"

[গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে কাদম্বরী দেবী ফিরে এলেন। একটু দূরে রেলিঙ ধরে তিনিও দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন গান]

"ভ্রমর কহে হোথায় বেলা কোথাও আছে নলিনী
ওদের কাছে বলিব নাকো আজিও যাহা বলিনি।
মরমে যাহা গোপন আছে গোপনে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।"

[গান শেষ হল। সুধাকণ্ঠের অপূর্ব গানটি যেন মূর্ছিত হয়ে রইল আকাশে বাতাসে। বিহারীলাল কিছুক্ষণ মগ্নদৃষ্টি মেলে রাখলেন আকাশের দিকে]

বিহারী॥ [স্বগতোক্তির মত] ঠিক। এই হল কবির কথা। "বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব।" যন্ত্রণা না থাকলে কবিতার জন্ম হয় না। আঘাত না দিলে তো সুর ওঠে না বীণায়।

রবীন্দ্রনাথ॥ আপনার ভালো লাগল গান ?

বিহারী॥ কী বলছ? হ্যাঁ, মন্দ লাগল না। তবে তোমার গলা এখনও

জ্যোতির মতো পরিষ্কার হয় নি। আর ভাবের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতো হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

[দূরে দাঁড়িয়ে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন কাদম্বরী দেবী ; উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের দীপ্ত মুখের ওপর বিষণ্ণ নৈরাশ্যের ছায়া পড়েছে। ঠিক এইটে যেন তিনি প্রত্যাশা করেন নি]

বিহারী ॥ কী, রাগ করলে?

রবীন্দ্রনাথ ॥ [ম্লান হাসলেন] না না, রাগ করব কেন? নতুন বৌঠানও এ কথা বলেন। বলেন, আপনার মত ভাব না আনতে পারলে আমি কোনদিন গান গাইতে পারব না—বড় কবিও হতে পারব না।

বিহারী ॥ আমি নই—আমি নই। যদি বড় হতে চাও—দ্বিজেন্দ্রবাবুকে বুঝতে চেষ্টা ক'রো। কী আশ্চর্য ওঁর কল্পনাশক্তি!

রবীন্দ্রনাথ ॥ [মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে] আচ্ছা। [একটু দ্বিধা করে] 'ভারতী'তে আমার "কবিকাহিনী" দেখছেন আপনি?

বিহারী ॥ [মৃদু হেসে] দেখছি।

রবীন্দ্রনাথ ॥ যদিও সঙ্কোচ হয়, তবু আপনার মতামত যদি একটু জানতে পারি—[দ্বিধাভরে থামলেন]

বিহারী ॥ [মুখের ওপর হাসিটি টেনে রেখে আবৃত্তি করলেন]

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিত্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্বাহুরিব বামনঃ"—

জানো তো শ্লোকটা?

রবীন্দ্রনাথ ॥ [বিবর্ণ মুখে] জানি। অর্থটাও মনে আছে।

বিহারী ॥ মহাকবি কালিদাসকে পর্যন্ত এ কথা বলে আক্ষেপ করতে হয়েছিল। তুমি ছেলেমানুষ—এখনি এত ব্যাকুল হচ্ছ কেন? অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর। সরস্বতীর বর পাওয়া সহজ নয় হে—জন্ম-জন্ম সাধনা করেও ও দেবীটির মন পাওয়া যায় না।

[কাদম্বরী দেবী আবার অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে রইলেন মাথা নীচু করে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন]

রবীন্দ্রনাথ ॥ আজ আসি তা হলে। আপনাকে আর নতুন বৌঠানকে আমি কিছুতেই খুসী করতে পারি না। কিন্তু লেখার কথা দাদাকে কী বলব?

বিহারী ॥ ব'লো, পরশু আমি যাব তাঁর সাহিত্যবৈঠকে। আর নতুন

বৌঠানকে জানিয়ো পেটুক কবির জন্যে যেন কিছু ভাল খাবার-দাবার তৈরি করে রাখেন।

রবীন্দ্রনাথ ॥ আচ্ছা।

[ধীরে ধীরে চললেন সিঁড়ির দিকে—তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কাদম্বরী দেবী স্বামীর কাছে এগিয়ে এলেন]

কাদম্বরী ॥ এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু।

বিহারী ॥ [অন্যমনস্কভাবে] কিসের অন্যায় ?

কাদম্বরী ॥ এত চমৎকার গাইলে—এমন সুন্দর ভাব, সুন্দর ভাষা—তুমি মন খুলে একটু প্রশংসাও করতে পারলে না ? বেচারী মুখ কালো করে চলে গেল।

বিহারী ॥ [হেসে] দাঁড়িয়ে শুনলে বুঝি ?

কাদম্বরী ॥ শুনলুম বইকি। আর ওর "কবিকাহিনী"কে তো কী সব সংস্কৃত বলে ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিলে।

বিহারী ॥ উড়িয়ে দিলুম ?"কবিকাহিনী"কে ? কী শক্তি ওর "কবিকাহিনী"তে —কী তার ভাব, কী তার গভীরতা ! আমি উড়িয়ে দিতে পারি তাকে ? ওর কবিতা মহাকালের খাতায় জমা হয়ে যাচ্ছে—তাকে উডিয়ে দেবে সাধ্য কার ? নিজের কবিতার চেয়েও যে ওর লেখা আমার বেশী ভালো লাগে—বারবার পড়তে পড়তে কণ্ঠস্থ হয়ে যায় [আবৃত্তি করতে লাগলেন :]

"মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্বতের গহ্বর বিশাল···
···পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—"

কাদম্বরী ॥ আচ্ছা, এতোই যদি ভালবাসো ওর কবিতা, তবে মুখ ফুটে সেটা ওকে একটুখানি বলতেও পারলে না ? শুধু কষ্টই দিলে ?

বিহারী ॥ কষ্ট তো দিই নি—একটু আঘাত দিলুম। সে আঘাতে ওর বীণায় আরও বেশী করে সুর বাজবে। ও সাধারণ নয়—'সারদামঙ্গলে' যে বাল্মীকিকে আমি ধ্যানের মধ্যে দেখেছি—বাস্তবে সেই রূপ প্রত্যক্ষ করছি

ওর ভেতর। "যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে" ওরই ললাটে আসন বিছিয়েছেন—সে যে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি! দেখছি সারা দেশ নতুন বাল্মীকির জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তাই তো দুঃখ দিয়ে ওর শক্তিকে জাগাতে চাই—বলি, "জাগৃহি ত্বং—জাগৃহি ত্বং"! আজ নয়—একদিন সেকথা ও বুঝবে!

[বিহারীলাল নীরব হলেন—দৃষ্টি মেলে দিলেন আকাশের দিকে। আর কাদম্বরী দেবী দুটি আয়ত বিশ্বস্ত চোখ মেলে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন]

সাজঘর

অখিল নিয়োগী

[একটি রঙ্গমঞ্চের নায়কের সাজঘর। দেয়ালে বড় একটি আয়না। আয়নায় গা ঘেঁসে একটি টেবিল ও চেয়ার। আশেপাশে কয়েকটি সোফা। এক কোণে একটি বড় আলমারী, তাতে সব রকম পোষাক বিভিন্ন তাকে সাজানো আছে। মাথার ওপর দড়ি টাঙানো, বিভিন্ন জাতীয় পরচুলা তাতে ঝুলছে। দুএক জন নাট্য রসিকব্যক্তি সোফায় বসে আছেন। যবনিকা উত্তোলিত হতেই প্রেক্ষাগৃহের দিক থেকে ঘন ঘন করতালি ধ্বনি শোনা যেতে লাগলো। দ্রুত বেগে মঞ্চের নায়ক সর্বদমন সাধু এসে ঘরে ঢুক্‌লেন]

সর্বদমন ॥ ওরে মাকাল, কোথায় গেলি রে? তাড়াতাড়ি এদিকে আয়। ঘামে যে একেবারে ঝোল হয়ে গেলাম। ধড়াচুড়োগুলো আগে খুলে নে। ফ্যানটা ফুল স্পীডে চালিয়ে দে। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাঁচি—

[মাকালের পিতৃদত্ত নাম গোবিন্দ। কিন্তু নায়ক সর্বদমন ওকে মাকাল বলেই ডাকেন। নায়কের মেক-আপ্‌ম্যান আর ড্রেসার হচ্ছে এই মাকাল। ওকে ছাড়া নায়কের এক মুহূর্তও চলে না। আর সব সময় ওকে গালাগালি করা চাই। মাকাল বাইরে বিড়ি টানছিল। তাড়াতাড়ি সেটা ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলো]

মাকাল ॥ এই ত' আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি স্যার—আগে পরচুলাটা খুলে নি। একি! পরচুলার একটা দিক যে একেবারে ফেঁসে গেছে।

সর্বদমন ॥ তা আর যাবে না! শেষ দৃশ্যে যে ভিলেনকে হত্যা করে এলাম। ঘন-ঘন করতালি ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছিস নে? যা ধস্তাধস্তির ব্যাপার! ও-ও মরবে না, আর আমিও ছাড়বো না। ভাগ্যিস পরচুলাটা একেবারে খুলে পড়ে যায় নি।

মাকাল ॥ তা হলে আরো বেশী হাততালি পড়ত স্যার। আর সমালোচকেরাও একটা খোরাক পেতো।

সর্বদমন ॥ ঠিক বলেছিস মাকাল! তুই মাকাল হলে কি হবে? মাঝে মাঝে এমন বুদ্ধির পরিচয় দিস যে, আমি অবধি হক্‌চকিয়ে যাই।

মাকাল ॥ তবু ত' আপনি আমায় একদিন ষ্টেজে নাম্‌তে দিলেন না।

সর্বদমন ॥ সাজঘরে আছিস সেই ভালো। আবার চূণ-কালি মাখবার সখ কেন? দেখছিস ত' আমার অবস্থা!

মাকাল ॥ আপনার অবস্থা! হেঁ-হেঁ-হেঁ। সবাই হিংসে করে আপনাকে।

[দ্রুতবেগে একজন তরুণের প্রবেশ]

তরুণ ॥ সত্যি, আমরাও হিংসে করি আপনাকে। আজকের যুগে সর্বদমন সাধুর ছবি—বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে ঠাকুর-দেবতার পটের পাশেই। আজ যা অভিনয় করলেন—চার্লস্ লটনকেও দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখতে হবে!

সর্বদমন ॥ আজ্ঞে, আপনি?

তরুণ ॥ আজ্ঞে আমায় চেনেন না? 'রঙ্গ-ব্যঙ্গ' পত্রিকার 'ছায়া-কায়া' ত' আমার কলমের জোরেই এত পপুলার। প্রতিটি সংখ্যা পাঠিয়ে দেয়া হয় আপনার ঠিকানায়।

সর্বদমন ॥ ঠিক! ঠিক! পাই বটে কাগজখানা। তবে পড়বার কি যো আছে? ছবির পাতা উল্টোতেই মেয়েরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

তরুণ ॥ সেই ত আমাদের 'কমপ্লিমেণ্ট'! শুধু গ্রাহিকাদের চাহিদাতেই ত কাগজটি চল্‌ছে। আজ এসেছি আপনার একটি স্ন্যাপ্ নিতে। আমাদের স্টাফ্ ফটোগ্রাফার সঙ্গেই আছে।

মাকাল ॥ কিন্তু আমি ত' আদ্দেক মেক্-আপ খুলে ফেলেছি। ফটো তুল্‌বেন সে কথা আমায় আগে বলে রাখ্‌তে হয় স্যার—

তরুণ ॥ তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না ভাই। "রূপসজ্জা উন্মোচনে রূপদক্ষ সর্বদমন"!—কেমন সুন্দর ক্যাপসন্ হবে আপনি বলুন না সর্বদমনবাবু। আমাদের গ্রাহিকারা এই জাতীয় ছবি ভারী পছন্দ করে। ওহে নবাঙ্কুর, আর দেরী নয়। চট করে তুলে নাও এই বিশেষ পোজ্‌টা।

[স্টাফ্ ফটোগ্রাফার নবাঙ্কুর নারাঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে এসে আর বাক্য ব্যয় না করে কাজ হাঁসিল করে ফেল্লে। মুখে শুধু বল্লে, ও. কে.!]

তরুণ ॥ তাহলে আসি স্যার। আর আপনার সময় নষ্ট করবো না। আগামী সংখ্যা 'রঙ্গ-ব্যঙ্গ'তে নাটকের সমালোচনা আর আপনার কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিমার ছবি ছাপা হবে। আমাদের স্টাফ্ ফটোগ্রাফার অনেকগুলো ফটো অভিনয়ের সময়ই তুলে নিয়েছে কিনা! সে সংখ্যাটি খুল্‌তে ভুল্‌বেন না স্যার!

সর্বদমন ॥ দেখবো বৈ কি! দেখবো বৈ কি! তবে আমার চাইতে

বাড়ীর মেয়েরাই বেশী আগ্রহ করে দেখবে। ওরাই সব সময় গল্প করে কিনা।

["রঙ্গ-ব্যঙ্গ" প্রতিনিধির প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাড়ালেন—গণপতি কাঞ্জিলাল। বিশাল বপু। আদ্দির পাঞ্জাবী, শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি পরনে, উড়ানি গায়ে, হাতে মস্ত বড় পানের ডিবে ; মচ্ মচ্ করছে চক্চকে পাম্প-স্থ জুতো]

গণপতি ॥ আসতে পারি স্যার ?

সর্বদমন ॥ একি ! গণপতিবাবু যে ! কল্‌কাতায় কবে এলেন ?

গণপতি ॥ এলাম ত' আপনারই কাছে। আমাদের বাদুড়ঝোলা সংস্কৃতি সম্মেলনের বার্ষিক উৎসব—আস্‌ছে রোববার। আপনাকে সভাপতিত্ব করতে হবে।

সর্বদমন ॥ রবিবার কি করে হবে ? রবিবার যে আমাদের ষ্টেজে প্লে রয়েছে।

গণপতি ॥ না, না—সেজন্যে আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার অভিনয়ে আমরা বাধার সৃষ্টি করবো না। সকালবেলা আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো। সোজা চলে যাবেন আমার ওখানে। চা-জলখাবারের পরই উৎসব। চমৎকার প্যাণ্ডেল তৈরী করিয়েছি। তারপর দুপুরবেলা গরীবের ওখানে একটু ডাল-ভাত। খানিকটা বিশ্রামের পর সোজা গাড়ী করে আপনাকে পৌঁছে দেবো থিয়েটারে। কোনো অসুবিধেই আপনার হবে না।

সর্বদমন ॥ কিন্তু আপনার ওখানকার ডাল-ভাতের খবর আমি রাখি। সেই ভূরি-ভোজনের পর কি এসে আমার প্লে করবার ক্ষমতা থাক্‌বে ?

গণপতি ॥ মিছিমিছি আমাকে আর লজ্জা দেবেন না স্যার ! না হয় আপনি শুধু শাক-ভাতই খাবেন আমাদের পাড়াগাঁয়ে। হ্যাঁ, ভালো কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাদুড়ঝোলা সংস্কৃতি পরিষদ ঐ দিন আপনাকে 'নট-নক্ষত্র' উপাধি দেবে। একটি অভিনন্দন-পত্রেরও ব্যবস্থা করেছে। আপনি তার যে জবাব দেবেন—সেটা যদি একটু আগে পাই ত' আমরা আর্ট পেপারে ছাপিয়ে নিতে পারি।

সর্বদমন ॥ এ সব আপনারা কি সুরু করেছেন—বলুন ত' ! 'নট-নক্ষত্র'—অভিনন্দন পত্র···না-না, সে আমার ভারী লজ্জা করবে।

গণপতি ॥ কি যে আপনি বলেন স্যার ! গুণী লোককে সম্মান দেবো না ? তবে আমাদের "সংস্কৃতি সম্মেলন" করে লাভ কি ? জান্‌বেন, আমরা কখনো ভস্মে ঘি ঢালি না, যজ্ঞের অগ্নিতেই ঢেলে থাকি ! লোকে বলে, গণপতি ব্যবসাদার টাকাগুলো খোলামকুচির মতো খরচ করছে ! কিন্তু

তারা ত' জানে না—সংস্কৃতি-কৃষ্টি কাকে বলে। বুঝলেন,—বাদুড়-ঝোলাকে আমি কলকাতার চাইতেও উন্নত করে তুলবো। তখন লোকে বলবে, হ্যাঁ, গণপতি ব্যবসাদার বাপের ব্যাটা।

[হঠাৎ দরজার কাছে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেলো "ভেতরে আসতে পারি ?"]

সর্বদমন ॥ কে ? আসুন—

[দুটি আধুনিকা তরু

উভয় তরুণী ॥ নমস্কার।

সর্বদমন ॥ নমস্কার। কিন্তু সাজঘরে আপনাদের কি প্রয়োজন তা ত' বুঝতে পারছি না।

১মা তরুণী ॥ মানে—আমরা দুই বান্ধবী। কলেজের ছাত্রী। আপনার অভিনয় দেখতে এসেছিলাম। আমাদের অটোগ্রাফ্ খাতায় বাণী দিতে হবে।

গণপতি ॥ তা আপনারা বসুন। আমি আজ তবে উঠি সর্বদমনবাবু। ওই সাংস্কৃতিক-সম্মেলনের জন্যে কিছু কেনা কাটা আছে। ভাবছি—সে কাজটা আজই শেষ করে ফিরবো।

[যেতে যেতে ফিরে এসে]

কবি কালিদাসকে সম্মান দেখিয়েছিলেন বলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য আজও অমর হয়ে আছেন। আমরা গুণীর সম্মান করতে জানি। আপনার কোনো আপত্তি কিন্তু আমি শুনবো না। রবিবার খুব সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো—

[গণপতির দ্রুত প্রস্থান]

সর্বদমন ॥ [তরুণীদের উদ্দেশ্যে] আপনাদের অটোগ্রাফ্ খাতায় আমি আর কি লিখতে পারি বলুন ? আপনারা কলেজে পড়েন, আমার চাইতে কত বেশী জানেন। মা সরস্বতীর কাছে পাত্তা পেলাম না বলেই ত' এ লাইনে পা দিয়েছি।

২য়া তরুণী ॥ অমন কথা মুখেও আনবেন না। মা সরস্বতী ত' অভিনয় কলারও দেবী। উচ্চাঙ্গ অভিনয় কলার ভেতর দিয়ে আপনি দেশকে যে উন্নত করেছেন—তার মূল্য কি কিছু কম ? আপনার অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা ত' সেই কথাই আলোচনা করছিলাম।

সর্বদমন ॥ আপনারা আমাকে মিছিমিছি লজ্জা দেবেন না। দেশকে দান

করবার মতো যোগ্যতা আমার কিছুই নেই। বড় জোর আপনাদের খাতায় আমি সই করে দিতে পারি।

১ম তরুণী ॥ একটা কথা তা হলে আপনাকে খুলেই বলি। আমার এই বান্ধবীটি চমৎকার অভিনয় করতে পারে। কলেজ সোস্যালে বহুবার পদক পেয়েছে। ওর খুব সখ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে। আপনাকে ও মনে-মনে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছে। ওর জন্যে একটা সুযোগ আপনাকে করে দিতেই হবে—

সর্বদমন ॥ আপনারা বলছেন কি? কলেজ থেকে একেবারে রঙ্গমঞ্চে? বোধ করি বড়লোকের মেয়েই হবেন। এই পাঁকের মধ্যে কেন পা দেবেন বলুন ত'?

২য়া তরুণী ॥ পাঁক? পাঁক আপনি বলছেন বিশুদ্ধ অভিনয়কে? হ্যাঁ, আমি বড়লোকেরই মেয়ে। অর্থের অভাব আমাদের নেই। আমাদের প্রত্যেক ভাই-বোনের আলাদা মোটর। কিন্তু জীবনকে আমি বিকশিত করতে চাই। ওই যে রাজকুমারী আপনার সঙ্গে আজ অভিনয় করল,—তাকে কি আপনি অভিনয় বলবেন? আপনার পাশে ওকে এত বেমানান দেখিয়েছে যে, লজ্জায় আমার গা শির্-শির্ করছিল। আর ওই কি ডায়ালগ বলার নমুনা? দোহাই আপনার, আমাকে সুযোগ করে দিতেই হবে। আপনার কথা থিয়েটারের মালিক কিছুতেই ফেলতে পারবেন না।

সর্বদমন ॥ আপনি যে অভিনয় করতে চান—এতে আপনার বাবার সম্মতি আছে?

২য়া তরুণী ॥ তার প্রয়োজন হবে না। কাগজে ঘোষণা দেখলেই ত' তিনি জান্‌তে পারবেন। তা ছাড়া আমি ত' এখন সাবালিকা। ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে একথা আদৌ ওঠে না।

সর্বদমন ॥ আপনার বাবা বুঝি শুধু চিনির বলদ? আপনার শিক্ষা ও সব কিছুর খরচ জুটিয়েই তাঁকে নির্বাক ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে?

২য়া তরুণী ॥ কি বল্লেন?

সর্বদমন ॥ না, না—আমি বলছিলাম—অনেক টাকা-পয়সা খরচ করে আপনার বাপ উপযুক্ত শিক্ষাই দিয়েছেন!

২য়া তরুণী ॥ নিশ্চয়ই! তিনি খুব ব্যস্ত মানুষ। আর অপরের স্বাধীনতায় তিনি কখনো হস্তক্ষেপ করেন না।

সর্বদমন ॥ কিন্তু আমি করি। দোহাই আপনাদের। আজ দয়া করে আমায় রেহাই দিন। আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

১মা তরুণী ॥ সত্যি আমরা দুঃখিত। বেশ, আজকে আমরা যাচ্ছি। আমার বান্ধবীটিকে নিয়ে আর একদিন কিন্তু আসছি। আমরা প্রায়ই আপনার থিয়েটার দেখতে আসি কিনা। একটা ব্যবস্থা আপনাকে করে দিতেই হবে।

মাকাল ॥ আচ্ছা স্যার, আমি একটা কথা বলছি। দিদিমণিরা যখন এত করে ধরেছেন,—আপনার মুখের কথা খসালেই ত' এতটা ব্যবস্থা হয়ে যায়—

সর্বদমন ॥ দেখ মাকাল ফল, যা বুঝিস নে—তার ভেতর কথা বলতে আসিস কেন? তোর কাজ হচ্ছে সাজঘরে সঙ্ সাজানো আর চূণ-কালি তুলে ফেলা! যা করছিস—তাই করনা কেন? ওই যে কথায় বলে না, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,—কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে! তোর হয়েছে তাই।

২য়া তরুণী ॥ আজ আপনার মনটা ভালো নেই দেখছি! আচ্ছা, আমরা চললাম। আবার শীগগির একদিন আসছি। সেইদিন ভালো করে আপনার বাণী লিখিয়ে নেবো।

[দুই তরুণীর প্রস্থান]

সর্বদমন ॥ দেখ মাকাল, তুই আমাকে ডোবাবি দেখছি! কোথায় কার সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় কিচ্ছু জানিস নে? ওই মেয়েকে যদি আমি থিয়েটারে ঢুকিয়ে দি—তবে ওর বাবা দুর্নীতি দমন বিভাগের মারফৎ আমার হাজত বাসের ব্যবস্থা করবে। তুই কি তাই চাস নাকি? দেখলি নে একেবারে আগুনের ফুলকি! হাত দিলেই ফোস্কা পড়বে।

মাকাল ॥ [জিব কেটে] না-না স্যার, আমি তা চাইবো কেন? তবে আপনার সঙ্গে রাজকন্যার পার্টে ভারী মানাতো!

সর্বদমন ॥ হুঁ! ভারী মানাতো! আরে বোকা বুঝছিস না কেন? বড়-লোকের মেয়ে বলেই ত' আরো বেশী বিপদ! ওরা হাঁ-কে না—আর না-কে হাঁ করাতে পারে। একটা ফাঁড়া কেটে গেল আমার। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়। হুঁ হু, সর্বদমনের কাছে সুবিধে করতে পারে নি!

[কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই একসঙ্গে কয়েকজন যুবকের প্রবেশ]

১ম যুবক ॥ শুনেছি, অভিনয়ের পর এই সময়ই আপনার দেখা পাওয়া যায়—

সর্বদমন ॥ তা কি আপনাদের প্রয়োজন ?

২য় যুবক ॥ দেখুন, আমাদের 'অভিসার সংসদের' পক্ষ থেকে শুভ শারদীয়ায়— 'কে এ কামিনী' অভিনীত হবে। আপনাকে তার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে।

সর্বদমন ॥ 'কে এ কামিনী' কার লেখা নাটক বলুন ত'! নামটা কখনো শুনেছি বলে ত' মনে হচ্ছে না।

৩য় যুবক ॥ হুঁ-হুঁ। ওই টুকুই ত' আমাদের অরিজিন্যালিটি। আমরা চর্বিত-চর্বণ নিয়ে কারবার করিনে। সভ্যরা সবাই মিলে নাটক লিখেছি। এক একজন এক-একটা ডায়ালগ। নিজেদের বান্ধবীদের নিয়ে অভিনয় করবো। নিজেরাই নাটকের গানের স্থর দেবো, দৃশ্যপট পরিকল্পনা করবো। সংসদের সভ্য-সভ্যা ছাড়া সেখানে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই! আর নাটক শেষ হবার পরই স্থরু হবে আমাদের অভিসার।

সর্বদমন ॥ একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—যিনি আপনাদের সংসদের সভ্য নন— তাকে আপনারা নাটক পরিচালনা করতে ডাক্‌ছেন কেন ?

৪র্থ যুবক ॥ লেডি গজানন বোস্ আমাদের প্রেসিডেণ্ট। তিনি আপনার একজন অ্যাড্‌মায়ারার। তাঁর অনুরোধেই আমরা আপনাকে দিয়ে নাটকটি শিখিয়ে নিতে চাই—

সর্বদমন ॥ ও নাটক শেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আচ্ছা নমস্কার—

১ম যুবক ॥ জানেন, এজন্যে লেডি গজানন বোস আপনাকে ফোন করেও পান নি ?

সর্বদমন ॥ আমার দুর্ভাগ্য।...আচ্ছা, এইবার আমি উঠ্‌বো—

২য় যুবক ॥ তার মানে আপনি আমাদের চলে যেতে বল্‌ছেন ?

মাকাল ॥ না—না—স্যার, এ কি কথা। আচ্ছা স্যার, এই অভিসার নাটকের মেক্-আপের কাজটা ত' আমি পেতে পারি ?

সর্বদমন ॥ আঃ মাকাল, তুই চুপ করবি! [যুবকদের প্রতি] দেখুন, আমার ভয়ানক মাথা ধরেছে। আজ আপনারা আস্থন—

৩য় যুবক ॥ আচ্ছা, দেখে নেবো—

১ম যুবক ॥ নিরিবিলি কি কোনো দিন পাবো না ?

২য় যুবক॥ আমাদের পাড়ায় কি আপনি আর যাবেন না? আচ্ছা—

[সক্রোধে যুবকদের প্রস্থান]

মাকাল॥ হায়-হায়-হায়! এমন দাঁওটা একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেল স্যার! আপনি একটু মুখের কথা খসালেই হত!

সর্বদমন॥ দেখ মাকাল, আজ আমায় বিরক্ত করিস নে! আজ মন-মেজাজ আমার ভারী খারাপ।

মাকাল॥ কেন স্যার? কি হয়েছে? মাথা টিপে দেবো?

সর্বদমম॥ না রে পাগ্‌লা, অসুখ আমার মনে। আজ পনেরো দিন ধরে ছেলেটা টায়ফয়েডে ভুগ্‌ছে। টাকা-পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে। এই সময় অভিনন্দন—'নটনক্ষত্র'—বাণী-প্রদান—এই সব ন্যাকামী ভালো লাগে? মনে হয় ঘাড় ধরে সবাইকে বার করে দি। কিন্তু আমরা ত' ভদ্রলোক। তা পারি না। মনের মধ্যে কি যেন গুম্‌রে ওঠে!

মাকাল॥ তাহলে ত' স্যার আপনি বড় বিপদে পড়েছেন! যদি রাত জাগ্‌তে হয়—আমায় বল্‌তে কিন্তু করবেন না।

সর্বদমন॥ না-রে-না! আসল ব্যাধি আমার অভাব। সাজঘরে রাজপুত্র সাজ্‌ছি—কিন্তু ছেলের চিকিৎসার টাকা হাতে নেই। গত মাসেও কিছু আগাম নিয়েছি। আজ ইন্‌জেক্‌সন দেবার তারিখ। যেমন করে হোক পঞ্চাশটা টাকা আমার চাই-ই। তুই ম্যানেজারবাবুর কাছে গিয়ে আমার নাম করে—

মাকাল॥ আমি এক্ষুনি যাচ্ছি স্যার। আপনি ততক্ষণ এই ন্যাকড়াটায় নারকেল তেল দিয়ে মুখটা রগ্‌ড়াতে থাকুন—

[প্রস্থান]

সর্বদমন॥ ঠিকই বলেছিস্ মাকাল। শেষ পর্যন্ত আমায় এই মেঝেতেই মুখ রগড়াতে হবে।

[আপন মনে হাস্‌তে লাগ্‌লো]

হুঁ! সংস্কৃতি! অভিসার! বাণী! অভিনন্দন! গুষ্টির পিণ্ডি? সবাইকার ঝুঁটি ধরে গঙ্গায় ডোবাবো—

[মাকালের প্রবেশ]

মাকাল॥ ঝুঁটি ধরে গঙ্গায় ডোবাবেন? কিন্তু আমার কি দোষ? আমি ম্যানেজারবাবুকে বল্‌তেই উনি জবাব দিলেন, সাম্‌নে পূজো—নতুন প্রডাক্‌সন—এখন অ্যাডভান্স দিতে পারবেন না।

সর্বদমন ॥ শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে কলা খাইয়ে, ঘোল ঢেলে যে একদিন তাড়িয়ে দেবে সে কথা বেশ বুঝতে পারছি! হতুম নায়িকা ত' হীরের নেক্‌লেস্ জুটে যেত। আমি ত' রূপোলী পর্দার তারকা নই—শুধু মঞ্চের অভাগা নায়ক!

মাকাল ॥ দেখুন স্যার, বাড়ীতে অসুখ থাক্‌লে মনের অবস্থা যে কি হয় তা আমি জানি। আমার একটা কথা শুন্‌বেন স্যার?

সর্বদমন ॥ [অপ্রসন্ন মুখে] কি বল্‌বি বল্—

মাকাল ॥ আজই শ্বশুর মশাই গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাঠিয়েছেন মণিঅর্ডার করে। আমার ইস্তিরির জন্যে পূজোর সাড়ী কিন্‌তে হবে। আমি বলি কি—পূজোর ত' দেরী আছে, এই টাকাটা আজ আপনি বাড়ী নিয়ে যান।

সর্বদমন ॥ অ্যাঁ! মাকাল, তুই বল্‌ছিস কি? তোর বৌয়ের সাড়ীর জন্যে টাকা এসেছে—আর সেই টাকা তুই আমার ছেলের চিকিৎসার জন্যে দিতে চাইছিস্?

মাকাল ॥ আপনি মাইনে পেয়েই ও টাকা ফেলে দেবেন!

সর্বদমন ॥ মাকাল, তোকে আমি অমানুষ ভেবে কত বকি, কত গালাগাল দিই—দিনরাত!

মাকাল ॥ কি যে বলেন স্যার! আমি যে মাকাল……মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ। আপনার পায়ের তলায় পড়ে আছি। সঙ সাজাতেই জানি।

সর্বদমন ॥ সত্যি মাকাল! আমরা সবাই সাজঘরের সঙ্। কিন্তু তুই যে সেই সঙের দলে আসল সোনা, সে কথা কি করে বুঝ্‌বো বল? সত্যি মাকাল, তুই আমায় হারিয়ে দিয়েছিস্…

মাকাল ॥ স্যার, অমন করে বল্‌বেন না, তাহলে আমি সত্যি কেঁদে ফেল্‌বো। গালাগাল দেন, তা বেশ সইতে পারি। কিন্তু এমন ধরা গলায় অমন মিষ্টি মিষ্টি কথা আমায় শোনাবেন না। মাইরি বলছি—

সর্বদমন ॥ ওরে, চোখে কি আমারই জল আসছে না রে? কিন্তু সাজঘরে সঙ্ সাজার মোহ আমরা কেউ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবো না! দে ভাই টাকা কটা দে। অমনি মেক্-আপটাও ভালো ভাবে করে দিস্…এবার আর রাজপুত্র নয়, এখন অক্ষম পিতার ভূমিকায় অভিনয় করতে যাবো—। কিন্তু দেখে নিস মাকাল,—অভিনয় আমি ভালই করবো—

[পাগলের মতো বেরিয়ে গেল। মাকাল অবাক হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইল—হাতে সেই পরচুলাটা]

কুয়াশা

সুনীল দত্ত

[অবিনাশ সেনের বাড়ীর বাইরের ঘর। পেছন দিকে একটা র‍্যাকের উপর কিছু ফাইল পত্র আছে। কৌচ সোফা আর টিপয়-টেবিল দিয়ে ঘরটা সাজান আছে। পর্দা উঠতে দেখা গেল অবিনাশ একটা জামা পরতে পরতে আসছে। আর বক বক করে বকছে]

অবিনাশ ॥ হায়রে আমার সংসার, কি কুক্ষণেই যে বিয়ে করেছিলুম !

[প্রবেশ করে উমা, হাতে একটা আধ-বোনা সোয়েটার]

উমা ॥ কোথায় চললে আবার ?

অবিনাশ ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে] কাজে।

উমা ॥ কখন আসছ ?

অবিনাশ ॥ জানি না। [বোতামগুলো লাগাতে ব্যস্ত থাকে]

উমা ॥ খেতে আসবে না ?

অবিনাশ ॥ না।…[সোফায় বসে জুতোর ফিতে বাঁধে]

উমা ॥ তুমি আগে কতো কথাই বলতে। এখন কথা কমিয়ে দিয়েছ কেন ?

অবিনাশ ॥ কথা কইবার মত লোক পাই না বলে। [জুতোর ফিতে বাঁধতে মনোযোগ দেয়]

উমা ॥ আমরা কি উপযুক্ত নই ?

অবিনাশ ॥ না। [ঘাড় হেঁট করে বলে] নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না—

উমা ॥ তুমি তো এরকম ছিলে না।

অবিনাশ ॥ সবই কপালের ফের। [অন্য পায়ের ফিতে বাঁধে]

উমা ॥ কপাল কি তোমায় আমার সঙ্গে কথা বলতেও নিষেধ করেছে ?

অবিনাশ ॥ না। [জুতোটা একটা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নেয়]

উমা ॥ তবে ?

অবিনাশ ॥ নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তর পাওয়া যায়।

উমা ॥ আমায় বলছ ?

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, একবার জিজ্ঞেস কর না ! [উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা খুঁজতে স্বরু করে]

উমা ॥ তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

অবিনাশ ॥ কিছুই বুঝতে পারছ না ! [মুখের দিকে একবার তাকাল]

উমা ॥ না। [বোনার কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়]

অবিনাশ ॥ একটু চিন্তা করে দেখ। বুঝতে নিশ্চয়ই পারবে !

উমা ॥ ডিটেক্‌টিভ ডিপার্টমেণ্টে চাকরীটা তুমিই কর। আমি করি না। আর, মনস্তত্ত্বর ব্যাপারটা তোমারই ভাল জানা আছে—

অবিনাশ ॥ নিজের মনকে জিজ্ঞেস করবার জন্যে বিশেষজ্ঞর দরকার হয় না উমা। মনটাকে একটু সরল করলেই যথেষ্ট।

উমা ॥ ১৫ বছর চাকরী করবার পর তুমি যেন কি রকম হয়ে গেছ।

অবিনাশ ॥ তার জন্যে নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্ট দায়ী নয়।

উমা ॥ কে দায়ী জানিনা। তবে—

অবিনাশ ॥ তবে কি ? বলো ?

উমা ॥ দুনিয়ার মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে-দেখে, তুমি সংসারের সকলকেই অবিশ্বাস করতে স্বরু করেছ।

অবিনাশ ॥ তবু ভাল যে তোমার মনটা এখনও সরল রাখতে পেরেছ !

উমা ॥ তোমার চাকরিতে ঢুকলে ওটুকুও অফিসেই রেখে আসতে হোত।

অবিনাশ ॥ অফিস থেকে জীবনটাকে আলাদা করে ভেবে লাভ কি ?

উমা ॥ আফিসের চাকরী, চাকরী। আর সংসার, সংসার। এদুটোকে মিলিয়ে ফেললে জীবনটা হ'য়ে যায় মিথ্যে।

অবিনাশ ॥ জীবনের সত্যিটা কোথায় ? [র‍্যাকের কাছে গিয়ে ফাইল ঘাঁটতে থাকে]

উমা ॥ কেন, তোমাতে আমাতে।

অবিনাশ ॥ কথাটা অবশ্য শুনতে ভালই লাগে।

উমা ॥ [হাতের সোয়েটারের দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা ? সত্যি বলো তো, তুমি কি রসিকতা করছ ?

অবিনাশ ॥ দূর ছাই, ফাইলটা যে কোথায় গেল !

উমা ॥ তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

অবিনাশ ॥ কি কথা?

উমা ॥ না, থাক।

অবিনাশ ॥ কি হল?

উমা ॥ আচ্ছা তুমি মিথ্যে মিথ্যে কেন এত রেগে আছ বলতে পার?

অবিনাশ ॥ জীবনের সবটাই মিথ্যে বলে।

উমা ॥ [অবাক হয়ে] মিথ্যে!

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ উমা, মিথ্যে। সব মিথ্যে। এই সংসার সম্পর্কে আমার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে করে চলেছে প্রবঞ্চনা, ঠগবাজি আর জালিয়াতি। মিষ্টিমুখে মধুর বাণী দেওয়া হয় আর ভেতরে ভেতরে ছুরি শানান হয়।

উমা ॥ এটা তোমার নিশ্চয়ই ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের নতুন অভিজ্ঞতা।

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, তাই। আমি তার জন্যে গর্বিত। এই চাকরিই আমার সমাজকে চিনতে সাহায্য করেছে উমা—তাই—

উমা ॥ কিন্তু, স্ত্রীকে চেনবার জন্যে চাকরীর সাহায্যের দরকার হয় কি?

অবিনাশ ॥ জানিনা। তবে একথা জানি, আজ অবধি আমার হাত থেকে কোন কেস ফসকে যায়নি। অতি বড় যে নেতা দশ বছর আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কাজ করছে, যাকে কেউ ধরতে পারেনি, আমি তাকে ধরেছি। এমনি দিনে দিনে ধাপে ধাপে প্রমোশন পেয়ে আমি আজ এতো বড় হয়েছি। কিন্তু একটা যায়গায় এসে আমি নিজের পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি।

উমা ॥ [চমকে উঠে] কো-কোথায়? [একটু অস্থির হয়ে পড়ে]

অবিনাশ ॥ [হেসে] তুমি একটু বিচলিত হোয়ে পড়লে মনে হচ্ছে—

উমা ॥ [নিজেকে সামলে নিয়ে] কৈ, নাতো। [হাসবার চেষ্টা করে]

অবিনাশ ॥ মিছে ঢাকবার চেষ্টা কেন করছ উমা, তোমার মুখ বলছে তুমি বেশ খানিকটা বিচলিত হয়ে পড়েছ।

উমা ॥ তোমরা যে সব কথা বল ভাবতে গেলেই আমরা শিউরে উঠি।

অবিনাশ ॥ আমাদের কথা শুনে তোমরা শিউরে ওঠো। আর তোমাদের মধুর বাণী শুনে আমরা চমকে উঠি। ভাবি, এই বুঝি ছুরি শানাচ্ছ!

উমা ॥ তুমি আজকাল ঠারে ঠারে কি যে বল, আমি কিছুই বুঝি না। মাত্র দু'বছর তো আমাদের বিয়ে হয়েছে—

অবিনাশ ॥ আর ছ'মাসেই আমাদের মধ্যে একটা পাঁচিল উঠে গেছে—তাই না ?

উমা ॥ কিন্তু কেন সেই পাঁচিল ? বল না ? [কাছে গিয়ে আদর করে হাতটা চেপে ধরে]

অবিনাশ ॥ আমারও তো সেই প্রশ্ন, কেন এই পাঁচিল ? যাক্। [দীর্ঘ-নিঃশ্বাস] এক গ্লাস জল দাও, গলাটা শুকিয়ে গেছে। [হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে আসে]

উমা ॥ শুধু গলাটা নয় মনের ভেতরটাও। সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে তুমি একটা যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছ।

অবিনাশ ॥ সেও ভাল ! যন্ত্র মানুষকে ঠকায় না।

উমা ॥ [উত্তেজিত হয়ে] কি বলছ তুমি ?

অবিনাশ ॥ কিছু নয়, জল দাও।

উমা ॥ তোমাতে আমাতে সম্পর্কটা কি শুধু জল খাওয়া আর খাবার খাওয়ার মধ্যে থাকবে ?

অবিনাশ ॥ না দাও, চলে যাব। রাস্তায় এখনো জল পাওয়া যায়। [যাইতে উদ্যত]

উমা ॥ দাঁড়াও। তার দরকার হবেনা, যতদিন সংসারে আছি দিতে হবেই। [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

[অবিনাশ একমুহূর্ত এ দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর টেবিলের ওপর থেকে ফাইলটা তুলে নিয়ে ছুটে চলে যায়]

[প্রস্থান]

[কিছুক্ষণ বাদে এক গ্লাস জল হাতে প্রবেশ করে উমা]

উমা ॥ এই নাও জল। মনটা একটু ঠাণ্ডা— ! ওঃ চলে গেছে ! [শোফায় বসে পড়ে আপন মনে কপালটা চেপে ধরে, প্রবেশ করে মুখে এক-মুখ দাড়ি-গোঁফ নিয়ে অশোক]

অশোক ॥ দিদি— !

উমা ॥ [হঠাৎ চমকে উঠে] কে ? অশোক, তুই আবার এসেছিস ? তুই কেন এ বাড়িতে আসিস অশোক ?

অশোক ॥ দিদি, তুইও আমায় তাড়িয়ে দিবি ? জানি দিদি জানি। আমি তো তোর আপন ভাই নই। নিজের ভাই যদি আসতো তাকে তাড়াতে পারতিস না এই সময়ে। কোলের মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিতিস।

উমা ॥ অশোক তুই আমায় ভুল বুঝিসনি রে। আমি জানি তুই বিপদে পড়েই আমার কাছে আসিস।

অশোক ॥ দিদি, আজ আমি বড় বিপদে পড়েই এসেছি রে। পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম, দেখি একজন চেনা সি-আই-ডি পেছনে ফলো করছে। তাই এ-গলি ও-গলি দিয়ে পালিয়ে এসে দেখি দাদাবাবু বেরিয়ে গেল। একেবারে তোর বাড়িতে ঢুকেছি।…ও বেটা চিনে জোঁকের মত ধরেছে। হয়তো আজ আর ছাড়বে না।

উমা ॥ আচ্ছা, তোকে ধরে ওরা কি করবে রে?

অশোক ॥ ওরা আমায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেও পাঠাতে পারে—ফাঁসিকাঠেও ঝোলাতে পারে—

উমা ॥ [চমকে ওঠে, তারপর ফেটে পড়ে] অশোক, কেন তুই এই সব করতে গেলি? দেশোদ্ধার না করলে কি তোর চলত না?

অশোক ॥ দেশকে ভালবেসেছি যে রে।

উমা ॥ তবে এবার দেশের জন্যে ফাঁসি বরণ কর—তোরা কি রে! তোরা কি মানুষ—

অশোক ॥ হয়তো একদিন তাই হবে। তবে আজই যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে রে। আমাদের ব্রত যে এখনও সফল হয়নি।

উমা ॥ তাহলে আমি কি করতে পারি বল—

অশোক ॥ তুই আমাকে আজকের রাতটা তোর দেওরের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করে দে।

উমা ॥ আচ্ছা অশোক, তোর দাদাবাবুকে বলি না?

অশোক ॥ দাদাবাবুকে আমি সত্যিই ভয় করি দিদি। সেবার আমার দুজন বন্ধুকে যখন ধরিয়ে দিল, দাদাবাবুকে কতো অনুনয়-বিনয় করেছিলুম। দাদাবাবু শুধু একটি কথাই বলল, আমার চাকরির প্রমোশন যেখানে জড়িয়ে রয়েছে সেখানে তোমার কথা রাখতে আমি পারব না। [একটু থেমে] তাদের সংসারটা একেবারে ভেসে গেল দিদি।

উমা ॥ আমি কি করতে পারি বল?

অশোক ॥ দিদি তোর দেওরের বাড়িতে আমার থাকার বন্দোবস্ত কর। আমি চেষ্টা করছি চলে যাবার। যদি ফাঁক পাই চলে যাবও। আর একান্তই যদি যেতে না পারি, আবার ফিরে আসব। তখন যেন তাড়িয়ে দিসনি রে— [প্রস্থান]

[উমা কি করবে ঠিক করতে না পেরে ভাবছে। প্রবেশ করে অবিনাশ]

অবিনাশ ॥ উমা!

উমা ॥ [আচমকা] কে? ওঃ। তুমি হঠাৎ আবার!

অবিনাশ ॥ আমার হঠাৎ আশাটা বোধহয় ঠিক হল না?

উমা ॥ না না। বলছি তুমি কি কিছু ফেলে গেছ?

অবিনাশ ॥ ফেলে আমি গেছি অনেক কিছুই, যাক্ তোমার এতো নার্ভাস হবার কি আছে!

উমা ॥ কৈ—না—তো।

অবিনাশ ॥ জানো উমা, যে লোকটিকে ধরবার জন্যে আমি প্রাণপাত চেষ্টা করছিলুম, সৌভাগ্যবশত আজ তাকে দেখে ফেলেছি।

উমা ॥ এবার তাহলে আরো এক ধাপ ওপরে উঠবে বলো?

অবিনাশ ॥ না, আমি তা ভাবছিনা। ভাবছি আমার মতো একজন জাঁদরেল সি-আই-ডির চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে থাকবে কতোদিন? ওকি! তোমার হাতের সোয়েটারটা যে ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে? ওটা তোল। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

উমা ॥ [তাড়াতাড়ি সোয়েটারটা তুলে নেয়] ওঃ!

অবিনাশ ॥ সোয়েটারের মালিকের সঙ্গে মন মেলাতে পারছ না বলে ঐ ভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হয় কি?

উমা ॥ এ তুমি কি বলছ গো? [একটু মুসড়ে পড়ে]

অবিনাশ ॥ খুব খারাপ বললাম? বেশ কথাটা ফিরিয়ে নিলাম।

উমা ॥ তুমি মিছিমিছি কেন আমার সঙ্গে ঝগড়া করছ বলো তো?

অবিনাশ ॥ স্বভাব বলতে পারো।

উমা ॥ সত্যি, এগুলো তোমার খুবই বদ স্বভাব। সেবার ঝিটাকে মিথ্যে সন্দেহ করে তাড়িয়ে দিলে। ও চুরি করেনি, তুমি জোর করে বললে হ্যাঁ করেছে।

অবিনাশ ॥ ঝিটাকে চোর সন্দেহ করাটা ভুলই হয়েছিল অবশ্য। আর সেজন্য সত্যি তোমার কৃতিত্ব আছে। কিন্তু—

উমা ॥ এরকম ভুল তুমি বারে বারেই করে থাকো।

অবিনাশ ॥ না। ভুল একবারই হয়। যাক ও কথা, আমি ভাবছি উমা, আমার ভাল তুমি আর সহজ মনে গ্রহণ করতে পারছ না বোধহয়।

উমা ॥ কি যে বলো তুমি।

অবিনাশ ॥ বেশ প্রমাণ হয়ে যাক। আমি যা বলব, তুমি ঠিক ঠিক উত্তর দেবে?

উমা ॥ দোব।

অবিনাশ ॥ তাহলে বলো একটু আগে যে লোকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল, সে-কে?

উমা ॥ [একটু বিচলিত হয়ে পড়ে] কো-কোন লোকটা? বলো তো?

অবিনাশ ॥ এ রকম লোক আরো আসে নাকি? ঐ যে সুন্দরপানা লোকটা, সত্যি লোকটা খুবই সুন্দর।

উমা ॥ [ভয়ে সমস্ত শরীরটা তার ঘামছে, তবু শক্ত থাকার চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে হাসবার চেষ্টা করে] ওঃ! ঐ গোঁফ-দাড়িওলা লোকটার কথা বলছ?

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, লোকটা কে? [একটা সিগার ধরায়]

উমা ॥ ঐ লোকটা! [কি বলবে ভেবে না পেয়ে] ঐ লোকটা তো—

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, ঐ লোকটা কে?

উমা ॥ আমার বাপের বাড়ির কাছেই থাকে। ও একটা পাগল—

অবিনাশ ॥ একেবারেই পাগল!

উমা ॥ কিছুটা—[হাসতে হাসতে] একেবারে হলে কি আসতে পারে!

[উমা চুপ করে দাঁড়িয়ে সোয়েটারে কাঠি দিতে ব্যস্ত]

অবিনাশ ॥ কি জন্যে আসে? বল? চুপ করে থেক না? সোয়েটারটা পরে বুনলেও চলবে, আগে উত্তর দাও।

উমা ॥ এমনি। আসবে আবার কেন—আমার কাছে কোন দরকার থাকতে পারে না বুঝি?

অবিনাশ ॥ না, তা আমি বলছি না।

উমা ॥ তোমার কাছে তো কত লোকই আসে, সব খবর কি আমি জানতে চেয়েছি?

অবিনাশ ॥ তোমার বাপের বাড়ির লোক, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করে না। তাই জিজ্ঞেস করছি। আর কিছু নয়।

উমা ॥ তোমার সঙ্গে দরকার হলেই দেখা করবে। এখন আমার কাছে মা পাঠিয়েছে কিনা।

অবিনাশ ॥ ওঃ, তোমার মা পাঠিয়েছেন। ভাল, ওর নাম কি?

উমা ॥ তোমার এতো জানবার কি দরকার বলো তো? তোমার কর্তৃপক্ষরা কি এখানেও ডিটেকটিভগিরি করতে পাঠিয়েছে?

অবিনাশ ॥ ওটা যে আমার মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করে গেছে। না করে যাই কোথায় ?

উমা ॥ তোমার যা ইচ্ছে করো। আমি যাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

অবিনাশ ॥ উমা !

উমা ॥ আমার অতো সময় নেই। রান্নাবান্না করতে হবে না বুঝি।

[প্রস্থান]

অবিনাশ ॥ [আপনমনে] হুঁ, আচ্ছা ! [নিভে যাওয়া সিগারটা ধরিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে এক মনে কি চিন্তা করে]

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ, ছুটে ভেতর থেকে ধড়ফড় করতে করতে প্রবেশ করে উমা]

উমা ॥ আমি আসছি—এক মিনিট—[বাইরের দিকে যাবার জন্যে এগোয়]

অবিনাশ ॥ দাঁড়াও। [উঠে দাঁড়িয়ে] কোথায় যাচ্ছ ?

উমা ॥ [জোর করে যেতে চায়, অবিনাশ কাছে এসে বাধা দেয়] কেন—কেন আমায় যেতে দেবে না তুমি ?

অবিনাশ ॥ না, তুমি যাবে না।

[একবার রিভলবারটা পকেট থেকে বার করে দেখে নেয়]

উমা ॥ একি তোমার হুকুম ?

অবিনাশ ॥ [ধমক দিয়ে] হ্যাঁ, আমার আদেশ। আমি তোমার স্বামী, আমি আদেশ করছি, তুমি যাবে না।

[নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ]

উমা ॥ না, আমি কোন আদেশ মানব না, আমি যাবই—

অবিনাশ ॥ তোমায় যাওয়াচ্ছি আমি।

[উমা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, অবিনাশ ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। প্রবেশ করে মোহন। দু'জনেই হকচকিয়ে যায়, উমা হাঁপ ছেড়ে ভেতরে চলে যায়]

মোহন ॥ এদিকে একবার এসেছিলুম তাই ভাবলুম, তোমার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।...তোমার স্ত্রীর হাতের এক কাপ চা অন্তত খাওয়াও।

অবিনাশ ॥ [চেঁচিয়ে] উমা, দু' কাপ চা দাও তো।

মোহন ॥ সেই তোমার বিয়েতে এসেছিলুম আর আজ। সত্যি তোমার বিয়েতে যা ফুর্তি হয়েছিল, অফিস-স্টাফের কেউ এখনও ভুলতে পারে নি। তারপর কিরকম কাজকর্ম দিচ্ছ ?

অবিনাশ ॥ আমার এখন আর হয়ে উঠছে না।

মোহন। সত্যি অবিনাশ, পলিটিকাল কেস দিয়ে অফিসে যা স্থনাম করেছ, এতো স্থনাম আর উন্নতি কেউ করতে পারল না। আমাদের হিংসে হয়।

অবিনাশ ॥ চেষ্টা করলে তোমারও হবে।

মোহন ॥ আর হবে! কি বলব দুঃখের কথা ভাই, একটা কেস নিয়ে কতদিন যে ঘুরছি কি বলব। কিছুতেই বাগে পাচ্ছি না। বেটারা যেন একেবারে শয়তানের ডুগিতবলা।

[প্রবেশ করে উমা, হাতে দু'কাপ চা]

অবিনাশ ॥ কি কেস ওটা?

মোহন ॥ পলিটিকাল কেস। ফেরারী আসামী, ধরলেই প্রমোশন।...আস্থন বৌদি, আপনার সঙ্গে সেই বিয়ের রাত্রে পরিচয় হয়েছিল, হয় তো ভুলে গেছেন।

উমা। না, ভুলব কেন?

[চা দেয়, দু'জনেই চা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে]

মোহন ॥ আপনার হাতের চা'টা কিন্তু বড় ভাল।

উমা ॥ ও! আচ্ছা যাই, কেমন?

মোহন ॥ আস্থন, নমস্কার।

উমা ॥ নমস্কার।

[উমা নমস্কার জানিয়ে প্রস্থান করে]

মোহন ॥ অবিনাশ, তোমার স্ত্রীর ব্যবহারটি বড় মিষ্টি হে।

অবিনাশ ॥ [বাঁকা হাসি হেসে] হে—হে—তাই নাকি!

মোহন ॥ কি বলব দুঃখের কথা ভাই, ঘরে ঐরকম স্ত্রী যদি থাকতো জীবনটা সত্যিই সার্থক হোত।

অবিনাশ ॥ দুঃখ হচ্ছে? আর একটা করে ফেল না।

মোহন ॥ ইচ্ছে তো আছে। জান, আমার স্ত্রী ছিল ঘরের লক্ষ্মী। তার সেই মূর্তিটাকে এখনো দেখতে পাই, আমার বড় মেয়েটার মুখ দেখে। যাক্—

অবিনাশ ॥ আর একটা নতুন এলে সেটাকেও ভুলে যাবে।

মোহন ॥ সে যে ছিল আমার ঘরের লক্ষ্মী ভাই, তাকে কি ভোলা যায়? যায় না। অনেক চেষ্টা করেছি। [দীর্ঘনিঃশ্বাস]

অবিনাশ ॥ মানুষের মন তো চিরকাল শূন্যতার বেদনায় হাহাকার করতে

পারেনা। যা হারিয়ে গেছে—তার জন্যে সারা জীবন শূন্য ঘরে বসে কাঁদাটা মানুষের স্বভাব নয়।

মোহন ॥ তাই আসলের বদলে নকল নিয়ে কি আর খুসি থাকা যায় ভাই?

অবিনাশ ॥ আসল বলে যাকে তুমি জান, তাকে যখন ফিরে পাবার কোন আশাই নেই, তখন নকলকে কেন আসল বলে গ্রহণ করবে না বল? এইটেই তো প্রাকৃতিক নিয়ম।

মোহন ॥ তুমি ঠিকই বলেছ। ফিরে তো আসবে না। তাই—পুরাতন ক্ষতটা ভোলবার চেষ্টা আমাদের করা উচিৎ। কিন্তু পারছি না। এইটেই হয়তো মানুষের স্বভাব। যাক—[দীর্ঘনিঃশ্বাস] ছেড়ে দাও ওসব কথা। ভাবতে গেলে নিজের মনটাই কেমন হয়ে ওঠে। আমি যাই, ওদিকে আবার কেসটা ফসকে যাবে।

অবিনাশ ॥ তোমার কাজের সফলতা কামনা করি মোহন।

মোহন ॥ অন্তর থেকে করছ তো? এ্যাঁ। হে হে হে হে। [প্রস্থান]

[অবিনাশ একটা সিগার ধরায়, বাইরের দরজায় টোকা মারার শব্দ। "চিঠি"—অবিনাশ উঠে গিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে পড়ে। আর রাগে ফুলতে থাকে]

অবিনাশ ॥ মা পাঠিয়েছেন!...এতো বড় মিথ্যে কথা!—ও তাহলে কি না করতে পারে? কোনদিন রাত্রিবেলা আমার গলায় ছুরি বসাতেও তো পারে? একেবারে মিথ্যের বেসাতি।

[একটা তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে প্রবেশ করে উমা, অবিনাশ তাড়াতাড়ি চিঠিটা লুকিয়ে ফেলে]

উমা ॥ তোমার বন্ধুটির স্ত্রী বোধহয়—

অবিনাশ ॥ মারা গেছে।

উমা ॥ ওকে দেখেই আমার ঐটে মনে হল। সত্যি লোকটা কতো দুঃখী।

অবিনাশ ॥ দুঃখটা কিসের?

উমা ॥ স্ত্রী বিয়োগ। অর্থাৎ বৈধব্যের। [হাসে]

অবিনাশ ॥ ও আবার বিয়ে করে—নতুন করে সংসার গড়তে চলেছে—

উমা ॥ কিন্তু পুরোন সেই মধুর স্মৃতিগুলো ভুলতে পারছে না।

অবিনাশ ॥ পুরোন ক্ষতর দাগ বেশীদিন থাকে না উমা।

উমা ॥ না থাকে না থাক। রান্না হয়ে গেছে খাবে চলো।

অবিনাশ ॥ ইচ্ছে নেই।

উমা ॥ তোমার বন্ধু আমার এতো সুখ্যাতি করে গেল, এখনো রাগ পড়েনি?

অবিনাশ ॥ সুখ্যাতি !

উমা ॥ হ্যাঁ, ঐতো বলল। তোমার স্ত্রী বেশ মিষ্টি—আরো কতো কী।

অবিনাশ ॥ ওঃ।

উমা ॥ তোমার সুখ্যাতি কেউ আমার কাছে করলে, মনটা কিরকম ভরে ওঠে। সমস্ত রাগ একেবারে জল হয়ে যায়—

অবিনাশ ॥ উমা—[কিছু বলার জন্যে মুখটা তোলে]

উমা ॥ কি বলো ?

অবি ॥ না থাক। [বলতে পারেনা]

উমা ॥ তোমার ঐ সি-আই-ডি ডিপার্টমেণ্টের চালচলন দয়া করে একটু বন্ধ করে সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করার ব্রত নাও তো। এতে আমাদের সাংসারিক জীবনটা আরো সুখী হবে। না হলে বড় অশান্তি।

অবিনাশ ॥ সাংসারিক জীবন চালাতে সি-আই-ডি ডিপার্টমেণ্ট কোন বাধাই সৃষ্টি করছেনা উমা।

উমা ॥ করছে। সাংঘাতিকভাবে করছে।

অবিনাশ ॥ দিন দিন আমি বড় বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ছি।

উম ॥ সেটা আমিও লক্ষ্য করছি। কিছু দিন বাইরে গেলে ভাল হয়।

অবিনাশ ॥ হয়তো ভাল হয়।

উমা ॥ আচ্ছা তোমার সেই কেসটার কি খবর ?

অবিনাশ ॥ আমার আর কিছুই ভাল লাগছে না।

উমা ॥ কেন, বলো না ?

অবিনাশ ॥ এমন একটা ডিপার্টমেণ্টে আমি চাকরি করি, যেখান দিয়ে ছুঁচও গলে না। সেই জাঁদরেল অফিসার অবিনাশ সেনের চোখে ধুলো দিয়ে একজন নির্বিবাদে চলে যাচ্ছে। এ যে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনা উমা, এ যে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিনা।

উমা ॥ এই নিয়ে পাঁচশো বার শুনলুম। এখন খাবে চল।

অবিনাশ ॥ [উমার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে] উমা, তুমি বলো ঐ লোকটি কে ?

উমা ॥ হয়েছে বাবা হয়েছে। আর তোমার প্রমোশনের দরকার নেই। এবার দয়া করে বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতে কাটাও দিকি।

অবিনাশ ॥ শান্তি আমার কেড়ে নিয়েছে।

উমা ॥ কে নিয়েছে ?

অবিনাশ ॥ [ধমকের সুরে] হেঁয়ালী কোরো না। আমি জানতে চাইছি ঐ লোকটা কে?

উমা ॥ বেশ তো, পরে বলবোখন।

অবিনাশ ॥ পরে নয়, এক্ষুনি।

উমা ॥ এতো অধৈর্য হবার কি আছে?

অবিনাশ ॥ ধৈর্যের বাঁধ আমার ভেঙ্গে গেছে। আমি এক্ষুনি জানতে চাই।

উমা ॥ সবটাতেই এতো ব্যস্ত কেন?

অবিনাশ ॥ তুমি তো জান, আমি যাকে ধরব মনে করি তাকে না ধরা পর্যন্ত আমি জলস্পর্শ করি না। বলো, লোকটির সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

উমা ॥ বিশ্বাস করো, তুমি যা ভাবছ ও তা নয় গো।

অবিনাশ ॥ আমি বিশ্বাস করি না।

উমা ॥ বাবা অগ্নিসাক্ষী করে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন! আমি মিথ্যে বলিনি।

অবিনাশ ॥ এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও আমি আর বিশ্বাস করব না। তুমি আমার মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছ। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ।

উমা ॥ না।

অবিনাশ ॥ তুমি ছলনা করেছ আমার সঙ্গে—

উমা ॥ না।

অবিনাশ ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] করোনি?

উমা ॥ না-না-না।

অবিনাশ ॥ প্রমাণ চাও?

উমা ॥ দাও প্রমাণ।

অবিনাশ ॥ তুমি একটু আগে বলছিলে না, ঐ লোকটিকে তোমার মা পাঠিয়েছেন?

উমা ॥ হ্যাঁ, বলেছি, তাতে কি হয়েছে?

অবিনাশ ॥ তোমার মায়ের একখানা চিঠি এইমাত্র এলো, এই যে, কৈ তাতে তো তোমার ঐ লোকটার কথা লেখা নেই? কি, চুপ করে রইলে কেন? [একটু থেমে] উমা, এখনো বলছি, তুমি আমার ভালবাসাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না।

উমা ॥ না, আমি তোমার কোন ক্ষতিই করিনি—

অবিনাশ ॥ তুমি আমার মনকে বিষিয়ে দাওনি?

উমা ॥ [কেঁদে ফেলে] না গো না, ওটা তোমার মনের ভুল—

অবিনাশ ॥ তুমি জান না উমা, ও আমার রাতের ঘুম আর দিনের খাওয়া সব কেড়ে নিয়েছে।

উমা ॥ ওর জন্যে তুমি ভেব না। ও তোমার কোন ক্ষতিই করবে না গো।

অবিনাশ ॥ আমি শুধু জানতে চাই ওর নাম, ওর ঠিকানা। উমা, সত্যি যদি তুমি নিষ্পাপ হও, তোমার বলতে আপত্তি কোথায়? চুপ করে থেক না, বল—উমা। [চিন্তা করে, বাইরে থেকে একটা কথা ভেসে আসে—"দিদি, আমি তোর আপন ভাই নয়, বলেই আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছিস। দাদ.বাবুকে সত্যিই আমি ভয় করি। তুই জানিস না দিদি, ওরা আমার জীবনটা নষ্ট করে দেবে"] না—না না। আমি বলতে পারব না, আমি কিছুতেই বলতে পারব না।

অবিনাশ ॥ ওঃ! তাই নাকি? তাহলে প্রস্তুত হও, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

[অবিনাশ দু'টো হাত উমার গলার দিক লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়, উমা ভয়ে জড়সড় হয়ে পেছনে সরতে থাকে]

উমা ॥ সেই ভাল। ওগো মেরেই ফেল। তোমার যদি আমার প্রতি এতটুকু বিশ্বাস সেই, মেরেই ফেল।

অবিনাশ ॥ বিশ্বাস! হাঃ—হাঃ—[উচ্চ ব্যঙ্গ হাসি] অসতী, কুলটা—[এক-পা এক-পা করে এগোয়] বেইমান—সে আবার বিশ্বাসের কথা বলে! না, আমি বিশ্বাস করি না—[এক-পা এক-পা করে এগোয়—উমা দেওয়ালের গায়ে সেঁটে গিয়ে কেঁদে ফেটে পড়ে]

উমা ॥ তুমি আমায় মেরে ফেলবে?

অবিনাশ ॥ হ্যাঁ, আমি তাও করতে প্রস্তুত।

উমা ॥ তুমি এত নীচ। তোমার ভালবাসার স্ত্রীকে তুমি মেরে ফেলবে?

[কেঁদে নিচে পড়ে যায়]

অবিনাশ ॥ যে আমার জীবনের শান্তিটুকু কেড়ে নিয়েছে, তাকে আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে দেব না। [মাটি থেকে উমার গলাটা ধরে তুলতে যায়, উমা অবশ হয়ে আবার নিচে পড়ে যায়] তুমি যেমন করে আমার মনের মধ্যে আগুন জালিয়ে দিয়েছ, ঠিক তেমনি করে তোমার শান্তির নীড় আমি ভেঙ্গে দেব, কেউ জানতে পারবে না।

[গলাটাতে চাপ দিতে যাবে। পেছন দিকে তাকিয়ে, কাঁপতে কাঁপতে প্রবেশ করে অশোক। দরজা ঠেলার শব্দ পেয়েই অবিনাশ আচমকা হাত সরিয়ে নেয়]

অশোক ॥ দিদি—ওরা—একি ! [চমকে ওঠে] আপনি !

অবিনাশ ॥ [হঠাৎ চমকে ওঠে] কে ? কে আপনি ?

অশোক ॥ আমায় বাঁচান। আপনার কাছে এসেছি প্রাণ ভিক্ষা করতে। আপনি আমায় বাঁচান।

অবিনাশ ॥ [অবাক হয়ে] আপনি ? আপনি কে ?

অশোক ॥ আমি আপনার খুড়তুত শালা, অশোক। আপনার মধ্যে যদি এতোটুকু দেশপ্রেম থাকে আমায় ধরিয়ে দেবেন না।

অবিনাশ ॥ অশোক, তুমিই আমার বাড়িতে আসতে ?

অশোক ॥ হ্যাঁ।

অবিনাশ ॥ [অনুশোচনায় মাথা হেঁট করে ফেলে] ছি—ছি—ছি—ছি—ছি, আমি কি জঘন্য মানুষ !

অশোক ॥ দাদাবাবু, ওরা এসে গেছে, ঐ জুতোর শব্দ।

অবিনাশ ॥ [অন্যমনস্ক ছিল] এ্যাঁ, কিন্তু কি হয়েছে ?

অশোক ॥ আপনি কি আমায় ধরিয়ে দেবেন !

অবিনাশ ॥ কেন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা। কি হয়েছে আমায় বল ?

[নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ]

অশোক ॥ সব পরে বলবো। এই মুহূর্তে আপনি আমায় বাঁচান—

অবিনাশ ॥ উমা ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। [উমা ও অশোকের প্রস্থান] ভিতরে আসুন। [প্রবেশ করে মোহন] ওঃ, মোহন ! আবার কি মনে করে ?

মোহন ॥ অবিনাশ ভাই,আর একবার তোমায় জ্বালাতে এলুম। আমার জন্যে তুমি এইটুকু উপকার নিশ্চয়ই করবে।

অবিনাশ ॥ [না-জানার ভান করে] কি হয়েছে বলো না ?

মোহন ॥ সত্যি যদি তুমি আমার বন্ধু বলে মনে করো, তাহলে আমায় বিমুখ কোরোনা ভাই।

অবিনাশ ॥ বলো-ই না।

মোহন ॥ দেখ, আমার আসামীটা তোমাদের এই গলির মধ্যে এলো। আমি ঐ মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। এক সেকেণ্ডের মধ্যে ছায়ার মত বেরিয়ে এলো। ও নিশ্চয়ই তোমার বাড়িতে ঢকেছে, একটু দেখ না ভাই।

অবিনাশ ॥ আমি তো বাড়িতেই ছিলুম, কৈ, কেউ তো আসেনি !

মোহন ॥ আমার নিজের চোখকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না। আমি নিজে দেখেছি, এই বাড়িতেই ঢুকলো। অথচ তুমি বলছ—

অবিনাশ ॥ এখানে কেউ আসেনি, ওটা তোমার চোখের ভুল।

মোহন ॥ চোখের ভুল ! হুঁ ! বুঝেছি।

অবিনাশ ॥ কি বুঝলে ?

মোহন ॥ তুমি আমার মুখের শিকার চুরি করে প্রমোশন মারতে চাও—

অবিনাশ ॥ [উত্তেজিত হয়ে] মোহন, কি বলছ তুমি একটু ভেবে দেখ।

মোহন। ঠিকই বলেছি। লোভী, স্বার্থপর। তুমি আরো অনেকেরই মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়েছ।

অবিনাশ ॥ কে বলেছে তোমায় ?

মোহন ॥ আমি জানি। আর এও জানি তুমি কেমন করে বড় হয়েছ।

অবিনাশ ॥ [ধমকের স্বরে] মোহন—

মোহন ॥ [অনুনয়ের স্বরে] অবিনাশ, তুমি আমার বন্ধু। আমি তোমার কাছে অনুরোধ করছি, তুমি আমার আসামীকে ফিরিয়ে দাও। তুমি জান না অবিনাশ, আমি আবার নতুন করে সংসার গড়তে চলেছি। এক নিমেষে তুমি আমার স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিও না !

অবিনাশ ॥ আমি কি করেছি তোমার ?

মোহন ॥ আমি যখন আমার শিকারকে কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছি, তুমি তখন বাঘের মত এসে তাকে গিলে নিলে। আমি তা সহ্য করতে পারব না। [উত্তেজিত হয়ে] বলো, তুমি আমার আসামী ফিরিয়ে দেবে কি না ?

অবিনাশ ॥ আমি জানি না।

মোহন ॥ এতো সহজে আমার শিকার তোমায় হজম করতে দেব না অবিনাশ। আমি ওকে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করব।

অবিনাশ ॥ [উত্তেজিত হয়ে] তোমার যা ইচ্ছে করগে, যাও।

মোহন ॥ যাব ! নিশ্চয়ই যাব। তবে যাবার আগে বলে যাই, আমার শিকার লুকিয়ে রেখে তুমি ভেবনা নিষ্কৃতি পাবে ?

অবিনাশ ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] তুমি তোমার আসামীকে পাবার জন্যে যা ইচ্ছে করো গে।

মোহন ॥ সেটা আমি করব অবিনাশ। বন্ধুত্বের প্রতিদান তুমি যা দিলে, আমিও তার পাল্টা প্রতিদান দিতে জানি।...মনে রেখ, স্বার্থ যেখানে

প্রবল, হিংসা সেখানে দৃঢ়। আমি পুলিস এনে এক্ষুনি ওকে ধরিয়ে দেব। আর তার সঙ্গে তোমাকেও জড়িয়ে নোব।

অবিনাশ॥ [ভয়ে কেঁপে উঠে] মোহন এসব কি বলছ তুমি ?

মোহন॥ [যেতে গিয়ে ফিরে এসে] অবিনাশ, ঐ ফেরারী আসামীটার সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা আমি জানি। ও তোমার পরম আত্মীয়, শ্যালক, তাই না ? হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ

[প্রস্থান]

[অবিনাশ কিছুক্ষণ ঐ দিকে তাকিয়ে থাকে, আস্তে আস্তে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসে। আপন মনে চিন্তা করতে করতে একটা সিগার ধরায়।]

অবিনাশ॥ [আপন মনে] অশোককে ধরিয়ে দিলে একটা লিফ্‌ট্ পাওয়া যাবে। [লোভে চোখ দু'টো জলছে] প্রমোশন! আর সে আমারই ঘরে বসে আছে! বাঃ! চমৎকার! [আবার ভয়ে হঠাৎ শরীরটা কেঁপে ওঠে] ঠিকই তো! ও ফেরারী আসামী! আমার বাড়িতে রাখা তো ঠিক নয়! [একটু ভেবে] ওকে তাড়িয়ে দোব! কেন? ধরিয়ে দিলেই বা দোষ কি? ও তো আমার আপন শালা নয়? না ঐ ফেরারী আসামীটাকে আর এক মুহূর্ত এখানে রাখা চলবে না।

[প্রবেশ করে এক গ্লাস জল ও থালায় কিছু খাবার নিয়ে উমা। অবিনাশ নিজেকে একটু সামলে নেয়]

উমা॥ নাও একটু জল খাও।

অবিনাশ॥ [মুখের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে] উমা।

উমা॥ কি! বলো ?

অবিনাশ॥ [মুখ থেকে কোন প্রকারে বেরল] অ-শো-ক—না, মানে। অশোককে বোধহয় আর এখানে রাখা সম্ভব নয়। তাই—!

উমা॥ সে আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। তোমাদের আলোচনা এমন পর্যায়ে উঠে পড়ল, দেখে দস্তুরমত আমার ভয় করছিল।

অবিনাশ॥ হ্যাঁ, আমিও তাই বলছি ওকে—ওকে না—

উমা॥ ওকে আমি ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়ে একেবারে বড় রাস্তায় পার করে দিয়েছি।

অবিনাশ॥ এ্যাঁ! [চিন্তা করে] যাক! [দীর্ঘনিঃশ্বাস] ভালই করেছ।

[নেপথ্যে দরজায় ধাক্কা মারার শব্দে উমা অবিনাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। অবিনাশ প্রথমটা উমার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করে, চোখে চোখে পড়তেই মাথা হেঁট করে ফেলে। নেপথ্যে দরজায় ধাক্কা মারার শব্দ।]

একচিল্‌তে

গিরিশংকর

সময়—রাত এগারটা।

দৃশ্য—কলকাতার ফুটপাথে একটা গাড়ীবারান্দা।

[রাস্তার শুধু একটা অংশ দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যের পেছনে গাড়ী বারান্দার নীচে একটা দোকান ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। বিবর্ণ সাইনবোর্ড ভাল পড়া যাচ্ছে না। সিঁড়ির ওপর বসে আছে আধবুড়ো একটা লোক। মুখে খোঁচা খোঁচা গোঁপ দাড়ী, গভীর রেখা আর জ্বলজ্বলে একজোড়া ক্ষুধিত চোখ। সামনের দিকে গাড়ীবারান্দার একটা থামের গোড়ায় তিন ইঁটের উনুনে মাটির হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে। উনুনের চারপাশে ছড়িয়ে আছে কিছু খড়কুটো। বুড়োটা উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে আসে সামনের দিকে। উনুনের কাছে উবু হয়ে বসে কানে গোঁজা বিড়িটা জুৎ করে ধরায়। একবুক ধোঁয়া ছেড়ে পেছন ফিরে দেখতে পায় বাতাসীকে। বাতাসী পাতলা পাতলা চেহারার মেয়ে—বয়স বোঝার উপায় নেই। শরীরে অনেক ঝড় ঝাপটার ইঙ্গিত। চারপাশের অনুজ্জ্বল আলোয় সব কিছু আবছা দেখা যাচ্ছে। শুধু ঘন বাঁকা ভুরুর নীচে চঞ্চল চোখ দুটো চক্‌ চক্‌ করছে বাতাসীর।]

বুড়ো ॥ গিছলি কই ?

[বুড়োর কথা কানে তোলেনা বাতাসী। ধীর পায়ে এগিয়ে বসে উনুনের সামনে। তাকিয়ে থাকে আগুনটার দিকে। দুটো খড়কুটো গুজে দেয়, দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে আগুন। তার আলোয় দেখা যায় বাতাসীর থ্যাবড়া অথচ স্পষ্ট ঠোঁটে এক টুকরো হাসির মাখামাখি। বুড়ো বাতাসীকে দেখে। হাত বাড়িয়ে ছোঁয়।]

এই শুনলি ?

[ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রুকুটি করে বাতাসী। বুড়ো ঘং ঘং করে হেসে ওঠে। হেলতে দুলতে গিয়ে বসে সিঁড়ির ওপর। খোস মেজাজে প্রাণপুরে টান মারে বিড়িটায়।]

বাতাসী ॥ বজ্জাৎ—ভেড়ুয়া।

বুড়ো ॥ হাঃ হাঃ বজ্জাৎ ! বজ্জাৎ কেরে ? আমি না তুই ?

বাতাসী ॥ নিলজ্জ ! আবার মু' নাড়ে দেথ।

বুড়ো ॥ নাঃ মুখ নাড়বে না। প্যাটের নাড়ীতে পাক খেতেছে। তোর ও গুষ্টির পিণ্ডি নামবে কখন!

বাতাসী ॥ যখন—তখন।

বুড়ো ॥ ইদিকে রাত যে ভোর হতে চল্ল সে খেয়াল আছে?

বাতাসী ॥ আ-হাহা। মরে যাই আমার নাগর রে! সাঁজ বেলায় আস নাই কেনে ভাত বেড়ে দিতাম।

বুড়ো ॥ তোর হ'ল কিরে? খ্যাক্ খ্যাক্ করছিস কেনে?

বাতাসী ॥ তাদে' তোর কি হবে। চুপ মেরে ব'স। পিণ্ডি নামুক—গিলবি!

বুড়ো ॥ তা—গিলতে হবে বৈকি। জ্বাল দে না। দে না ছুটো কুটো গুঁজে।

বাতাসী ॥ চুপ মেরে বসবি তো ব'স। ঘ্যান ঘ্যান করিস নি। [সুর ক'রে] মুরোদ নেই কাজের সুখ চাই আঠার আনা।

বুড়ো ॥ মুরোদ আছে কি নেই—তুই কি জানবি। জানতো কাজীপাড়ার লোক আর জানতো সৌরভী।

বাতাসী ॥ থাক্ আর তোর সৌরভীর ন্যাকামী গাইতে হবে না।

বুড়ো ॥ শোন না বাতাসী। আজ বিষ্টি পড়ছিল না। সন্ধ্যাবেলা। ম'ম' করছিল সোঁদা মাটির গন্ধ—বুকটা ভরে উঠল।

বাতাসী ॥ হুঁ পেরথম বিষ্টি। [ছু'জনের চোখে আমেজ আসে]

বুড়ো ॥ আজো মনটা পোড়ায় রে বাতাসী।

বাতাসী ॥ তোর সৌরভীর লেগে? [হঠাৎ ঝিলিক্ মারে চোখে]

বুড়ো ॥ না—জমির লেগে।

বাতাসী ॥ তা যা না। দেশে ফিরে যা। তোর কি, পুরুষ মানুষ। যা না চাষ বাস করবি।

বুড়ো ॥ চাষ করব! [হাসে] কোথায় রে, বাপের চিতেয়?

বাতাসী ॥ আ মর বুড়ো—কথা কয় দেখনা!

বুড়ো ॥ তা কি বলি বল। জমি বলতে আড়াই বিঘে—তা কি আর এ্যাদ্দিন ভুষুণ্ডীকাকের পেটে যায় নি। [হাসে] শালা বুড়ো হাবড়া আজ আছে কাল নাই—জমির নেশা গেল না! যেন থাবা উঁচিয়ে আছে, জুৎ বুঝলেই হল!

[বুড়ো আর বাতাসী ছু'জনেই যেন পেছনের দিনগুলোর স্বপ্নে ডুবে যায়। একপাশ দিয়ে ভেতরে আসে ধনঞ্জয়, মাঝ বয়েসী পাকানো চেহারা, ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর

লুটোচ্ছে। সিঁড়ির এককোণে বসে। বাতাসী লোকটাকে এক নজরে দেখে নেয়। বুড়ো তখনো অতীতের স্মৃতির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বুড়ো]

নাঃ—তার চে' চ' বাতাসী দুজনায় গাঁয়েই যাই। এখানে বেঁচে সুখ নাই রে।

[ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে]

বাতাসী ॥ হিঃ হিঃ হিঃ [তীক্ষ্ণ তীব্র হাসিতে ফেটে পড়ে বাতাসী] দূর হ দূর হ। বুড়ো বলদার রস দেখনা! হাঃ হাঃ হাঃ!

[পাশের কোন দোতলা থেকে একটা ট্যারচা আলো ঝলসায় গাড়ী বারান্দার নীচে, আর হাসির দমকে এঁকেবেঁকে বাতাসী গিয়ে দাঁড়ায় সেখানে, বুড়ো দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে।]

বুড়ো ॥ বাতাসী!

বাতাসী ॥ এ্যাই আর এগোবি কি আমি অনথ বাধাব বল্লাম। মাগী-মুখো মদ্দ—তোকে না মানা করেছি খবরদার ছুঁবি না—ছুঁবি না আমায়। বাঁজা শয়তান।

[বুড়ো কুঁচকে যায়। বাতাসী যেন ফণা-তোলা সাপের মত দুলতে থাকে ট্যারচা আলোটার নীচে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা মাতাল ঢোকে। থমকে দাঁড়ায় বাতাসীর মুখোমুখী, ঠোঁটের কোণে একটা সিগ্রেট তখনো ধরান হয়নি]

মাতাল ॥ ওয়াণ্ডারফুল! এযে জ্বলন্ত পাবক শিখা!! দেবী বহুদূর হতে, বহুদিন ধরে, অভাজন ভ্রমিয়াছে, সিগ্রেট মুখে [হঠাৎ এগিয়ে চাপা স্বরে] তোমার হৃদয় থেকে একটু আগুন দাও না সখী, সিগ্রেটটা ধরাই।

[বাতাসীর সমস্ত ভঙ্গী এক নিমিষে পাল্টে যায়, ম্যাজিকের মত।]

বাতাসী ॥ একটা পয়সা দাও না। বাবুগো! আজ তিন দিন কিছু খাওয়া হয় নি।

মাতাল ॥ রিয়্যলি—হাঃ - হাঃ - হাঃ। এ যুগটাই হচ্ছে—"বাবুগো আজ তিনদিন কিছু খাওয়া হয়নি"-র যুগ। কুছ নেহী হায়। হটো। হেল্ উইথ দি বেগারস্। বাঃ ঐ তো আগুন [বাতাসীকে] তোমার আগুন নিভে গেছে।

[পকেট থেকে কাগজ বার করতে যায় সিগ্রেটটা ধরাবার জন্য, একটা সিগ্রেটের প্যাকেট পড়ে যায়। মুঠোয় ধরা কতকগুলো ভাঁজ করা কাগজের একটা ভাঁজ খুলে দেখে।]

মাতাল ॥ প্যারা নার্গিস কী তসবির আ-হ-হা।

[ওটা এগিয়ে দেয় উনুনে—থেমে বাতাসীকে বলে]

কই তুমি তো বাংলা ছবির নায়িকার মত আলুথ লু বেশে ছুটে আমার হাত চেপে ধরলে না! নাঃ গোবর গাদার পদ্ম, নো গুড্, নো গুড্।

[সার্টিফিকেটটা ধরায়, তাই দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলে দেয়]

বাতাসী ॥ হেই বাবু দুটো পয়সা দাও না গো।

বুড়ো ॥ তিনদিন কিছু খাইনি বাবু।

মাতাল ॥ [বুড়োকে] চোপরাও তুমকো নেহী দেগা [পকেট হাতড়ায়]

বাতাসী ॥ বাবুগো—

মাতাল ॥ আ-হা-হা—'কোন বন হরিণীর চকিত চপল আঁখি, কেন ছল ছল কেন ছল ছল বেদনাতে।'

[বাতাসীর হাতে কি একটা গুঁজে দেয়]

নাও—The last coin I had—the last coin.

[বাতাসীকে একটা সেলাম ঠুকে বেরিয়ে যায়। বাতাসী একবার সেদিকে তাকায়, আরেকবার তাকায় তার মুঠোর দিকে]

বুড়ো ॥ দে আমার কাছে দে।

বাতাসী ॥ ভাগ্ তোকে দোব ক্যান রে?

বুড়ো ॥ আহা দে না বাতাসী।

বাতাসী ॥ যাঃ যাঃ। সর সর এখান থেকে। যা না গতরটা নেড়ে দুটো কুটো নিয়ে আয় না। ধুমসো কোথাকার। শুধু পড়ে পড়ে পিরিতের ছড়া কাটতে ওস্তাদ।

[এগিয়ে যায় উনুনের কাছে]

বুড়ো ॥ এ্যাই—কথা শোন পয়সা দে।

বাতাসী ॥ দোবনি ভাগ।

[বুড়ো হঠাৎ বাতাসীর মুঠোটা চেপে ধরে। ধনঞ্জয় পেছনে উৎসুক হয়ে উঠে এগিয়ে আসে]

এই ভাল হবেনি। ছাড় ছাড় বলছি।

[বাতাসীর হলদে ছোপ-ধরা দুপাটি দাঁত ঝলসে ওঠে আদিম হিংস্রতায়]

বুড়ো ॥ উঃ—কুত্তী। [হাতখানা টেনে নেয় বুড়ো]

বাতাসী ॥ হিঃ-হিঃ-হিঃ বুড়ো বলদা, ধুমসো বজ্জাৎ, পয়সা নিবিনি।

[দাঁতে দাঁত চেপে বাতাসী এগিয়ে যায়, বুড়ো পিছু হটে]

ধনঞ্জয় ॥ বউৎ আচ্ছা—হাঃ হাঃ [হাসিতে ফেটে পড়ে ধনঞ্জয়]

বুড়ো ॥ দাঁতের পাটি ভেঙ্গে দোব বল্লাম।

ধনঞ্জয় ॥ হোঃ হোঃ হোঃ তাতো দেখতেই পেলাম হাঃ হাঃ হাঃ।

বুড়ো ॥ তুই হারামজাদা এখানে কি চাস—আমাদের মাগী মদ্দর কথায় তুই দাঁত বার করছিস কেন ?

ধনঞ্জয় ॥ বেশ করব। তাতে তোর কিরে ?

বুড়ো ॥ খুনো-খুনি হয়ে যাবে বলে দিলাম।

[বাতাসী তখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রাগে ফুলে ফুলে উঠছিল]

বাতাসী ॥ তুই গিয়ে কুটো আনবি কিনা। কথাটা কাণে গেল ? আজ রেতে পিণ্ডি গিলতে হবে না কি ?

[বুড়ো তাকায় কঠিন চোখে]

আঃ গেল যা—চোখ দিয়ে গিলছে দেখ।

[বুড়ো আর একবার জ্বলন্ত চোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। বাতাসী বসে উনুনের পাশে। ধনঞ্জয় বাতাসীর দেহের রেখায় চোখ বুলোয়। আনমনে মাটি থেকে সিগ্রেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়, আনমনে ওটা খোলে। দেখতে পায় ভেতরে সিগ্রেট রয়েছে। একটা টেনে নেয়, খুসী মনে এগিয়ে আসে সামনে]

ধনঞ্জয় ॥ একটু আগুন দিবি ?

[বাতাসীর টানা ভুরুটা কুঁচকে যায়। ফিরেও দেখে না]

শুনতে পাচ্ছিস।

বাতাসী ॥ তুলে নে না।

[ধনঞ্জয় একটা জ্বলন্ত কুটো থেকে সিগ্রেটটা ধরিয়ে হাসে]

ধনঞ্জয় ॥ ডর লাগে—যা কুলো পানা চক্কর !

বাতাসী ॥ শুধু চক্করেই ডর। বিষের জ্বলুনী তো দেখ নাই।

[খিঁচিয়ে ওঠে বাতাসী। ধনঞ্জয়ের মজা লাগে]

ধনঞ্জয় ॥ তোর দাঁত গুলান ভারী সোন্দোর রে।

বাতাসী ॥ ধার তো দেখেছিস। [ধনঞ্জয় হাসিমুখে হাতটা বাড়িয়ে দেয়]

তুই আবার মরতে এখানে এলি কেন !

ধনঞ্জয় ॥ অজগরের চোখ টানলে খরগোস পালাবে কেমনে শুনি ?

[বাতাসী চোখ ডাগর করে তাকায়]

বাতাসী ॥ মস্করা করবি না এখানে।

ধনঞ্জয় ॥ সে তো মুখে বল্লি।

বাতাসী ॥ ওঃ—আর পরাণে তোকে ডাকলাম—না ?

ধনঞ্জয় ॥ ডাকিস—নাই !

[চোখ ফিরিয়ে নেয় বাতাসী। ওর থ্যাবড়া ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে ওঠে]

হ্যাঁরে, তোর পরাণে মায়া নাই—সোয়ামীর হাতটা জখম করে দিলি।

বাতাসী ॥ ঐ বুড়ো বলদা আমার সোয়ামী নাকি ?

ধনঞ্জয় ॥ তবে ?

বাতাসী ॥ তবে আবার কি! জুটেছে। এই কপালে জুটেছে। হুঃ সোয়ামী—বাঁজা শয়তান ধুমসো।

ধনঞ্জয় ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

বাতাসী ॥ খ্যাক খ্যাক করে হাসছিস কেনে ? ভাগ—ইখান থে, পালা।

ধনঞ্জয় ॥ ইটা কি তোর বাপের জমিদারি—হুকুম করলেই যাব ? আমাকে তোর বুড়া পাস নাই।

বাতাসী ॥ নাঃ—তুমি আমার কেলে মানিক। সোজা করে বল দিনি কি চাস তুই। ইখানে কদিন ধরে ঘুর ঘুর করছিস কেনে—যা না কলকেতা শহরে ফুটপাথের অভাব নাই। অন্য কুথা মরগা যা।

ধনঞ্জয় ॥ আমি তো যেতে পারি—মনটা যে ইখানে ঘুর ঘুর করবে।

বাতাসী ॥ ভেড়া !!

ধনঞ্জয় ॥ ভেড়া নয় রে ভেড়া নয়—সোঁদরবনের বাঘা, ই—দেখ

[একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে কপালের ঝাঁকড়া চুল সরিয়ে বাঁ ধারে একটা গভীর ক্ষত দেখায়]

বাতাসী ॥ বীরপুরুষ ! বলদে তাড়া করেছিল বুঝি ?

[চাপা কৌতুক উঁকি মারে বাতাসীর চোখে]

ধনঞ্জয় ॥ হাঁ বলদ বটে। একটা নয়—চার চারটে ঘি রুটি খাওয়া বলদ। জমিদার ঢ্যাঁড়া দিছল—ধনঞ্জয় গড়ুইকে জ্যান্ত ধরতে পারলে দুশো টাকা নজরানা।

[বাতাসীর চঞ্চল চোখজোড়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে স্তব্ধ যায়। ধনঞ্জয় লক্ষ্য করে। জুৎ করে সিগ্রেটে টান দেয় মনভরে।]

শালা নায়েব হারামী। টিপছাপের প্যাঁচে ফেলে জমি নিল, ভিটে নিল—শেষ কালে যখন বৌটার ওপর নজর দিল আর সইতে পারলাম নি। একদিন রেতের বেলা দিলাম শালাকে খতম করে।

[চমকে ওঠে বাতাসী—একটা আতঙ্কিত শব্দ জাগে—ধনঞ্জয় হেসে ওঠে হো হো করে]

হাঃ হাঃ হাঃ তারপর তক্কে তক্কে রইলাম গা ঢাকা দিয়ে তিনদিন—ছেলে বৌটিরে নিয়ে ভাগবার মতলব ছিল। তা আর হোলনি।

বাতাসী ॥ হেই বাপ। পালা পালা ইখান থে। শ্যাষকালে আবার একটা খুন খারাবী করবি।

[অকৃত্রিম ভয় আর বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বাতাসী]

ধনঞ্জয় ॥ হুঁ ইবার যাব। পালাব। হাঁ করে দেখছিস কি?

বাতাসী ॥ বৌটার কি হল!

ধনঞ্জয় ॥ কে জানে কি হল। আর গাঁয়ে যাই নাই!

বাতাসী ॥ তোর মন পোড়ায় না?

ধনঞ্জয় ॥ পোড়াতো। আর পোড়াবেনি রে বাতাসী।

[বাতাসীর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে]

আবার বৌ পেলাম।

[ধনঞ্জয় হাত বাড়িয়ে বাতাসীর একখানা হাত ধরে। এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নেয়—ঘুরে দাঁড়ায় বাতাসী। ধনঞ্জয়ের গলার স্বর আবেগে ভরাট হয়ে আসে]

শোন বাতাসী। আমার সাথে চল। আমার কথাটা শোন। আমরা—আমরা ঘর বাঁধব। বাতাসী তোর কোল জুড়ে একটা কুঁদো খোকা দোব—বাতাসী—

[বাতাসীর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের কম্পন জাগিয়ে তোলে শেষের কথাগুলো। বাতাসী থর থর করে কেঁপে ওঠে। চোখ দুটো গভীর আবেশে বুজে আসে।]

বাতাসী !!!

[নিমেষে ধনঞ্জয়ের মুখোমুখী দাঁড়ায় বাতাসী। দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে ধনঞ্জয়ের দুখানা হাত। বিস্ফারিত চোখে তাকায় ওর মুখে]

বাতাসী ॥ কি! কি বল্লি !!

ধনঞ্জয় ॥ বল্লাম কি--চাষার ছেলে জাত চাষা—। তোর কোল ভরে আঘন মাসের পুরুষ্ট ধানের মত খোকা দোব।

[গ্রীষ্মের দগ্ধ মেঘের পুঞ্জদীর্ণ করে বর্ষার প্লাবন নেমে আসে বাতাসীর চোখের পাতায়—দুঃখে আনন্দে হাহাকার করে ওঠে। আর সেই হাহাকার আছাড় খেয়ে পড়ে ধনঞ্জয়ের বুকের পাটায়।]

বাতাসী ॥ আ-হা-হা-রে আ-হা-হা-হা—হা।

ধনঞ্জয় ॥ আরে কি হোল রে। কাঁদিস কেনে!

বাতাসী ॥ আমার খোকা—আমার খোকা—তার প্যাটে দানা দিতে পারি নাই রে, তার প্যাটে দানা দিতে পারি নাই।

[ধনঞ্জয় কি করবে কি বলবে বুঝতে পারে না]

ধনঞ্জয় ॥ বাতাসী—বাতাসী!

[পেছনে দু'হাত ভরে খড়কুটো নিয়ে ঢোকে বুড়ো। একটু থমকে দাঁড়ায়। ঝর ঝর করে কুটোগুলো ঢেলে দেয় উনুনের পাশে। কুৎসিৎ মুখটা ঘৃণা ক্রোধ আর ঈর্ষায় বীভৎস হয়ে উঠেছে]

বুড়ো ॥ বেহায়া মাগী! হুঁস সেই—আগুনটা যে গেল।

[ধনঞ্জয় এবার নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বাতাসীকে]

ধনঞ্জয় ॥ বাতাসী [বাতাসী ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে]

বুড়ো ॥ হারামজাদা—বেজন্মা—বজ্জাৎ।

[সোঁদরবনের বাঘের মতই ক্ষিপ্রগতিতে ধনঞ্জয় ঘুরে দাঁড়ায়। ওর চোখ দুটো ধ্বক্ ধ্বক্ করে ওঠে। বুড়োর গলা দিয়ে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোয়, ওপরের ঠোঁটটা সরে গিয়ে দেখা দেয় হিংস্র দাঁতের পাটি। দু'টো হাত আস্তে আস্তে আক্রমণের ভঙ্গীতে গুটিয়ে আসে বুকের কাছে। সেই মুহূর্তে মনে হয় কলকাতার ফুটপাথে বুঝি সুন্দরবনের আরণ্যক হিংস্রতা চাপ বেঁধেছে। ধনঞ্জয় এক পা এগিয়ে আসে। বুড়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনঞ্জয়ের ওপর। ধনঞ্জয় ওকে দু'হাতে টেনে নেয় বুকের ওপর, চেপে ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে। তারপর ছুঁড়ে দেয় সামনের দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে ধনঞ্জয় এগিয়ে যায় বুড়োর গলাটা চেপে ধরতে। বাতাসী পথ আটকে দাঁড়ায়, জাপটে ধরে ধনঞ্জয়কে]

বাতাসী ॥ এ্যাই—খুন করবি নাকি! শোন, আমার কথা শোন।

ধনঞ্জয় ॥ আমায় ছেড়ে দে।

[ধনঞ্জয়ের চোখদুটো জ্বলতে থাকে। বাতাসী ওর হাত ধরে টান দেয়]

বাতাসী ॥ আরে এ্যাই। কথা শোন বলছি—। এ্যাই কুঁদো বাঘা যাবি তো আয়—চল না। [আহত জানোয়ারের মত বুড়ো দাঁত খিঁচোয়]

বুড়ো ॥ ছেনাল।

বাতাসী ॥ বাঁজা—শয়তান ধুমসো বজ্জাৎ।

বুড়ো ॥ কুত্তী। কোন যমের দোরে চল্লি।

বাতাসী ॥ যমের দোরে আমি যাব কেন রে। তুই যা—তুই যা।

[হাঁচকা টানে ধনঞ্জয়কে নিয়ে বেরিয়ে যায় বাতাসী। বুড়ো গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সেই মাতালটি আবার টলতে টলতে ফিরে আসে]

মাতাল ॥ [নেপথ্যে] "কোন বন-হরিণীর চকিত চপল আঁখি কেন ছল ছল বেদনাতে।" [মঞ্চে] কোথায় গেলে—আমার জ্বলন্ত পাবকশিখা? ফুরুৎ—ছিকলী কেটে পালিয়েছে। [বুড়োকে দেখে] তুমি কে বাবা!

বুড়ো ॥ বাবু দুটো পয়সা।

মাতাল ॥ নেই হ্যায় কুছ্—নেই হ্যায়। সেরেফ্ দেউলে বনে গেছি।

বুড়ো ॥ বাবু আজ দু'দিন—।

মাতাল ॥ চোপরাও—বেওকুফ্—।

[আপনমনে টলতে টলতে মাতাল বেরিয়ে যায়। জড়িত কণ্ঠে ওর গান শোনা যায়]

"কেন ছল ছল—কেন ছল ছল বেদনাতে।"

[আস্তে আস্তে পর্দা নেমে আসে]

সকাল বেলায় একঘন্টা

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

[একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীতে সকাল হয়েছে। তারিখ—৭ই আষাঢ়, ৬৩। বাড়ীর কর্তার নাম দুঃখহরণ ভট্টাচার্য। বয়স ৫৮, কোন এক সাহেব কোম্পানীর কেরাণী। তিনি এইমাত্র বাজার থেকে ফিরে স্নানঘরে ঢুকেছেন। স্নানঘরের দরজাটা মঞ্চের যে পাশে বাইরে যাবার দরজা তার অন্য পাশে। ঘরের মধ্যে একটি চৌকি ও এক পাশে একটি কাঠের টেবিল ও দু'টি চেয়ার। ঘরের দেওয়াল অতি জীর্ণ। বাড়ীওলা যে ভাড়াটেদের উপর সন্তুষ্ট নয় তার ছাপ সর্বত্র। দেওয়ালে একটি রঙীন মা লক্ষ্মীর ছবি—তার ঠিক পাশেই একখানা রবীন্দ্রনাথের ছবি। বর্তমান মধ্যবিত্ত জীবনের বৈসাদৃশ্য এই দু'টি ছবিতেই পরিস্ফুট।

গৃহিণী মমতাময়ী সম্ভবত ভাত চড়িয়েছেন। হাতে একখানি হাতা নিয়ে তিনি বাইরের ঘর তদারক করতে এলেন। অভাবের সংসারকে নিপুণতার সঙ্গে চালিয়ে চালিয়ে মনটা তিক্ত হয়েছে। ভাষার শব্দ সম্ভার যথেষ্ট কিনা এই সংশয়ে উনি প্রচুর কথা বলেন। পাড়ার লোকে কিন্তু বলে মুখরা।

পুত্র বলাই যথাক্রমে I. A. I. Sc., ও I. Com. ফেল করার সংসারের তহবিলে বেশ কিছু ঘাটতি পড়েছে। মাতার দেহ তাই আভরণশূন্য। পিতার Retirement-এর বয়স এগিয়ে আসায় পুত্রের চাকরি পাওয়া অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে। কাজেই প্রতিদিন শ্রীমান বলাই বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে কোলকাতার নানা অঞ্চলে আসা-যাওয়া করে।

গত রাত্রে সে বাড়ী ফেরে নাই—স্বভাবতই মায়ের মন অত্যন্ত চঞ্চল। বাংলাদেশের আরো একশোটা বাড়ীর নিয়মে, মা—বলাইকে ডাকেন 'খোকা' আর বাপ ডাকেন নাম ধরে। এই খোকাটির বয়স প্রায় ৩০। এঁর একটি বোন আছেন—তিনি খুকী—তাঁর বয়স প্রায় ২৭ কিন্তু বলা হয় ২৩। গত চার বছর ধরে এমনি চলেছে। ভাই-এর জীবন আরো দুঃসহ করার জন্য বোন টেলিফোন কোম্পানীতে চাকরি করেন।]

মা ॥ খোকা এলি—খোকা—। আচ্ছা ছেলে বাপু একটা খবর তো দেবে কোথায় গেল, কি ব্যাপার—

[হঠাৎ চোখ পড়লো সকালে দিয়ে যাওয়া খবরের কাগজটার ওপর। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল—হাত থেকে হাতা খানা পড়ে গেল। খবরের কাগজটা তুলে নিলেন হাতে।

মুখ থেকে অস্ফুট আওয়াজ বেরোল "—খোকা রে!" ছুটে গিয়ে স্নান ঘরের দরজায় ঘুষি মারতে লাগলেন—বাঁ হাতে কাগজ।]

ওগো—ওগো—শুনছ—শোন না—কি মানুষ বাবা। শুনছ শুনছ—

[দরজা খুলে বাপ দেখা দিলেন। খালি গা, কাঁধে গামছা। স্নানের আগেকার প্রসাধন সারছেন। অর্থাৎ চুলে কলপ দিচ্ছেন। অর্ধেক চুল সাদা, অর্ধেক কালো। এক হাতে তুলি—অন্য হাতে কালির বোতল। চোখে জিজ্ঞাসা।]

বাপ ॥ কি হয়েছে?

মা ॥ এই দেখ খোকা কি কাণ্ডটা বাধিয়েছে—

বাপ ॥ কি করেছে—?

মা ॥ কাল পৈ-পৈ করে বারণ করলাম পাইকপাড়া যেতে হবে না। শুনল না! বলল ওখানে গেলেই চাকরি হবে। দেখ ত, কি কাণ্ডটা বাধিয়েছে। এখন ভুগতে হবে আমাদের।

বাপ ॥ কি হয়েছে?

মা ॥ চোখের মাথা কি খেয়েছ? না কি বুদ্ধিশুদ্ধি উপে গেছে? ওই তো মস্ত করে ছবি দিয়েছে দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা লোকের হাতেই পড়েছিলাম! সারা জীবন খালি বোঝাতেই গেল!

বাপ ॥ আমি কিন্তু এখনও ঠিক—। এ তো দেখছি মস্ত বাস দুর্ঘটনা হয়েছে। "কলিকাতা মহানগরীর ইতিহাসে বীভৎস বাস দুর্ঘটনা।" তারপর লিখেছে, "দুইজনের প্রাণান্ত ও ২৭ জন আহত।" এই যে তলায় যারা মারা গেছে তাদের নাম দিয়েছে—প্রভাস মুখোপাধ্যায় ও কুলদাকান্ত সান্ন্যাল। বলাইএর খবর তো দেখছি না কিছু। কি হয়েছে বলো তো?

মা ॥ আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবি তুমি চাকরি করো কি করে। আমাদের এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল—আর তুমি খালি কানার মতো হাতড়াচ্ছ। খোকা যে কাল পাইকপাড়া যাবে বলেছিল। তারপর সারারাত্রি বাড়ী ফেরে নি। সে কি আর আছে! তোমাকে বললাম, তা তুমি, কেন—কবে—করতে লেগেছ। কি যন্ত্রণায় যে আমি বেঁচে আছি!

বাপ ॥ ও বলাই বুঝি কাল রাতে বাড়ী আসে নি? তা'হলে অবশ্য চিন্তার কারণ একটু আছে।

মা ॥ একটু আছে! তোমার একটু নিয়েই তুমি থাক। আমি কালই

যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবো। ছেলে বেঁচে আছে কি নেই—আর উনি বলছেন, চিন্তার কারণ আছে।

বাপ ॥ বলাইএর নাম তো কোথাও করে নি! এমন তো হতে পারে সে অন্য বাসে উঠেছে। সাংঘাতিক কিছু হলে কাগজওয়ালারা নাম দিত না?

মা ॥ তুমি এখনও কোন যুগে বাস করছ? কাগজওয়ালারা কি আর আগেকার মতো আছে! এখন তাদের ছেলেরা মন্ত্রী হচ্ছে আর তারা গভর্ণমেণ্টের কথায় উঠছে বসছে। আসল খবরগুলো বার হয়ে গেলে জবাবদিহি করতে হবে না!

বাপ ॥ কিন্তু কেবল তোমার ছেলেরই আহত হবার খবর দেবে না কেন? তাতে তাদের লাভ কি হবে বলতে পার?

মা ॥ অতবড় ধূমসো একটা বাস দশ-বিশ ফিট নীচে গিয়ে পড়ল আর কারু কিছু হোল না! দুটো বুড়োলোক মরল। আর সবাই গায়ের ধুলো ঝেড়ে বাড়ী চলে গেল। তোমাদের গভর্ণমেণ্ট সবারি চোখে ধুলো দিতে পারে, আমাদের চোখে পারবে না। আর কিছু যদি নাই হয়েছে তবে আমার খোকা রাতে বাড়ী এল না কেন? [কেঁদে ফেললেন]

বাপ ॥ আহা শান্ত হও। কেঁদে কি করবে বল তো। চুপ কর। আমাকে একটু ব্যাপারটা বুঝতে দাও।

মা ॥ এর মধ্যে বোঝাবুঝির কি আছে? খোকা কাল পাইকপাড়া যাচ্ছিল একটা চাকরির সন্ধান পেয়ে—ওই হতচ্ছাড়া বাসটায় উঠে আমাদের সর্বনাশ করে দিল।

বাপ ॥ [কাগজ পড়ে]—হুঁ—তোমার কথা মিলছে—লিখছে 'আনুমানিক ৪-৫০ মিঃ পরেই দুর্ঘটনা ঘটে।' ৪-৫০ মানে হোল ধর বিকেল ৫টা। হুঁ—তোমার কথা সত্যি হতেও পারে।

[চৌকিটার ওপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বসে পড়লেন। পুত্র হারাবার ব্যথা তাঁর মুখে চোখে।]

মা ॥ ওগো বসে পড়লে যে! ওঠ ওঠ। তুমি বসে পড়লে চলবে কি করে?

বাপ ॥ চলবে না? ভেবেছিলাম বলাইএর চাকরি হলে ভাবনার কিছু থাকবে না। কোনরকম করে খেয়ে না খেয়ে চলবে। নাঃ।

মা ॥ তোমার দরখাস্তে কিছু হলো?

বাপ ॥ সে তো সাহেবের কাছে আছে। ম্যাট্রিকুলেশনের বয়স ভুল আছে একথা প্রমাণ করা তো সহজ নয়। তবু যা হোক কলপ টলপ দিয়ে চেষ্টা

করেছিলাম। ওই ছেলেটা আমায় পথে বসিয়ে দিয়ে গেল। আমার আর কিছুতেই উৎসাহ নেই।

মা ॥ আহাম্মক দেশের লোকগুলোই বা কেমন? এমন গাড়ী চালাবে যে ওপর থেকে নীচে পড়ে যাবে! চাপবার দরকার কি অমন অলক্ষুণে গাড়ীতে? যেমন দেশ আর তেমনি তার গভর্ণমেণ্ট। কাজ দেওয়া হচ্ছে, বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে—কচু আর ঘেঁচু। ঝাঁটা মারি অমন গাড়ীর মুখে আর যারা আকাশে চোখ রেখে চালায় তাদের মুখে।

বাপ ॥ দেখি জামাটা গায়ে দিই—যাই একবার আর. জি. কর হাসপাতালে সেখানে যদি কোনরকম সন্ধান মেলে। [বাড়ীর ভেতরে প্রস্থান]

মা ॥ সহরের উন্নতি হয়েছে না হাতি হয়েছে। মানুষ মারার কল বানিয়েছে, আবার বলছে পাঁচ বছরে আমরা বাদশা হবো। আমার খোকা যে আজ তিন চার বছর ধরে খালি ঘুরছে আর ঘুরছে—দিয়েছে একটা চাকরি তাকে। কাগজে তো দেখি বড়াই-এর শেষ নেই ছ'লক্ষ লোকের চাকরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ৬টা লোকের চাকরি দে তো দেখি। লজ্জাও করে না মুখপোড়াদের—

[মেয়ে মিনি সকালে Coaching ক্লাস সেরে এলো। হাতে বই খাতা। ইচ্ছা প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে। মায়ের যুদ্ধং দেহি মূর্তি দেখে কিছুক্ষণ দরজায় অপেক্ষা করল। তারপর ভেতরে এসে চুপিচুপি বই রেখে জুতো খুলল।]

মিনতি ॥ মা, শুনেছ কি হয়েছে। এত বড় একটা দোতলা গভর্ণমেণ্ট বাস—

মা ॥ থাম থাম খুব হয়েছে। সবাই মিলে জ্বালাস্ নে আমাকে। উঃ মরণ যে কবে হবে—

[দ্রুতবেগে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। বাপ জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলো]

মিনতি ॥ বাবা কি হয়েছে—তোমার মুখ অমন কেন?

বাপ ॥ এই যে খুকী এত সকালে তোর কলেজ শেষ হল!

মিনতি ॥ সকাল কোথায় বাবা—৯টা বাজে, অফিস যেতে হবে না?

বাপ ॥ ঠিকই তো—অফিস তো যেতেই হবে।

মিনতি ॥ জানো বাবা, পথে ভবতোষদার মায়ের সঙ্গে দেখা হল। উনি বললেন ভবতোষদা তোমায় কি কথা যেন বলতে আসবে।

বাপ ॥ অ।

মিনতি ॥ আমার বয়স জিজ্ঞাসা করলেন—বললাম ২৩। আজ ৪ বছর ধরে তাইতো বলে আসছি।

বাপ ॥ ও।

মিনতি ॥ কি হয়েছে বাবা, কি ভাবছ এত বল না! মা কিছু বলেছে?

বাপ ॥ না।

মিনতি ॥ তবে বল না বাবা কি হয়েছে?

বাপ ॥ এখন আর শুনে কি করবি মা—ঘুরে এসে বলব।

মিনতি ॥ তুমি এই অবেলায় বেরুচ্ছ নাকি? অফিস যাবে না।

বাপ ॥ সবই ভগবান জানেন।

মিনতি ॥ মা বুঝি কিছু কিনতে পাঠাচ্ছে? মাকে নিয়ে আর পারা যায় না। দাদা গেলেই তো পারত।

বাপ ॥ না। তার খোঁজেই তো যাচ্ছি। বুঝি ওই বাসটার মধ্যে সে ছিল।

মিনতি ॥ সে কি! ওই বাসটায় দাদা ছিল?

বাপ ॥ হুঁ।

মিনতি ॥ টালার পুলের ওপর থেকে যেটা পড়ে গিয়েছে?

বাপ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। সর—আমি যাই।

মিনতি ॥ কি সর্বনাশ। তাই মা অমনি করে চলে গেল। মা—মা—

[ভেতরে চলে গেল ডাকতে ডাকতে। বাপ বেরুতে যাচ্ছে এমন সময় তাঁর মামাশ্বশুর দীনেশবাবু এলেন।

দীনেশবাবু এক সময়ে শেয়ার মার্কেটে অনেক পয়সা করতেন। ভাগ্নীর সংসারে মাঝে মাঝে তখন সাহায্য করা সম্ভব হোত। তারপর একদিন ভুল Speculation-এ তাঁর প্রায় সমস্ত অর্থ এবং সেই সঙ্গে মাথাটিও গেল। দীনেশবাবুর ভাইপোরা তখন এগিয়ে এল—এবং তখন থেকে দীনেশবাবু তাদের পোষ্য। ভদ্রলোক অকৃতদার—সুতরাং সংসারের ঝামেলা নেই। বয়স ৭০ এর কাছাকাছি—দেখতে ৬২।৬৩। এখন ভারতবর্ষকে কি করে অর্থনীতির দিক হতে রাশিয়া আমেরিকার সমতুল করা যায়—এই হল তাঁর চিন্তা। তার জন্যে পড়াশোনা করেন যথেষ্ট। ভারতকে বাঁচাবার দায়িত্বে উনি সর্বদা চিন্তাশীল। নানারকম পরিকল্পনা—হিসাবপত্র ওঁর ঠোঁটের ডগায়। আপাতত বিপদ, শ্রোতা পান না। সবাই পালায়—এই বাড়ীর লোকেরা ছাড়া। এঁরা পুরোনো দিনের কৃতজ্ঞতায় ওঁকে সহ্য করেন। বিশেষ দুঃখহরণবাবু। তিনিই ওঁর শ্রেষ্ঠ শ্রোতা।]

দীনেশবাবু ॥ এই যে দুঃখহরণ শুনেছ—শুনেছ কি হয়েছে?

বাপ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—শুনেছি।

দীনেশবাবু ॥ আবার জিনিষপত্রের দাম বাড়ল। ছি ছি, এই ভাবে যদি

দামকে না আটকান হয় তা'হলে দুদিনের মধ্যে লোকের কেনবার শক্তি কমে যাবে। বেশী লোক যদি না কেনে তাহ'লে মাত্র মুষ্টিমেয় বড়লোকের পক্ষে সব জিনিষ কেনা সম্ভব নয়। তার ফল কি হ'ল দেখ—

বাপ ॥ আজ্ঞে আমাকে আবার তাড়াতাড়ি বেরুতে হচ্ছে। বলাই—

দীনেশবাবু ॥ ফল হচ্ছে ভয়াবহ। অর্থাৎ দেশের অর্থনীতি একপেশে হয়ে যাচ্ছে। টাল সামলাতে পারবে না—দড়াম করে উল্টে পড়বে। কোলকাতার অর্থনৈতিক পতন হলে ভারতবর্ষের কি অবস্থা হবে বুঝতে পারছ।

বাপ ॥ দেখুন আমাকে এখুনি একবার বেরোতে হচ্ছে। বলাই-এর—

দীনেশবাবু ॥ ঠিক, আমিও তো বলাই-এর কথা বলছিলাম। এই দেখ আজ তিন বছর ধরে বলাই চাকরি পাচ্ছে না। কেন? কেন না দেশের একপেশে অর্থনীতির ফলে মধ্যবিত্তরা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এই সেদিন ধর তোমাদের খাদ্যমন্ত্রী বললেন বাংলাদেশে খাদ্যাভাব নাই অথচ তার ক'দিন পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বক্তৃতা দিয়ে বললেন বাংলাদেশে শোচনীয় খাদ্যাভাব—

বাপ ॥ আজ্ঞে আমি যাই—

[যেতে স্থরু করলেন]

দীনেশবাবু ॥ ভেবে দেখ কতদূর পর্যন্ত অন্যায়টা যাচ্ছে। আচ্ছা এইবার অন্য দিকটা দেখা যাক। দু'বছর আগে একটা সাধারণ চাষীর আয় ছিল বছরে ১০৪৲ টাকা, এখন সেটা বেড়ে হয়েছে ২৬৫৲ টাকা। এই টাকার সবটা যদি তাদের নিজের আওতায় হত কারো কিছু বলার ছিল না। কিন্তু তাদের এই আয়টা বাড়ছে মধ্যবিত্তদের মেরে। তারা বেশীর ভাগ স্থিতিশীল আয়ের লোক, কাজেই তারা ক্রমে নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে।

বাপ ॥ আজ্ঞে বলাই বোধহয় বাস দুর্ঘটনায় পড়ে গেছে—আমি যাচ্ছি যদি তার কিছু খোঁজ—

দীনেশবাবু ॥ যা বলেছ, বাস দুর্ঘটনা। কেন হ'ল বলতে পার? মনে করো না ওটা একেবারে সহজ ব্যাপার, ওর পেছনে মস্ত রহস্য আছে। দাঁড়াও বলছি।

[সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করে দিলেন ! বাপ নাচার হয়ে ডাকল—]

বাপ ॥ মিনি—মিনি—

[মিনতির প্রবেশ]

মিনতি ॥ একি বাবা তুমি এখনও যাও নি? ও দীনেশ দাদু!

বাপ ॥ তুই একটু বোস ওঁর কাছে—আমি যাই। [দ্রুত প্রস্থান]

দীনেশবাবু ॥ কি হোল, দুঃখহরণ অমন করে চলে গেলো কেন? আরে দিদিমণি দেখছি, কি খবর?

মিনতি ॥ বাবা একটু কাজে গেলেন। দাদা কাল রাত থেকে বাড়ী ফেরে নি। ওই যে বাস দুর্ঘটনা।

দীনেশবাবু ॥ হ্যা-হ্যা—মনে পড়েছে। বাস দুর্ঘটনা।

মিনতি ॥ [আশান্বিতা] কি মনে পড়েছে—

দীনেশবাবু ॥ তোর বাবাকে বলছিলাম কেন এই দুর্ঘটনা হল সেই কথা।

মিনতি ॥ কেন হোল?

দীনেশবাবু ॥ তোকে বলব? ছেলে মানুষ কাউকে বলে দিবি না তো? তাহলে কিন্তু আমার প্রাণসংশয়।

মিনতি ॥ না বলব না। কি হয়েছে?

দীনেশবাবু ॥ না থাকগে—তুই চেপে রাখতে পারবি না।

মিনতি ॥ আঃ বল না দাদু।

দীনেশবাবু ॥ কাগজে দেখিস নি—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (৫৩) বাস দুর্ঘটনায় মরেছেন।

মিনতি ॥ হ্যাঁ—তাই কি হয়েছে?

দীনেশবাবু ॥ ওকে মারবার জন্যেই তো ডাকাতের দল ষড়যন্ত্র করে বাসটাকে নীচে ফেলে দিল।

মিনতি ॥ কি যে আষাঢ়ে গল্প তুমি বলতে পার দাদু।

দীনেশ ॥ হ্যাঁরে আষাঢ়ে গল্পের মতই গুরুতর। তার থেকে ভাল কথায় বলতে পারিস—ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত গুরুতর।

মিনতি ॥ কি বলছ তুমি দাদু, ঠিক বুঝতে পারছ না।

দীনেশ ॥ বুঝবি কি করে বল্। গোড়াতে বুঝে ফেললে তো গল্পই মাটি। তাহলে ডিটেকটিভদের চলে কি করে! হুঁকোকাশি, কিরীটি রায়, জয়ন্ত গোয়েন্দা, আর তোদের পালোয়ানের নাম যেন কি—মোহন মোহন—এদের তো অন্নই মারা যাবে।

মিনতি ॥ ওদের অন্ন মরলে কারোর কোন ক্ষতি হবে না। যত গাঁজা!

দীনেশ ॥ ক্ষতি হবে রে, ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে। দেশ থেকে বুদ্ধি দিয়ে কাজ করা লোকের সংখ্যা কমে যাবে।

মিনতি ॥ তোমার হেঁয়ালী আমি বাপু বুঝি না। তুমি মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবে তো?

দীনেশ ॥ না থাক। ঐ বাস দুর্ঘটনাটাকে আরও ভাল করে দেখতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

মিনতি ॥ দাদু কি হয়েছে—আমাকে বলে যাও।

দীনেশ ॥ যাঃ তুই বড্ড ছেলেমানুষ।

মিনতি ॥ তাহলে কিন্তু তোমায় যেতে দেব না।

দীনেশ ॥ আচ্ছা তাহলে বলেই যাই—শোন, ট্রেনে তো আগে খুব ডাকাতি হোত। তারপর প্রভাসবাবু বৈজ্ঞানিক উপায়ে এমন কলকাঠি বার করলেন যে ব্যাটাদের ডাকাতি বন্ধ। সেই থেকে ওদের রাগ প্রভাসবাবুর ওপর। তক্কে ছিল প্রতিশোধ নেবার জন্য। সেদিন যেই উনি বাসে উঠেছেন অমনি এরা একেবারে চটপট সব ব্যবস্থা করে ফেলল। দিল বাসটা ফেলে—কারু কিছু বলার নেই—দুর্ঘটনা। দেখলি না আর কেউ মরে নি কেবল একজন কুলদাকান্ত ছাড়া—তা তিনিও বোধহয় ডাকাত দলের কোন খোঁজ করেছিলেন।

মিনতি ॥ দাদাও যে ঐ বাসে ছিল।

দীনেশ ॥ তা'হতে পারে। তোর দাদার যেমন ডিটেকটিভ গল্প পড়ার সখ সেও হয়তো কোনক্রমে সন্ধান পেয়ে থাকবে ডাকাতদলের।

মিনতি ॥ অ্যাঁ!! মা—মা—মাগো!— [মমতাময়ী দৌড়ে এলেন]

মা ॥ কি, খোকা এসেছে? খোকা এলি বাবা—

মিনতি ॥ না, দাদু বলেছে দাদা নাকি ডাকাতদলের পেছনে লেগেছিল।

মা ॥ [ক্ষেপে]—ওইতো তোর দাদার মাথাটাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল। কতবার বললাম মামা, ছেলেটা পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না, ওকে ওই সব ছাই পাঁশ কতকগুলো পড়িও না। শুনেছিল আমার কথা?

দীনেশ ॥ আহা মমতা তুই বুঝছিস্ না। ডিটেকটিভ উপন্যাস না পড়লে চিন্তাধারা উন্নত হয়•না। উন্নত চিন্তাধারা না হলে বড় কিছু ভাবা যায় না।

মা ॥ চুলোয় যাক তোমার বড় কিছু ভাবা। ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা তার নেই ঠিকানা আর উন্নত চিন্তা! আজ আমার ছেলে যদি যায় তবে তোমার একদিন কি আমার একদিন! আমি পুলিশে খবর দেবই।

দীনেশ ॥ দেখ মমতা চিরকালই তোর মুখটা আল্‌গা।

মমতা ॥ আল্‌গা মুখের এখনই হয়েছে কি! ভেবেছ আমার সংসারে আগে সাহায্য করতে, টাকা দিতে বলে আমার ছেলেকে নিয়ে যা খুসী করবার তোমার অধিকার হয়েছে। মারি অমন অধিকারের মাথায় ঝাড়ু। ছেলেটা I. A. ফেল করল, বললাম মামা একটা চাকরি দেখে দাও। দিয়েছিলে? খোকার মাথায় ঢোকালে I. A. ফেল গোপন করে I. Sc. পড়তে, কি হোল তাতে? তারপর I. C m. দিয়েও ফেল করল। এখন আবার ডাকাত দল না কিসের পেছনে লাগিয়েছ। সত্যি বলছি মামা খোকা যদি না আসে—

মিনতি ॥ জান মা, সবাই বলেছে টায়ারগুলো নাকি সব পুরনো পচা ছিল।

দীনেশবাবু ॥ ওই পুরনো টায়ার দিয়ে চালাচ্ছে বলেই তো ভারতবর্ষ এই রকম আর্থিক সংকটে এসে পৌঁছেছে। দেখ না সর্বত্র Retired লোক। কোথাও দেখেছিস্ অল্পবয়সী ছেলেদের কোন সুযোগ দেওয়া হচ্ছে? এ সেই বুড়ো-বুড়ির দেশের গল্প হোল। সেই যখন—

মমতা ॥ থাম থাম তোমাকে আর বকামো করতে হবে না। গোয়েন্দা গল্প পড়িয়ে পড়িয়ে ছেলেটার মাথাটাকে খেয়েছ—মেয়েটাকে আর রূপকথার গল্প শোনাতে হবে না। ও তবু যা হোক টেলিফোনে কাজ করে ক'টা টাকা রোজগার করছে। রাজপুত্তরের আশায় বসে থাকলে তো আর আমাদের চলে না। চল মিনি— [উভয়ের প্রস্থান]

দীনেশবাবু ॥ এদের কি হয়েছে অমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সবাই যেন কেমন উত্তেজিত। বলাই-এর সম্পর্কে কি বলল? বাসের পেছনে—না ডাকাত দলের পেছনে ছুটেছে? কই আমি তো তাকে কিছু বলি নি। না—সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। দেখি—

[দীনেশবাবুর প্রস্থান]

[দরজা ঠেলে ভবতোষ ঢুকল। ট্রাভলিং সেলস্‌ম্যান, বছর ৩৫ বয়স। মিনিকে বিবাহেচ্ছু। হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল। পোষাকে প্রকাশ, এদের থেকে অবস্থা ভাল।]

ভবতোষ ॥ মিনি, মিনি—যাঃ বাবা কেউ নেই। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল—অথচ সমস্ত বাড়ী চুপচাপ যেন কিছুই হয় নি।

[দীনেশবাবুর সচকিতভাবে প্রবেশ]

দীনেশবাবু ॥ উঃ আমার বুক ফেটে গেল রে! ওই ছেলেটা আমার কলজের হাড় ছিল। উঃ এই অল্প বয়সে—! আর আমি বেঁচে থাকলাম। উঃ!

ভবতোষ ॥ কেঁদে আর কি করবেন বলুন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এইরকম

তো একটা ঘটছে না। এই দেখুন না কলকাতার লোক সংখ্যা কি রকম বেড়েছে। রাস্তায় গাড়ী কতো বেড়েছে। চাপা পড়ে মরছে কত লোক। উপার্জনক্ষম লোকের মৃত্যুতে কত পরিবার পথে বসছে একদিকে।

দীনেশবাবু॥ কে জানত আমাকে আজ এই সব শুনতে হবে। আমি মরলাম না কেন এই কথা শোনার আগে! হুঁ হুঁ হুঁ—

[কেঁদে ফেললেন]

ভবতোষ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলো। সবাই মনে করল যারা মরেছে তাদের কবরস্থ করলেই পৃথিবী আবার আগের মতো চলবে। কিন্তু দেখুন কি হয়েছে—অন্য দেশ বাদ দিন, ভারতবর্ষের দিকে দেখুন। আমরা কোথায় নেমে গেছি। আমাদের সংস্কৃতির মান, ভদ্রতার মান, কোথায় নেমে গেছে। আমাদের নৈতিক চরিত্রের অধোগতি হয়েছে বললেও সব কথা বলা হয় না—আমাদের মনের নীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আজ বার বছর হতে চললো যুদ্ধ শেষ হোয়েছে—কিন্তু যুদ্ধের ফলের শেষ নাই কোথাও।

[মিনি দৌড়ে এল]

মিনতি॥ ভবতোষদা—দাদার খবর জান কিছু?

ভবতোষ॥ তোমার বাবাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

দীনেশবাবু॥ উঃ বলাই ভাইরে—

মিনতি॥ দাদা তাহলে—

[মুখে চোখে ঘোর আশঙ্কা]

ভবতোষ॥ শোন মিনতি, এখন আমি তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারি না। অন্ততঃ আরো এক বছর তো নয়ই। তোমার বাবার চাকরির এক্সটেন্‌শন্ বা কিছু না হওয়া পর্যন্ত তোমার আয়ের প্রতিটি টাকা সংসারে লাগবে।

দীনেশবাবু॥ আমার পয়সা থাকলে আমি মোকদ্দমা করতাম স্টুপিড গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। কি তারা করল! উঃ—

মিনতি॥ দাদাকে তাহলে!

ভবতোষ॥ তোমার বাবা নিয়ে আসছেন। কতকগুলো কাগজপত্রে সই করতে দেরী হচ্ছে তাই আমাকে বললেন খবর দিতে।

দীনেশবাবু॥ কি, এইখানে নিয়ে আসছে? ওরে ও মুখ আমি দেখব কি

করে রে! এতটুকু বেলা থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি—সে যে আমাকে ছাড়া আর কিছু জানত না।

ভবতোষ॥ সামাজিক বদ-ব্যবস্থায় একটা ছেলে নষ্ট হয়ে গেল।

মিনতি॥ দাদা, কেন তুই কাল সন্ধ্যাবেলায় বেরলি ভাই!

[বজ্রাহত মমতাময়ী বেরিয়ে এলেন। ভেতর থেকে সবই তিনি শুনেছেন। তাঁকে দেখে সবাই চুপ করল। দীনেশবাবু শুধু একবার ফুঁপিয়ে উঠলেন। মমতাময়ী আর মুখরা নন—অচঞ্চলা।]

মা॥ আমি জানি আমার কপাল পুড়েছে। সকালে যখনই আমার ডান চোখ নাচল আর লক্ষ্মীর পট থেকে ফুল পড়ে গেল তখনই বুঝেছি—আমার ভাগ্যে আর কত সইবে! স্বামী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে কষ্টে সংসার করছিলাম। কানা বিধাতার তাও সহ্য হোলো না। সেখানেও বাধ সাধলে।

মিনতি॥ উঃ মা মাগো—[মায়ের বুকে পড়ে কাঁদতে লাগল]

ভবতোষ॥ জানেন মা, আমার এক এক সময়ে ইচ্ছা হয় কোন ঔষধপত্র খেয়ে একটা দানব হই। তারপর এই পচাধরা ভেঙ্গেপড়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজটাকে চুর চুর করে ভেঙ্গে ফেলি।

দীনেশবাবু॥ ও আপনিই ভেঙ্গে যাবো। যে ভাবে বেঁচে থাকার দাম বেড়ে যাচ্ছে—তাতে কেউ টিঁকবে ভেবেছ। মধ্যবিত্তরা সব হয়ে যাবে কুলি—শেষে ব্যাস্টিল ধ্বংস করার দিন একদিন এদেশেও আসবে। তাতে দুঃখ ছিল না—কিন্তু বলাই—

মিনি॥ দাদাকে আমি কি কম জ্বালিয়েছি। বলেছি তুমি মেয়ে সাজো, আমাদের টেলিফোন কোম্পানীতে চাকরি পাবে।

ভবতোষ॥ প্রাণশক্তির এই অপচয় কবে এদেশ থেকে উঠে যাবে কে জানে!

মা॥ মামা তুমি যাও। কিছু ফুল আর কি সব লাগে—

[হঠাৎ কেঁদে ভেঙ্গে পড়লেন]

দীনেশবাবু॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে—তুই কিছু ভাবিস না। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আমাকেই তো করতে হবে! আর কে করবে? এ-সব তো আমারি কাজ! বেশীদিন বাঁচার এই ফল—আমাকেই তো করতে হবে! তোরা শান্ত হ' একটু—আমি ব্যবস্থা করছি। আমি সব ব্যবস্থা করছি। [প্রস্থান]

[মা এবং মেয়ে নিঝুম হয়ে বসে রইলেন। ভবতোষ দু'একবার পায়চারি করল, তারপর বাইরে যেতে যেতে বলল—]

ভবতোষ ॥ আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। দরকার হলে ডেকো মিনতি।

মা ॥ ভবতোষ তোকে কি বলছিল রে?

মিনতি ॥ কিছু না।

মা ॥ আমি শুনতে পেলাম না, তোকে বিয়ের কথা কি যেন বলছিল।

মিনতি ॥ ভবতোষদার ইচ্ছা ছিল দু'একদিনের মধ্যে বাবার সঙ্গে কথা বলে। এখন তো আর তা হতে পারে না তাই বলছিল।

মা ॥ তাতে কি। তোদের ইচ্ছে হলে মাসখানেক পরেই তোরা বিয়ে করতে পারিস। আমি বলবো ওকে।

মিনতি ॥ না মা, এখন তা হতে পারে না।

মা ॥ তুই টাকার কথা ভাবছিস? ও আমাদের দুটো প্রাণীর চলে যাবে কোনরকমে। তোরা সুখী হ'।

মিনতি ॥ না মা—এখন ওকথা বোল না—বোল না।

মা ॥ মনে পড়ে তোর মিনি—তুই আর তোর দাদা যখন ঘুমিয়ে পড়তিস ছোটবেলায়, আমরা গিয়ে রাস্তায় বসে থাকতাম। গরমের সময় তুই ঘুমুতিস—কিন্তু খোকা ঠিক জেগে উঠে পেছনে পেছনে যেত। সেবার পূজোর সময় তোর বাবা একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে এল—খোকা বলল ঘোড়ার দিন চলে গেছে, এখন মটর গাড়ী চাই। কি বুদ্ধি ছিল! সেবার বড়দিনে পাশের বাড়ীর কর্তার হাতঘড়িটা চুরি গেল। কতো হৈ চৈ। খোকা গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে খুঁজে বার করে দিল ঘড়িটা। তখন ওর বয়স কতো হবে—তের চোদ্দ। ও-বাড়ীর কর্তা এত মিষ্টি দিয়ে গেল আর বলে গেল "এই ছেলে বড় হলে আপনার আর কোন দুঃখ থাকবে না ভট্‌চাজ মশাই।" খোকা বড় হোল—আমাদের দুঃখ ঘুচল না।

[নিঃশব্দে দু'জনে কাঁদতে লাগলেন। বাইরের বাদলা বাতাসে সামনের দরজাটা মাঝে মাঝে খুলে যেতে লাগল—তারপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। উভয়ে নির্বিকার হয়ে দেখতে লাগলেন। উঠে দরজাটা খুলতে বা বন্ধ করতে কারো ইচ্ছা হল না। মিনির গালের জলধারা দুটো কাল হয়ে উঠলো। তার চেহারাটাকেও কেমন রুক্ষ করে তুলল। দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে মিনির চোখ বড় বড় হয়ে উঠল—]

মিনতি ॥ মা দাদা আসছে। মাগো দাদা আসছে।

[দরজাটা দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল। উৎসাহে খুসীতে মিনিকে দেখতে হোল পাগলের মত]

মা ॥ কি বলছিস্ মিনি—

মিনতি ॥ মা দাদা আসছে—

মা ॥ হায় ভগবান আর কত দুঃখ দেবে! ছেলেটাকে নিয়ে তোমার সাধ মিটল না—মেয়েটাকেও পাগল করে দিলে!

[ভবতোষের প্রবেশ]

ভবতোষ ॥ মা বলাই আসছে।

মা ॥ ভবতোষ, তোমরা সবাই মিলে আমাকে খেপিয়ে দেবে নাকি?

ভবতোষ ॥ কেন, আমি কি করলাম?

মিনতি ॥ তুমিই তো এসে বললে দাদা মারা গেছে।

ভবতোষ ॥ কই না!

মিনতি ॥ কেন মিথ্যা কথা বলছ। তুমি এসে বললে—বাবা দাদার দেহ নিয়ে আসছে।

ভবতোষ ॥ না। আমি বললাম দাদাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসছে হাজত থেকে।

মা ॥ হাজত থেকে কেন?

ভবতোষ ॥ বাঃ—তোমরা কি সে কথা জান না?

মিনতি ॥ কোন্ কথা!

মা ॥ আমরা তো জানি খোকা বাস দুর্ঘটনায় পড়ে গেছে।

ভবতোষ ॥ বাস দুর্ঘটনা! আরে না—না। বাস দুর্ঘটনা কে বললে?

মা ॥ বাস দুর্ঘটনা নয়?

মিনতি ॥ তখন থেকে একটা কথা যদি পরিষ্কার করে বলবে।

ভবতোষ ॥ আমি তো বলছি। তোমরাই তো উল্টো পাল্টা বুঝছ। আমি বলছি এক, তুমি বুঝছ আর।

মা ॥ বাবা, কি ব্যাপার একটু খুলে বলবে? খোকা আমার বেঁচে আছে তো?

ভবতোষ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। বেঁচে থাকবে না কেন?

মা ॥ ঠিক বলছ বেঁচে আছে। আমাকে ভোলাচ্ছ না তো?

ভবতোষ ॥ না ভোলাব কেন। ঐ তো বলাই আসছে—ঐ দেখুন হেঁটে আসছে! মরে গেলে কেউ হেঁটে হেঁটে আসে!

[বোকার মত হা-হা করে হাসল]

মিনতি ॥ কি হয়েছিল ভাল করে বল না ভবতোষদা?

ভবতোষ ॥ মদ খেয়েছিল—তাই হাজত বাস করতে হয়েছে।

মা ॥ কি—কি বললে ?

ভবতোষ ॥ বলাই কালকে খানিকটা বেনো মদ খেয়ে রাস্তায় মাতলামি করছিল। সেইজন্য পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে ফাঁড়িতে সারারাত আটকে রেখেছিল। সেইখান থেকেই তো দুঃখহরণবাবু ওকে খালাস করে আনছেন।

মা ॥ মদ খেতে ধরেছে আমার খোকা !

ভবতোষ ॥ তাই তো বলছিলাম—প্রাণশক্তির কি বিরাট অপচয়।

মা ॥ ভবতোষ তুমি বড় বোকা। বড্ড বেশী বোকা।

ভবতোষ ॥ তা আমি কি করলাম! মিনতির বাবার সঙ্গে পথে দেখা হল। তিনি বাড়ীতে তাড়াতাড়ি খবর দিতে বললেন। এখানে এসে দেখি আপনারা আগেই খবর পেয়েছেন। কান্নাকাটি করছেন। আর সেটা স্বাভাবিকও। বাড়ীর যোগ্য ছেলে যদি চাকরি না খুঁজে রাস্তায় রাস্তায় মাতলামি করে তবে তার থেকে ভীষণ অবস্থা আর কি হোতে পারে। অথচ যে মদ খেলো তার থেকে দায়ী হচ্ছে সেই দেশের সমাজ ব্যবস্থা—

মিনতি ॥ মা দাদা এসেছে—

মা ॥ ভবতোষ, তুমি বাবা বাড়ী যাও, সকাল থেকে অনেক খেটেছো। ওবেলা একটু জল খেয়ে যেও।

[ভবতোষ দুজনার কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে বাইরে চলে গেল]

মা ॥ [মিনতিকে] ওর সঙ্গে সংসার পাততে পারবি ?

মিনতি ॥ এক বছর তো যাক।

[দুঃখহরণবাবু ঢুকলেন]

বাপ ॥ ভবতোষকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলাম। ঠিক সময় খবর পেয়েছিলে তো ? বাবা আমারও যা ভয় লেগেছিল, ভাবলাম সব আগে তোমাদের নিশ্চিন্ত করি।

মা ॥ নিশ্চিন্ত !

বাপ ॥ এই যে খুকী এখনও অফিস যাস নি, বেলা হ'লো। কি চেহারা হয়েছে তোর। যা যা মুখে জল দে গিয়ে।

মিনতি ॥ যাই বাবা। [অফিসের কথায় সচেতন হয়ে ভেতরে চলে গেল]

মা ॥ কোথায় গেল হতভাগাটা ?

বাপ ॥ বাইরে ভবতোষের সঙ্গে কথা বলছে। যাই স্নানটা সেরে নি। কই আমার কলপের শিশিটা কোথায় গেল ?

[ভেতরে প্রস্থান]

মা ॥ আসুক একবার হতভাগা। ওরই একদিন কি আমারই একদিন। চাকরি করে আমাদের রাজা করবেন! যোগ্য ছেলে আমাদের দুঃখ ঘোচাবেন! মদ ধরা হয়েছে!

[খালি গায়ে গামছা কাঁধে বাপ ঢুকলেন। হাতে কলপের শিশি। স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করার আগে বললেন—]

বাপ ॥ জানগো—তবু আমাদের ভাগ্যি ভাল আর কিছু হয় নি। খালি মাতলামি করেছে—[দরজা বন্ধ করে দিলেন]

মা ॥ খালি মাতলামি করেছে—

[এক মুহূর্তে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করলেন। পর মুহূর্তে সারা সকালের কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর রূপটা কোমল হয়ে গেল। দরজার পাশ থেকে সকালে ফেলে রাখা হাতাটা তুলে নিলেন। মাটিতে পড়ে থাকা কাগজটা তুলে চৌকিটার ওপর রেখে দিলেন। বাইরে দরজার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। সে দৃষ্টিও কোমল হয়ে গেল। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসিও এল! ভেতরে চলে গেলেন।]

[বলাই ঢুকল, একটু অপ্রতিভ ভঙ্গি]

বলাই ॥ আচ্ছা ভবতোষদা ওবেলায় দেখা হবে। এবারকার দরখাস্তটা ঠিক লাগবে দেখে নিও।

[ঘরে কাউকে না দেখে মুখটা খুব অপরাধী হ'লো।]

—মা—মিনি—অ্যাই মিনি—[কোন উত্তর না পেয়ে চৌকিতে বসে কাগজখানা তুলে নিল।]—আই বাপস্—

[দীনেশবাবু ফুল-টুল নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে বলাইকে বসে থাকতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। তাঁর হাত থেকে কিছু জিনিষ পড়েও গেল। বলাই তাকাল।]

বলাই ॥ দেখেছ দাদু, কি ভয়ঙ্কর একটা বাস দুর্ঘটনা হয়েছে। বাপস্—

[দীনেশবাবুর গলা দিয়ে একটা কথাও বার হলো না।]

একটি রাত্রি

শিভাংশু মৈত্র

[১৮৫৫ সনে বিধবা-বিবাহ আইন পাস হবার পর বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এবং অর্থে বহু বিধবার বিবাহ হয়। প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৫৬ সনে। বিদ্যাসাগর তার পর থেকে সুনাম-দুর্নাম অনেক কুড়িয়ে, ঘরে পরে খ্যাত-নিন্দিত হতে হতে চলেছেন। তাঁর জীবনের ওপরেও আক্রমণ হয়েছে। কেউ কেউ আবার এ কথাও বলেছে : সাগর মশাই পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নাম কিনছেন ; নিজের ছেলেকে হাড়িকাঠে ফেলতে পারেন তো বুঝি !

১৮৭০ সনের গ্রীষ্মকাল। বিদ্যাসাগর কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়িতে রাত্তির নটা নাগাদ বারান্দায় দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছেন। একটু পরে হুঁকোটা এক কোণে ঠেকিয়ে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে।]

বিদ্যাসাগর ॥ [স্বগত] কি পাপে লিখিলা

এ পীড়া দারুণ বিধি আমার এ ভালে ! [পদচারণা]

মধু কেমন করে যেন আমার মনের কথাটা জানতে পেরেছে—

কি পাপে হারানু আমি

তোমা হেন ধনে ?

বেশ তো ছিলে বাবা বামুন-পণ্ডিতের ছেলে। আবার এ পরোপকার করার রোগে ধরল কেন ? করতে গিয়ে যে সর্বস্বান্ত হলে।

[চৌকির ওপরে গিয়ে বসলেন। বড় জামাই গোপালচন্দ্রের প্রবেশ]

এস গোপাল, এস। এত রাত্রে যে ? কি সংবাদ ?

গোপাল ॥ [প্রণাম করে বসে) একটা সংবাদ দিতে এলাম। কিন্তু আপনি যে কি ভাববেন তাই বুঝতে পারছি না।

[বিদ্যাসাগর একটু হেসে চুপ করে বসে রইলেন। গোপাল একবার তাঁর মুখের দিকে, একবার মাটির দিকে, আর একবার আকাশের পানে তাকিয়ে কিছুই স্থির করতে না পেরে মাথা চুলকোতে লাগলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ ওরে সিধু !

[চাকর সিধুর প্রবেশ]

ভেতরে বলে আয় যে, গোপাল এসেছেন।

সিধু ॥ আজ্ঞে—

বিদ্যাসাগর ॥ হ্যাঁ, বলে আয় যে খাবেন।

[সিধুর প্রস্থান]

বল গোপাল, কি বলতে এসেছ। অনেক ভেবে চিন্তেই যে এসেছ তা এত রাত্তির দেখেই বুঝতে পারছি। আর এও বুঝছি যে কাজটা গর্হিত হলে তুমি অন্ততঃ আমাকে বলতে আসতে না।

[গোপাল তখনও নিরুত্তর]

আর কাজটা এমনি যে, আর কারও কাছে নিশ্চয়ই সমর্থন পাও নি। ওরে সিধু!

[সিধুর প্রবেশ]

কলকেটা বদলে দে।

[কলকে নিয়ে সিধুর প্রস্থান]

গোপাল ॥ [একেবারে চোখ কান বুজে] নারায়ণ বিধবা-বিবাহ করতে মনস্থ করেছেন।

[বিদ্যাসাগর গোপালের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালেন। সিধু কলকে বদলে হুঁকো হাতে দিয়ে গেল। তিনি তামাক খেতে লাগলেন। গোপাল মাথা হেঁট করে বসেই রইলেন। শোনা যেতে লাগল শুধু হুঁকোর শব্দ]

বিদ্যাসাগর ॥ তুমি নিজেই নারায়ণের হয়ে এ কথা বলছ, না, নারায়ণ তোমাকে দিয়ে বলাচ্ছে গোপাল? কথাটা খুলে বল।

গোপাল ॥ আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেও এটা নারায়ণের নিজেরই কথা।

বিদ্যাসাগর ॥ হুঁ [আবার পদচারণা]। তা গোপাল, দেশে কি কুমারী নেই যে নারায়ণ বিধবা বিবাহ করবে?—আর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তার বয়স হয়েছে কি? আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই সে ঠিক করে বসল কি করে?

গোপাল ॥ [থতমত খেয়ে] আজ্ঞে, এ ব্যাপারে যে আপনার অমত হতে পারে তা আমরা—

বিদ্যাসাগর ॥ কল্পনা করতে পার নি! যে-হেতু আমার মাথা ভেঙেই সব বিধবা-বিবাহ হচ্ছে, যে-হেতু এক-একজন চার-পাঁচটা বিধবাকে উদ্ধার করলেও আমি নিরুদ্বেগে সাহায্য করে যাচ্ছি, সেই হেতু নিজের ছেলেরও বিধবার সঙ্গে বিয়ে দেব? তোমরা কি ক্ষেপলে গোপাল?…ওরে সিধু!

[সিধুর প্রবেশ]

মাকে একবার ডেকে দে।

গোপাল ॥ [ভয়ে] আজ্ঞে, তাঁকে আবার কেন? আপনি যখন আপত্তি করছেন তখন তিনি তো—

বিদ্যাসাগর ॥ আপত্তি করবেনই। তা নাও হতে পারে গোপাল। হয়তো ছেলে মায়ের মত আগেই নিয়ে রেখেছে। ছেলের ওপর বাপের চেয়ে মায়ের অধিকার ঢের বেশী। তাঁকেই পুত্রবধূকে নিয়ে ঘর করতে হবে। আমি তো থাকব বাইরে বাইরে। তিনি যদি মত করেন আমি পথের কাঁটা হতে যাব কেন? তাঁর মুখ থেকেই তাঁর মত শুনে যাও।

[দিনময়ী দেবীর প্রবেশ]

এস। ব'স।

[দিনময়ী উপবেশন করলে গোপাল তাঁকে প্রণাম করলেন]

শোন, বিধবা-বিবাহ তুমি সমর্থন কর কি-না আমি জানি না; করলেও নিজের ছেলের বিধবা-বিবাহ দিতে রাজী আছ কি-না সেও আর এক প্রশ্ন। গোপাল এসে বলছেন, নারায়ণ নাকি স্থির করেছে বিধবা-বিবাহ করবে। পাত্রী কে আমি খোঁজ করার দরকার বোধ করি নি এই ভেবে যে, বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না করে এ ক্ষেত্রে আর অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। নারায়ণের বিবাহের বয়স হয়েছে। আমাদের সময়ে আরও অল্পবয়সে বিবাহ হত। এবং সে বিবাহ গুরুজনেরাই ঠিক করতেন। তা না হলে তুমি এখানে এলে কি করে, বল? [মুচকি হাসলেন] তা এ সম্পর্কে তোমার মত কি গোপালকে জানাও।

[আবার তামাক খেতে খেতে পদচারণা করতে লাগলেন]

গোপাল ॥ আপনার যখন ওই মত, তখন উনি কি—

দিনময়ী ॥ উনি কি বলছেন?

বিদ্যাসাগর ॥ আমি বলছি, কুমারীর যদি অভাব হয়ে থাকে আর তোমার যদি মত থাকে তো আমি অন্তরায় হব না।

দিনময়ী ॥ বাংলা দেশে আবার কুমারীর অভাব কবে থেকে হল তা তো জানি নে। আর তোমারই বা এতদিন পরে কুমারীদের জন্যে এত ভাবনা কেন? সারা ভূ-ভারতের লোকে জানে যে, বিদ্যাসাগর বিধবাদের বিয়ে দেবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। এখন নিজের ছেলের বেলায় পেছ-পা হলে লোকে কি বলবে?

[গোপাল বিস্ময়ে দিনময়ীর দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না, এমনি ভাব]

বিদ্যাসাগর ॥ মনে থাকে যেন তোমার ওই একমাত্র ছেলে ; তার বউকে নিয়ে তুমি যে দিবারাত্তির ছুঁই-ছুঁই করবে, এটায় হাত দিও না সেটায় হাত দিও না বলবে, রাঁধতে গেলে নানা অছিলায় সরিয়ে দেবে, নাতি-নাতনীদের গামছা পরে কোলে নেবে আর প্যাচ প্যাচ করে থুতু ফেলবে —সেটা কি ভাল ?

দিনময়ী ॥ [কৃত্রিম ক্রোধে] আর তুমি কি তাদের মাথায় চড়িয়ে পথে পথে দেখিয়ে বেড়াবে আর বলবে—কেউ কিচ্ছু বলেছ কি দেখে নেব ! না বাপু, অমন করে আমি ভালবাসতে পারব না। আর তোমার আমার রান্নাটা আমিই রেঁধে নিতে পারব। ওর জন্যে নারাণের বউয়ের মুখ-নাড়া খেতে পারব না।

বিদ্যাসাগর ॥ ভেবে দেখেছ বাবা-মা কি বলবেন ?

দিনময়ী ॥ সে ভাবনা তোমার। বিধবারা যখন সব তোমার দিকে চেয়ে হা-পিত্যেশে বসে আছে তখন তাঁদের মত তোমায় করাতেই হবে। এ সব বাজে কথা রেখে বল দেখি পাত্রীটি কে ?

গোপাল ॥ [তাড়াতাড়ি] আজ্ঞে, থানাকুল-কৃষ্ণনগরের শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের চোদ্দ বছরের বিধবা কন্যা শ্রীমতী ভবসুন্দরী।

দিনময়ী ॥ বলি মেয়েটিকে দেখেছ ? না, বিধবা উদ্ধার করবার তাড়ায় রূপগুণ দেখবার দরকারই বোধ কর নি ?

গোপাল ॥ আমি দেখেছি ; তবে আমার দেখার ওপর কিছু নির্ভর করে না। উনি দেখবেন. প্রয়োজন হলে নারায়ণ নিজে দেখবেন। প্রয়োজনীয় যা কিছু আপনাদেরই করতে হবে। আমি শুধু জানাতে এলাম যে, নারায়ণ এই বিবাহে ইচ্ছুক। তার পক্ষে তো আপনাদের সামনে এসে বলা—

বিদ্যাসাগর ॥ ভাল দেখায় না। সে কথা বাপু সত্যি। ছেলে যে এসে বলবে—বাবা, আমি বিয়ে করব, সে আমি সইতে পারব না। তা, তাঁকে একবার ডাক এখানে। তিনি নিজে এসেই বলুন তাঁর ইচ্ছাটা। এ বিষয়ে আমি আগু বাড়িয়ে কিছু করতে নারাজ। তোমার শাশুড়ী যা বললেন তাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙে না। লোকের কথার ভয়ে উনি ছেলের বিয়ে দেবেন বিধবার সঙ্গে। আমি বাপু লোকের ভয়ে অত

ঘাবড়াবার প্রয়োজন দেখি না। হাজার হোক, আমি বাপের ব্যাটা তো! প্রথমে যাঁরা সব ছিলেন এই বিধবা-বিয়েতে তাঁরা সব মায়ের ছেলে, মায়ের কোলে গিয়ে নাড়ু খাচ্ছেন; আর আমি বাপের ব্যাটা বলে ধরা পড়ে গিয়েছি। তা ধরা যখন পড়েছি তখন কুকুরে ভেউ ভেউ করবে বলে ল্যাজ তুলে পালাতে পারব না—এই সাফ কথা।

দিনময়ী ॥ তোমার সামনে নারাণ কি এসে গলাবাজি করে বলব—বিধবা বিয়ে করব!

বিদ্যাসাগর ॥ গলাবাজি না করেও বলা যায়। আর মন যখন স্থির করেছেন তখন নাচতে নেমে আর ঘোমটা টানা কেন?

দিনময়ী ॥ ছেলেকে নিয়েও মজা মারতে তোমার যে কি আনন্দ হয়! তুমি হাঁ কি না বললে সে কি আর অন্যথা করবে?

[বিদ্যাসাগর চুপ করে পদচারণা করতে লাগলেন। এঁরা অস্বস্তিতে পরস্পরের মুখের দিকে শুধু তাকাতে লাগলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ তাকে নিজে এসে বলতে হবে সে কি চায়। গোপালকে সামনে এগিয়ে দিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এ তো আর কুমারী-বিবাহ নয় যে আমরা সিদ্ধান্ত নেব আর ছেলে সুড়সুড় করে গিয়ে পিঁড়িতে বসবে! তাকে ডাক গোপাল।

[গোপালের প্রস্থান]

[বিদ্যাসাগর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন সামনের দিকে তাকিয়ে]

দিনময়ী ॥ তোমার কি সত্যিই মত নেই?

[বিদ্যাসাগর নিরুত্তর]

মনের কথাটা কি কোনদিন খুলে বলবে না?

বিদ্যাসাগর ॥ মনের কি আর কিছু আছে যে, মনের কথা বলব? মন বলে পদার্থ থাকলে কত দিন আগেই বিবাগী হয়ে যেতাম।

দিনময়ী ॥ [গভীর গলায়] আচ্ছা, যখন প্রথম ছোট্টবেলায় এই বাড়ির বউ হয়ে এলাম তখন থেকে আমাকে একটু একটু করে লেখাপড়া শেখালে না কেন? রাজ্যের লোকের জন্যে ইস্কুল-পাঠশালা করতে পারলে আর নিজের বাড়ির মধ্যেই আমাবস্যে! আমি কি একেবারে এতই নির্বুদ্ধি ছিলাম।

বিদ্যাসাগর ॥ যাক, তুমি উদ্ধার হয়ে গেলে। আসছে জন্মে আমি প্রথমে তোমার মাস্টার হয়ে পরে বর হব। ইচ্ছে যখন একবার হয়েছে তখন

তোমার আর ভয় নেই। তবে এখন তো আর পাঠশালে গিয়ে ছুঁড়ীদের সঙ্গে কানমলা খেতে পারবে না।

দিনময়ী ॥ তুমি হাসলেও, আমি কি বুঝি না তুমি কি ভাবছ ?

বিদ্যাসাগর ॥ ওটা স্ত্রীরা নাকি বিয়ের রাত্তির থেকেই বুঝতে শুরু করে ; আর বুঝে বুঝে শেষ পর্যন্ত স্বামীটির কিছু রাখে না।

দিনময়ী ॥ তোমার কথায় হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারি নে।

বিদ্যাসাগর ॥ ওঃ, তুমি এখনও হাসি-কান্নার বাইরে যেতে পার নি বুঝি ? তা হলে বৃথাই তুমি পরোপকার করেছ [হেসে ওঠেন]।

[নারায়ণকে জোর করে ধরে নিয়ে আসেন গোপাল। নারায়ণ কিন্তু চুপ করে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকেন]

বিদ্যাসাগর ॥ শোন নারায়ণ! তুমি যে বিধবাটিকে বিবাহ করার মানস করেছ তার সম্পর্কে আমি বীরসিংহা থেকে আগেই খবর পেয়ে তোমার খুড়ো মশায়ের অনুরোধে একটি পাত্র ঠিক করেছি।

[শ্রোতারা সকলেই বিস্মিত]

পাত্রীর মা কৃষ্ণনগর থেকে বীরসিংহায় পাত্রীকে নিয়ে গিয়ে শম্ভুকে অনুরোধ করতে থাকেন। শম্ভু আমাকে চিঠি লেখায় অমি চেষ্টা করতে থাকি। তুমি যে ইতোমধ্যেই এই মনস্থ করেছ তা আমাকে আগে জানাও নি কেন ? তুমি কি পাত্রী দেখেছ ?

[নারায়ণ নতমস্তক, নির্বাক]

শম্ভুর এ বিবাহে অমত ; তোমার ঠাকুরদা ঠাকুমাও এ বিবাহে আসবেন না। তোমার মা আমার মানের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে মত দিচ্ছেন। বিধবা-বিবাহের ফলে জাত সন্তান-সন্ততি সমাজে সম্পূর্ণ স্বীকৃত হবে কি-না তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমার ধনৈশ্বর্য এমন কিছু নয় যে, তুমি তার জোরে সমাজকে অবহেলা করবে। তুমি নিজে এখনও উপার্জনক্ষম নও।

[সকলকে নিরীক্ষণ করেন]

দিনময়ী ॥ ছেলে উপায় করতে শিখলে বিয়ে করবে, এ নিয়ম হলে এ দেশ থেকে বিয়েই উঠিয়ে দিতে হবে। তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! [খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ] তোমার নিজের মতটা কি এতই ফেল্না ? সবারই মতামতের কথা বলছ আর নিজের কথাটাই চেপে যাচ্ছ কেন ? এত এত বিধবা-বিয়ে দেওয়ার সময় কি রাজ্যিসুদ্ধ লোকের

মত নিয়েছিলে? আসলে তোমার নিজের ইচ্ছে নেই বলে লোকের ওপর অমতের দায় চাপাচ্ছ। [বলে উঠে চলে যাচ্ছিলেন]

বিদ্যাসাগর ॥ ব'স নারায়ণের মা।

[শম্ভুচন্দ্রের প্রবেশ এবং বিদ্যাসাগর ও দিনময়ী দেবীকে প্রণাম। গোপালচন্দ্র ও নারায়ণের শম্ভুচন্দ্রকে প্রণাম]

শম্ভু, এসে পড়েছ, ভালই হল।

শম্ভু ॥ কেন দাদা, বিশেষ কিছু ঘটেছে নাকি?

বিদ্যাসাগর ॥ হাত মুখ ধুয়ে এসে বস। কথাটা খুব গুরুতর এবং আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছি।

শম্ভু ॥ আমিও সেই ব্যাপারেই উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসছি। নারায়ণের অভিপ্রায় আমি অবগত আছি। এ বিষয়ে বাবার সম্পূর্ণ অমত। মা হয়তো আপনার উপর কিছু বলবেন না, কিন্তু পূর্ণ অনুমোদন তাঁরও এ ব্যাপারে নেই। আপনার অবস্থা আমি বুঝি, কিন্তু ওই আপনার একটিমাত্র পুত্র। তার বিবাহ দিয়ে ঘরে বাইরে অশান্তি অপবাদ কেন কুড়োবেন? আত্মীয়কুটুম্বেরা সম্পর্কচ্ছেদ করবেন; এই বিবাহে দেশে কোনও আনন্দোৎসব করা যাবে না। একবার তো জ্ঞাতি-বৈরীরা ঘরে আগুন দিয়ে সর্বস্বান্ত করেছে; এবার কি আমাদের সকলকে আপনি প্রাণে মারতে চান? আপনি থাকেন এখানে; কিন্তু আমাদের যে থাকতে হয় পল্লীগ্রামে সমাজের শাসন মেনে?

বিদ্যাসাগর ॥ শম্ভু, তুমি তা হলে এতদিন যে আমার সহায়তা করেছ সে কি আমার ভয়ে, আমার অর্থের লোভে? তুমি কি বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস কর না?

শম্ভু ॥ যুক্তি দিয়ে জীবনের সব ক্ষেত্রে চলা যায় না দাদা। দেশাচারকে একবারে অস্বীকার করে কেন এই জেদের মাথায় কাজ করতে যাচ্ছেন? বাইরে মানুষ যা করে, ঘরেও কি তাই করে?

গোপাল ॥ এ আপনি কি বলছেন খুড়োমশায়? মানুষ কি তা হলে জীবনে ভণ্ডামিকেই শ্রেয় বলে মনে করবে?

শম্ভু ॥ এ ভণ্ডামি নয় গোপাল, ভূয়োদর্শন।

বিদ্যাসাগর ॥ শম্ভু, বিবাহের ব্যাপারে, বিশেষ করে এই রকম বিবাহের ক্ষেত্রে, সকলেই স্বতন্ত্রেচ্ছ। আমি কাউকে জোর করে কিছু করাতে চাই না; কিন্তু লোকাচারেরও আমি নিতান্ত দাস নই। জীবনে সুখের দিকে

তাকিয়ে কখনও কিছু করি নি বলেই আজ আমার জীবনের পরম আহ্লাদের দিনেও আমার কেবলই ভয় হচ্ছে—পাছে আমি সকলের কথা না ভেবে নিজের সুখটাই প্রবৃত্তিবশে বড় করে দেখি। নারায়ণ যে স্বেচ্ছায় আমার জীবনের ব্রত উদ্যাপনে সহায়তা করতে উদ্যোগী হয়েছেন, এর চেয়ে বেশী সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছু হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তোমরা আমার মতের কথা জিজ্ঞাসা করে শুধু এইটুকুই জানিয়ে দিলে যে, আমাকে তোমরা সকলেই স্বার্থপর ভেবেছ—মনে করেছ যে আমি ঘরে এক, বাইরে আর এক করব। অহো ভাগ্য, ঘরের লোকই যখন আমাকে চিনল না, তখন বাইরের লোকে যা-তা বলবে না কেন?

[কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখ মুছে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলেন]

নারায়ণ॥ [ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে বিদ্যাসাগরের সামনে বসে] বাবা, আমার এমন গুণ নেই যে আপনার মুখোজ্জ্বল করি; তবে আপনার জীবনের যা মহৎ ব্রত তার কিছুটা এ অধম সন্তানের সাধ্যায়ত্ত। আমি তাতে পশ্চাৎপদ নই। এই কাজে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই আমার জীবন ধন্য হবে, বিপক্ষবাদীরাও আর আপনার সদভিপ্রায়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবে না। সব সন্দেহের অবসান হবে আমার এই বিবাহে।

[বিদ্যাসাগর নারায়ণের মাথায় হাত রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। শম্ভুচন্দ্র উঠে বাড়ির ভিতরে চলে গেলেন]

কোথায় গেল!

কিরণ মৈত্র
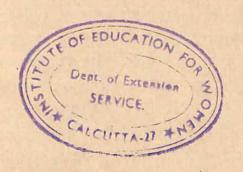
[পট উঠলে মঞ্চ অন্ধকার দেখা গেল। দেশলাই কাঠি একটা জ্বলে উঠল। অস্পষ্ট ভাবে দুটি মানুষকে দেখা গেল। একটা বড় মোমবাতি জ্বালানো হল। ঘরটা কিছুটা আলোকিত হলে দেখা গেল একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ীর একটা ঘর। ঘরের প্লাস-তারা খসে খসে পড়েছে। জানলা দরজাগুলো আধ ভাঙ্গা। একটা পায়া ভাঙ্গা খাটিয়া আধ শোয়ানো আছে। ভাঙ্গা মাটির কলসী, কিছু ন্যাকড়ার পুঁটলি, ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি ঘরময় ছড়ানো। নিমাই আর অতুল এদিক ওদিক দেখতে থাকে। বয়েস দুজনেরই ৩৫।৩৬র কোঠায়। ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড় পরনে। গোঁফ দাড়িতে মুখ ভরা। রুক্ষ চুল। সময় রাত প্রায় বারোটা। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে।]

নিমাই ॥ জায়গাটা মন্দ না! কি বলিস?

অতুল ॥ চমৎকার ঘর। ভেঙ্গে পড়তে যা বাকী।

নিমাই ॥ ফুটপাতের চেয়ে তো ভালো। ক'দিন আরামে থাকা যাবে।

অতুল ॥ কাল সকালেই দেখবি বাড়ীর মালিক এসে হাজির। কান ধরে বার করে দেবে।

নিমাই ॥ দিক। এতো আর প্রথম নয়। এর আগেও তো কয়েকবার কানমলা খেয়েছি।

অতুল ॥ সেবারে মনে আছে? দারুণ শীত। কনকনে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছি। খোলা পেয়ে একটা মোটর গ্যারেজে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম।

নিমাই ॥ মনে আছে। খুব ঘুমিয়েছিলাম।

অতুল ॥ কিন্তু ঘুম ভেঙ্গেছিল দ্বারোয়ানের লাথি খেয়ে। বুট জুতোটা না থাকাতে দ্বারোয়ানের পায়ে খুব লেগেছিল।

নিমাই ॥ লাথির কথাটা মনে নেই। তবে ভদ্রলোকের সেই কথাটা খুব মনে আছে, যা, ছেড়ে দিলাম। নেহাৎ আমি ভালো লোক তাই পুলিসে দিলাম না।

অতুল ॥ মারের কথা তোর মনে না থাক আমার আছে। গ্যারেজটার পাশের নর্দমার ধারে ক'ঘণ্টা মুখ থুবড়ে ছিলাম। গায়ে-পিঠের বেদনায় তিন দিন আমি নড়তে চড়তে পারি নি।...তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে এ ঘরে কেউ থাকে না!

নিমাই ॥ থাকলেই তো বিপদ। ঘরের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস! যে কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়লেই হল।

অতুল ॥ কিংবা হয়ত কর্পোরেশন ভেঙ্গে ফেলবার অর্ডার দিয়েছে।

নিমাই ॥ তবে কিছু দিন আগেও এ ঘরে—ইস্।

অতুল ॥ কি মাড়ালি?

নিমাই ॥ কুকুরে বোধ হয়—

অতুল ॥ শেয়ালের নয় তো—

নিমাই ॥ দূর কোলকাতায় আবার শেয়াল আসবে কোত্থেকে?

অতুল ॥ এ জায়গাটা আর কোলকাতা বলিসনা। ট্যাক্স বেশী করে পাওয়া যাবে বলে কর্পোরেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছে।...ঘুম পাচ্ছে।

নিমাই ॥ খাটিয়াও রয়েছে একটা। শুয়ে পড়। আরামে ঘুমোতে পারবি।

অতুল ॥ ইটও রয়েছে কয়েকখানা। মাথার বালিশ করা যাবে।

নিমাই ॥ আর দুটো দেওয়াল থেকে খসিয়ে নিয়ে আয়, বালিশ হয়ে যাবে। [খাটিয়াটা শোয়াতে শোয়াতে] এই এর পা গুলো যে নড়বড় করছে। দুজনে শুলে আবার ভেঙ্গে পড়বে না তো?

অতুল। দুজনে শোবার কি দরকার! তুই খাটিয়ার ওপর শো। আমি বরঞ্চ মাটিতে শোব।

নিমাই ॥ তোর তো একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। মাটিতে শুবি, আর সকালে উঠে কাশতে সুরু করবি। তুই খাটিয়াতে শুস্, আমি বরঞ্চ মাটিতে শোব!

অতুল ॥ না। তা হতে পারে না।

নিমাই ॥ খুব হতে পারে।

অতুল ॥ আচ্ছা বাবা, এক কাজ করা যাক্। তুই প্রথম রাতটা খাটিয়ায় শো। আমি শেষরাতে শোব।

নিমাই ॥ [আফশোষের সুরে] অনেকদিন খাটে শুই নি, না?

অতুল ॥ এটা খাট নয় রে, হতভাগা, খাটিয়া।

নিমাই ॥ ঐ হলো। [খাটিয়ায় বসে] বাঃ বেশ স্প্রিং করছে তো!

অতুল ॥ স্প্রিং এর চোটে সারারাত জেগে না কাটাতে হয়।
নিমাই ॥ খালি পেট জলতে সুরু করলেই হবে।
অতুল ॥ মাঝে মাঝে জলের ধাক্কা দিয়ে নেব।
নিমাই ॥ তাহলে ঐ কলসীটায় জল ভরে নিয়ে আয়।
অতুল ॥ নিশ্চয়ই ফুটো। নইলে ফেলে যায়।
নিমাই ॥ ঠিক বলেছিস্, ও আর দেখতে হবে না।
অতুল ॥ দেখ্ দিনের পর দিন জল খেয়ে আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে না।
নিমাই ॥ বাজে কথা বকিস না। পরশু সকালে ভাত খেয়েছি।
অতুল ॥ আজ আমার ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।
নিমাই ॥ ওঃ, কত সাধ! রোজ রোজ ভাত খাবেন?
অতুল ॥ বড্ড খিদে পাচ্ছে।
নিমাই ॥ পাবেই তো! সকালে কুলিগিরি করে চার আনা পয়সা পাওয়া গেছে। বললাম কচুরি খাওয়ার দরকার নেই। মুড়ি কেন। দেখতে অনেকগুলো হবে। দু বেলা খাওয়া চলবে। পেটটাও ভরা থাকবে। তা নয়—
অতুল ॥ গরম গরম আর ইয়া ফোলা ফোলা কচুরিগুলো দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না।
নিমাই ॥ আসবার সময় একটা পানের দোকানের সামনে অনেকগুলো ডাব পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। দাঁড়া, কটা কুড়িয়ে আনি। ভেঙ্গে তার শাঁসগুলো খাওয়া যাবে।
অতুল ॥ দূর পরের এঁটো খাব না।
নিমাই ॥ [হো, হো, করে হেসে উঠে] এঁটো! বেশ মজার কথা শোনালি!
অতুল ॥ ক্যাঁক, ক্যাঁক্ করে হাসিস না তো! ভালো লাগে না! একে খিদে পেয়েছে—
নিমাই ॥ বললাম তো ডাবের শাঁস খা। ভিটামিন আছে। তাল শাঁস তো আর জুটবে না।
অতুল ॥ কতবার বলবো যে খাবো না।
নিমাই ॥ তাহলে কল থেকে এক পেট জল খেয়ে আয়।
অতুল ॥ দূর, এমনি করে আর বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না।

[অতুল খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে]

নিমাই ॥ বেঁচে থাকবার জন্যে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ?

অতুল ॥ আচ্ছা নিমাই, ধর আমরা দুজনে ঘুমোচ্ছি।

নিমাই ॥ কিংবা খিদের জ্বালায় ঘুমোতে না পেরে এপাশ ওপাশ করছি।

অতুল ॥ তাই যেন হলো। এই বাড়ীর ছাদটা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল। আমরা তার তলায় চাপা পড়ে রইলাম। ফায়ার ব্রিগেড থেকে—

নিমাই ॥ দূর। ও ভাবে মরে লাভ কি ? কেউই তো জানতে পারবে না। কতদিন না খেতে পেয়ে, ঘুমোতে না পেয়ে কত কষ্ট করে আমরা মরে গেছি।

অতুল ॥ তাহলে চল্ দুজনে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে দি। পকেটে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে দেব, যে আমরা ভালো হতে চেয়েছিলাম। তাই ভালো ভাবে খেতে পাই নি।

নিমাই ॥ ভালো ভাবে কি রে ? বল খেতেই পাই নি।

অতুল ॥ আমরা লোকের বাড়ী সিঁদ কাটি নি—

নিমাই ॥ তাই লোকের বারাণ্ডাতেও একটু পড়ে থাকতে পারি নি।

অতুল ॥ বরং তাড়িয়ে দিয়েছে। চোর ভেবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নিমাই ॥ চুরি করতুম বলে জেল খেটেছি। কিন্তু কেন চুরি করতুম! বৌ ছেলের পেট চালাতেই তো! একবার জেল খেটে ফিরে গেলাম দু বছর বাদে। কারুর দেখা পেলাম না। বন্যার জলে কোথায় ভেসে গেছে কে জানে ?

অতুল ॥ আমিও তো ভাই বোনেদের পেট চালাতে পকেট কাটতুম। কতবার মার খেলুম। একবার জেল খাটলুম। কিন্তু ফিরে গিয়ে—

নিমাই ॥ আমারই মত তাদের দেখতে পেলি না।

অতুল ॥ না। শুনলাম অনেক দিন না খেয়ে কাটিয়ে আমার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করেছে। তারপর, তারপর একদিন হাত ধরাধরি করে ওরা কোথায় বেরিয়ে গেছে।

নিমাই ॥ এই চল্, আবার সিঁদ কাটি!

অতুল ॥ দূর, সিঁদ আমি কাটতে পারবো না। তার চাইতে পকেট কাটতে পারি।

নিমাই ॥ কিন্তু আমরা মা কালির পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর চুরি করব না। চুরি করা খুব খারাপ কাজ।

অতুল ॥ রেখে দে খারাপ কাজ! বড়লোকরা চুরি করার চাইতে আরও অনেক খারাপ কাজ করে।

নিমাই ॥ কিন্তু তাই বলে তো আমরা প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গতে পারি না।—আচ্ছা ধর—হঠাৎ যদি কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাই—

অতুল ॥ পাগলের মত একটু কিছু ধরলেই তো হল না।

নিমাই ॥ আহা, মনে করতে দোষ কি!

অতুল ॥ হঠাৎ দুচার ঘা মার খেয়ে যেতে পারি এ কথা মনে করতে পারি। কিন্তু টাকা পেয়ে যাব এ কথা—

নিমাই ॥ আহা মনেই কর না। তাহলে কি হবে?

অতুল ॥ কি আবার হবে! বেমালুম পাগল হয়ে যাব।

নিমাই ॥ তুই হতে পারিস। আমি হবো না।

অতুল ॥ তাহলে তো মজাই হবে। একাই সব টাকা—

নিমাই ॥ আচ্ছা আমি একা সব টাকা নিয়ে মজা করব, তুই ভাবতে পারলি? তাহলে তুই কি করবি?

অতুল ॥ পাগল হয়ে রাস্তায় টো টো করে বেড়াব।

নিমাই ॥ কক্ষনো না। ঐ টাকা দিয়ে তোকে পাগলা গারদে দিয়ে সারিয়ে আনব!

অতুল ॥ তাহলেই হয়েছে।

নিমাই ॥ আমাকে অবিশ্বাস করছিস? আচ্ছা এই তিন বছর ধরে তোতে আমাতে এক সঙ্গে আছি। যেদিন খাবার জুটেছে সেদিন সমান ভাগ করে খেয়েছি। যেদিন পাই নি সেদিন দুজনে না খেয়ে কাটিয়েছি। বল্ ঠিক কিনা—

অতুল ॥ তা ঠিক।

নিমাই ॥ তাহলে তুই বললি কেন যে টাকা পেলে তোকে আমি ফাঁকি দেব।

অতুল ॥ দেখলাম কথাটা শুনে তোর রাগ হয় কিনা!

নিমাই ॥ আমার এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল মনে হচ্ছিল তোকে এক চাঁটি কষিয়ে দি।

অতুল ॥ দিলি না কেন? [গভীর বেদনায়] জানিস খুব ছোটবেলায় বাবা একবার আমাকে চাঁটি মেরেছিল। তিন দিন ভাত খাইনি রাগ করে। মা কত সেধেছে তবু খাই নি—আর আজ—

[অতুল কান্না চাপতে চেষ্টা করে।]

নিমাই ॥ [গায়ে হাত বুলিয়ে] আর আজ ভাতও নেই, সাধবারও কেউ নেই।

অতুল ॥ [হঠাৎ নিমাইকে জড়িয়ে ধরে] সাধবার জন্যে তুই তো আছিস!

নিমাই ॥ কিন্তু ভাত নেই এই যা তফাৎ।

অতুল ॥ আমাদের কেউ নেই। কিছু নেই।

নিমাই ॥ আমরা আগাছার দল।

অতুল ॥ আমরা ফালতু।

নিমাই ॥ আমরা সমাজের পাপ।

অতুল ॥ সরকারী ভাষায় সমাজ বিরোধী। দূর দূর···এ ভাবে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে না।

নিমাই ॥ কিন্তু মরতেও তো মন চায় না।

অতুল ॥ তার জন্যই তো এতদিন মরতে পারিনি।

নিমাই ॥ আমরা কেন, কেউ মরতে চায় না।

অতুল ॥ একদল লোক বেশী করে বাঁচবে—

নিমাই ॥ তাই আমাদের কম করেও বাঁচতে দেয় না।

অতুল ॥ যাকগে, ও সব বড় বড় কথায় আমাদের দরকার নেই।

নিমাই ॥ পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

অতুল ॥ আহা, তাই যেন যায়, আজকাল জেলেও বড় বড় আর্টিষ্টরা গান শুনিয়ে যায়—

নিমাই ॥ তুই-ই তো আবার বড় বড় কথা স্বরু করলি!

অতুল ॥ পেট ফাঁকা থাকলে মুখের ফাঁক দিয়ে ও রকম বড় বড় কথা বেরোয়।

নিমাই ॥ বড্ড বাজে বকিস তুই।

অতুল ॥ আচ্ছা এইবার চুপ করলাম।

নিমাই ॥ হাঁ, যা বলছিলাম, যদি হঠাৎ কয়েক হাজার টাকা পেয়ে যাই—

অতুল ॥ এখনও তোর মাথায় ঐ সব কথা ঘুরছে!

নিমাই ॥ আহা, বললাম তো ধরতে ক্ষতি কি!

অতুল ॥ আচ্ছা ধরলাম। কত হাজার ধরব বল্।

নিমাই ॥ ধর্ দশ হাজার···কি করবি?

অতুল ॥ গাঁয়ে ফিরে যাব। ছোট্ট একটা ঘর তুলব। তারপর দুজনে মিলে একটা দোকান দেব।

নিমাই ॥ ঠিক আছে। আমার প্ল্যানের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তোর একটা বিয়ে দিয়ে টুকটুকে বৌ আনব। তোর বৌ রাঁধবে…বাড়বে… আমরা খাব। আর মজাসে দোকান চালাব।
অতুল ॥ তাহলে চল্।
নিমাই ॥ এই রাত্তির বেলা আবার কোথায় যাব!
অতুল ॥ [পরিহাসতরল স্বরে] দেখি, কোথাও টাকা পড়ে আছে কিনা— প্রথমেই এই ঘরটা খুঁজে দেখি—
নিমাই ॥ নেই কাজ তো খই বাছ।
অতুল ॥ [ঘুরতে ঘুরতে] এই করেই না হয় রাতটা…[একটা ছেঁড়া কাগজ তুলে নিয়ে] আহা, এটা যদি হাজার টাকার নোট হত! [কয়েকটা পড়ে থাকা ইঁটের টুকরো নিয়ে] আহা, এগুলো যদি সব সোনার তাল হতো…
নিমাই ॥ কিরে! পাগল হয়ে গেলি নাকি?
অতুল ॥ পাগল তো তুই করে ছাড়লি! [পড়ে থাকা কয়েকটি গাছের পাতা তুলে নিয়ে] আহা এ গুলো যদি দুটাকার নোট হতো……
নিমাই ॥ সবই তো দেখলি! ঐ যে কোণে একটা ন্যাকড়ার পুটলি পড়ে আছে। ওটা খুলে দেখ।
অতুল ॥ আমার লাকটা ভালো যাচ্ছে না। তুই খুলে ছ্যাখ। বলা যায় না তোর কপাল জোরে খোলা মাত্রই মুক্তো ঝরে পড়তে পারে।
নিমাই ॥ তাহলে তুই-ই ছ্যাখ।
অতুল ॥ না। তুই-ই ছ্যাখ।
নিমাই ॥ আচ্ছা বেশ এক কাজ করা যাক। আমরা দুজনে ঘরের এই কোণ থেকে ছুটে যাব। যে আগে ধরবে, সেই খুলবে।
অতুল ॥ ঠিক আছে।
নিমাই ॥ অল্ রাইট্। ষ্টার্ট।…

[দুজনে ছুটে গেল। প্রায় একসঙ্গেই পুঁটলিটা ধরল।]

অতুল ॥ আমি আগে ধরেছি।
নিমাই ॥ কক্ষনো না। আমি আগে।
অতুল ॥ ঠিক আছে, তাহলে তুই-ই খোল।
নিমাই ॥ না তুই-ই খোল।

[দুজনে বসল। অতুল খুলতে লাগল]

নিমাই ॥ লাগ্ লাগ্ ভেল্‌কি লেগে যা…মণি মুক্তো ঝরে যা…লাগ্ লাগ্…

[অতুল খুলেই চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি ন্যাকড়াটার মুখ বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখবার চেষ্টা করল। ভাঙ্গা দরজাটা বন্ধ করতে চেষ্টা করতে লাগল। অতুল নিমাই-এর হাবভাবে বিস্মিত হয়ে পুঁটলির মুখটা আবার খোলামাত্রই সে চমকে উঠ্‌ল।]

অতুল ॥ [অবাক বিস্ময়ে] এই, সত্যি সত্যি টাকা যে রে !

[নিমাই কাছে এসে ভয়ে ভয়ে, উত্তেজনায়, পুঁটলি থেকে একটার পর একটা দশ-টাকার নোটের বাণ্ডিল বার করতে লাগল। তারপর আবার পুঁটলিটা বেঁধে ফেলল]

নিমাই ॥ চল, পালাই।

অতুল ॥ না, এখন পালান ঠিক হবে না। ভোর রাতে সরে পড়লেই হবে।

নিমাই ॥ ঠিক বলেছিস ! কোথায় রাখা যায় টাকাগুলো !

অতুল ॥ কলসীটার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে কলসীটাকে উলটে রেখে দে।

[নিমাই তাই করল]

নিমাই ॥ কত টাকা হবে বল তো !

অতুল ॥ আট হাজার তো মনে হলো !

নিমাই ॥ এত টাকা এখানে এল কি করে বল তো !

অতুল ॥ আমিও তাই তো ভাবছি।

নিমাই ॥ আমি কিন্তু আগে পুঁটলিটা দেখেছি।

অতুল ॥ আমি যদি ঘরটা খুঁজতে না সুরু করতাম···তাহলে তো পুঁটলিটা ঐ খানেই পড়ে থাকত, আমরা চলে যেতাম।

নিমাই ॥ তাহলেও আমি দেখেছি।

অতুল ॥ আমি কিন্তু আগে ছুঁয়েছি।

নিমাই ॥ তুই ছুঁয়েছিস না আমি !

অতুল ॥ উহুঃ, আমি।

নিমাই ॥ উহুঃ, আমি।

অতুল ॥ আচ্ছা কি কথা হয়েছিল।

নিমাই ॥ যে আগে ছোঁবে, সেই খুলবে।

অতুল ॥ আমি খুলেছি। অতএব আমি আগে ছুঁয়েছি।

নিমাই ॥ বাঃ, আমি তো তোকে খুলতে বললাম।

অতুল ॥ [হঠাৎ হো, হো, করে হেসে ওঠে] আমরা কি বোকা ! পুঁটলি আগে কে দেখেছে, কে ছুঁয়েছে, সেই নিয়ে তর্ক করে মরছি কেন ! ও যেই দেখুক না কেন টাকাটার মালিক তো আমরা দুজনেই।

নিমাই ॥ [হেসে উঠে] সত্যি আমরা কি বোকা না! আমরা কি বোকা!...

[নিমাই হাসতে হাসতে খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে]

নিমাই ॥ উঃ আর আমাদের পথে পথে না খেয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে না।

অতুল ॥ আর আমাদের চুরি জোচ্চুরির কথা ভাবতে হবে না।

[অতুল খাটিয়ায় ঠেসান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে]

নিমাই ॥ এবার অনেক দূর কোন গাঁয়ে গিয়ে—

অতুল ॥ এই একটা কাজ করলে হয় না!

নিমাই ॥ [খাটিয়ার উপর থেকে ঝুঁকে পড়ে] কি!

অতুল ॥ আয়, টাকাটা আমরা দুজনে আধাআধি ভাগ করে নিয়ে যার যে দিকে ইচ্ছে চলে যাই। এক বছর বাদে আমরা আবার দেখা করব। হিসেব করে দেখব কার টাকাটা বাড়ল, আর কে কমিয়ে ফেলল।

নিমাই ॥ [উঠে বসে] তা কথাটা মন্দ না। তবে এখুনি ঠিক করে কাজ নেই। এখান থেকে আগে টাকাটা নিয়ে সরে পড়া যাক। তারপর ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে।

[নিমাই খাটিয়ায় শুল। অতুল একটু দূরে মেঝেয় গড়াল।]

অতুল ॥ ঘুমোন যাক্। কি বলিস?

নিমাই ॥ হ্যাঁ, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

[কিছুক্ষণ চুপ চাপ। তারপর অতুল ডাকে]

অতুল ॥ নিমাই! [সাড়া না পেয়ে] নিমাই। [উঠে বসে] নিমাই, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি!

[উঠে আসে পা টিপে টিপে, নিমাই এর কাছে]

অতুল ॥ নিমাই!

[সাড়া পায় না। তারপর ধীরে ধীরে কলসীটার কাছে গিয়ে সেটাকে সোজা করতে চেষ্টা করে। নিমাই-এর যেন ঘুম ভাঙ্গে। একটু মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে]

নিমাই ॥ কি করছিস রে ওখানে?

অতুল ॥ [চমকে] ভাবছিলাম কত টাকা আছে একবার গুণে দেখব।

নিমাই ॥ এখন আবার গোণবার দরকার কি! পরে গুণলেও চলবে।

অতুল ॥ হাঁ, তা বটে।

[অতুল ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ে।]

বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

নিমাই ॥ বেশ তো, ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমো। আমি তো জেগে আছি।

অতুল ॥ কৈ আর জেগে ছিলি? এই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলি!

নিমাই ॥ আমি তো ঘুমোই নি।

অতুল ॥ অতবার করে ডাকলাম, সাড়া দিলি না কেন ?

নিমাই ॥ দেখছিলাম তুই কি করিস ?

অতুল ॥ [অল্প চীৎকার করে] তুই আমাকে সন্দেহ করছিস ?

নিমাই ॥ দূর পাগল। তুই সন্দেহ করবার মত কোন কাজ করলে তবে তো সন্দেহ করব।...আমিও তোকে সন্দেহ করি না। তুইও আমাকে সন্দেহ করিস না। নে, ঘুমো।

[দুজনে আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে নিমাই ডাকে।]

নিমাই ॥ অতুল।

[অতুল সাড়া দেয় না]

নিমাই ॥ [আবার ডাকে] অতুল !

[এবারও সাড়া পায় না। নিমাই উঠে বসে। তারপর সেও কলসীটার দিকে আগাতে যায়। এবার অতুল পাস ফিরতে ফিরতে বলে]

অতুল ॥ ওদিকে যাবার চেষ্টা করিস না। শুয়ে প ।

[অতুল এসে শুয়ে পড়ে। একটু পরে অতুলের নাক ার শব্দ পাওয়া যায়। নিমাই এইবার উঠে বসে। আস্তে আস্তে কলসীটার কাছে য...। পুঁটলীটা বার করে কলসী থেকে, তারপর বেরিয়ে যাবে এমন সময় অতুল উঠে বসে।]

অতুল ॥ বিশ্বাসঘাতক শয়তান কোথাকার ! টাকাগুলো নিয়ে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে !

[তারপর হিংস্র ব্যাঘ্রের মত নিমাই-এর পড়ে।]

নিমাই ॥ বেশ করব, নেব। এ টাকা আমার !

অতুল ॥ কক্ষনো না, এ টাকা আমার !

[অতুল নিমাই-এর হাত থেকে পুঁটলিটা কেড়ে নিতে গিয়ে তা খুলে যায়। নোটের বাণ্ডিলগুলো ছড়িয়ে পড়ে স্টেজের ওপরে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওরা পরস্পর মারামারি সুরু করে। তারপর হঠাৎ অতুলের এক প্রচণ্ড ঘুঁসি খেয়ে নিমাই ছিটকে পড়ে যায়। অতুল নোটের বাণ্ডিলগুলো কুড়োতে কুড়োতে পুঁটলিতে ভরতে সুরু করে। তারপর একটা নোটের বাণ্ডিল নিয়ে হঠাৎ সে যেন থমকে দাঁড়ায়। তারপর মোমবাতির আলোয় তা ভালো করে দেখতে থাকে। তার মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়।]

অতুল ॥ এ কিরে, এ গুলো যে সব জাল নোট।

[অতুলের হাত থেকে পুঁটলি পড়ে যায়। নিমাই প্রায় গড়াতে গড়াতে একটা বাণ্ডিল হাতে তুলে নেয়। অতুল মোমবাতিটা তার কাছে ধরে। নিমাই একটু দেখে বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হাসতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। হাসি যেন কান্নায় রূপান্তরিত হয়ে যায়]

অতুল ॥ সব জাল নোট। নিশ্চয়ই কেউ ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে রেখে গেছে। কিংবা এই বাড়ীতেই নোট জাল হতো...

[অতুল নোটের বাণ্ডিলগুলো পুঁটলির মধ্যে ভরে কলসীর মধ্যে রেখে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে নিমাই-এর কাছে এসে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে]

খুব লেগেছে, না রে ?

নিমাই ॥ [অতি কষ্টে উঠে বসে] হাঁ, তা একটু লেগেছে বৈকি ! তোর লাগে নি !

অতুল ॥ তা লেগেছে বৈকি ? তুই-ও তো কম মারিস নি।

[অতুল নিমাই-এর গায়ে হাত বুলোতে থাকে। নিমাইও অতুলের। হঠাৎ অতুল নিমাইকে জড়িয়ে ধরে বলে—]

অতুল ॥ হঠাৎ আমরা কত ছোট হয়ে গিয়েছিলাম, নাঃ।

নিমাই ॥ চল্। চলে যাই। এখানে থেকে কাজ নেই।

অতুল ॥ তাই চল্।

[অতুলের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে নিমাই দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে নিমাই মোমবাতিটা পকেটে করে নেয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। দু-দিকের পর্দা এসে মেশে।]

মনোবিকলন

রমেন লাহিড়ী

[মানসিক রোগের চিকিৎসক নিশীথনাথের বাড়ীর বৈঠকখানা। সাজসজ্জার বাহুল্য নেই—সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট। আসবাবের মধ্যে একটি ছোট গোল টেবিলকে ঘিরে তিনটি চেয়ার। পেছনে একটি বই-এর র‍্যাক। তাতের ফুলদানী। ডানদিকের দেওয়াল ঘেসে একটি সোফা। পেছনের দেওয়ালে নিশীথ ও তার স্ত্রী বিনতার ছুটি ছবি। মাঝ বরাবর একটি দেওয়াল ঘড়ি। নিশীথ যুবক, সুপুরুষ। সদাহাস্যময়। বিনতা বিদুষী ও সুন্দরী। সুগৃহিণী।...এক শনিবার সন্ধ্যার ঘটনা। বড় ঘড়িতে পৌনে সাতটা বাজে। বাপের আমলের ভৃত্য রঘুদা ফুলদানীতে ফুল সাজিয়ে রাখছিল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। তারপর...]

রঘুদা ॥ ঐ যাঃ, ঘড়িটাতো বন্ধ হ'য়ে গেছে! [অন্দরের উদ্দেশ্যে] বৌদি, ও ঘরের ঘড়িতে ক'টা বাজে দেখতো? বড় ঘড়িটা বন্ধ হ'য়ে গেছে। [নেপথ্য থেকে বিনতা উত্তর দিল—সাতটা বেজে সাতাশ]—সাতটা বেজে সাতাশ?—[ঘড়িতে দম দিল। কাঁটা ঘোরালো] এই হ'লো সাতটা [কাঁটা ঘোরানো থামলো না]। আর এই হ'লো পাঁচ, দশ, পনেরো, বিশ, পঁচিশ, সাতাশ। ঐ যাঃ ছু'মিনিট ফাষ্ট হ'য়ে গেল। যাক'গে। [পেণ্ডুলামটা ছুলিয়ে দিল]। যতবারই চাল ি কেবলি বলে টক টক, টক টক। কেনরে বাপু, ভুলেও কি একবার মি মিষ্টি বলতে নেই!

[বিনতার প্রবেশ

বিনতা ॥ কি ব'কছো রঘুদা আপন মনে?

রঘুদা ॥ ব'কছি এই ঘড়িটাকে। যতবারই চালাই—

বিনতা ॥ [ঘড়ি দেখে] সাড়ে সাতটা বাজতে চললো—এখনও তোমার দাদাবাবুর দেখা নেই। সিনেমায় যেতে ঠিক দেরী হয়ে যাবে।

রঘুদা ॥ এসে পড়বে'খন সময়মত। সিনেমা তো সেই রাত ন'টায়।

বিনতা ॥ তা হোক। তুমি একটু ঘুরে এসো দেখি শংকর বাবুদের বাড়ী থেকে। নিশ্চয়ই সেখানে তাসের আড্ডায় জমেছেন।

রঘুদা ॥ আর খানিক দেখে গেলে হয় না ?

বিনতা ॥ উঃ কি কুঁড়ে তুমি! কাজের নাম শুনলেই কুঁকড়ে যাও! যাকগে, বাইরে যেতে হবে না। উনুন ধ'রে গেছে—ভাতের জলটা চাপিয়ে দাও।

রঘুদা ॥ একেবারে খাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে সিনেমায় গেলেই তো পারতে!

বিনতা ॥ বাপরে বাপ! তোমার কর্তামির জ্বালায় অস্থির! [ঘড়িতে সাড়ে সাতটার ঘরে সাতটা বাজলো] একি! সাড়ে সাতটার ঘরে সাতটা বাজলো কেন ?

রঘুদা ॥ [মাথা চুলকে]—তাইতো।

বিনতা ॥ ঘড়িতে ঠিক দম দিয়েছিলে তো ?

রঘুদা ॥ হ্যাঁ। বেশ ভালো করে দম দিয়ে চালিয়েছি।

বিনতা ॥ ক'টা বেজে বন্ধ হয়েছিল দেখনি ?

রঘুদা ॥ দেখেছিলাম তো ?—সাড়ে ছ'টা বেজে—

বিনতা ॥ থামো। থামো। যেদিকটা আমি নিজে না দেখবো, সেদিকটাই বেচাল হ'য়ে যাবে! তুমি আর ঘড়িতে দম দেবে না।

রঘুদা ॥ সেকি বৌদি! গিন্নিমা স্বগ্‌গে যাবার পর থেকে ঐ ঘড়িটাকে আর দাদাবাবুকে আমিই তো চালিয়ে এসেছি!

বিনতা ॥ কেমন যে চালিয়ে এসেছো, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। সময়-জ্ঞান যদি কারো থাকে!

রঘুদা ॥ তা যন্তরই বলো, আর মানুষই বলো—কারো কথা কি জোর দিয়ে বলা যায়। কখন যে ঠিক থাকে, কখন যে—

বিনতা ॥ দোহাই তোমার—একটু থামো। কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল।

[নেপথ্যে নিশীথের ডাক শোনা গেল—রঘুদা—]

রঘুদা ॥ ঐ তো নাম করতে করতেই আসছে। [নিশীথের প্রবেশ]—তুমি অনেকদিন বাঁচবে দাদাবাবু।

নিশীথ ॥ এক কাপ কড়া চা না পেলে আর এক মূহূর্তও বাঁচবো না।

বিনতা ॥ না, না—এত রাতে আর চা খেতে হবে না। এই তো সাড়ে পাঁচটায় চা খেয়ে বেরুলে!

নিশীথ ॥ হ্যাঁ। আর সাড়ে সাতটা বাজে। ইস্, দুঘণ্টা চা না খেয়ে আছি! —আর এদিকে ডাক্তারে ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খেতে বলেছে! রঘুদা—তুমি এখনও দাঁড়িয়ে!

রঘুদা ॥ যাচ্ছি। যাচ্ছি। বৌদি, তুমিও খাবে তো ?

নিশীথ ॥ নিশ্চয়ই। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ভাল নয়। যাও—বেশী দেরী করো না। [রঘু চলে গেল। নিশীথ বসলো]

বিনতা ॥ নাঃ, চা খেয়ে খেয়ে লিভারটাকে নষ্ট ক'রে ছাড়বে।

নিশীথ ॥ দূর। চায়ে কত উপকার হয় জানো ? চায়ের লিকারে ক্যাফিন আছে, চিনিতে কার্বো হাইড্রেট আছে, আর দুধ তো আদর্শ খাদ্য !

বিনতা ॥ খুব হয়েছে, থামো। ক'টা বাজে খেয়াল আছে ? সিনেমায় যেতে হবে না ?

নিশীথ ॥ তা এর মধ্যে কি ? মোটে তো সাড়ে সাতটা বাজে।

বিনতা ॥ তা হোক। জামা কাপড় পরতে পরতেই সময় হ'য়ে যাবে।

নিশীথ ॥ [পাজামা পাঞ্জাবী পরেছিলো, পোষাকটা একনজর দেখে বললো] আমি এই প'রেই যাব।

বিনতা ॥ অমনি সংএর মত সেজে !

নিশীথ ॥ পুরুষ মানুষের অত সাজের ঘটা ক'রে কিঁ হবে ? তোমার পরী সাজবার ইচ্ছে হয়ে থাকে—যাও, সাজগে।

বিনতা ॥ [অভিমানে] কথায় কথায় অমন যা তা বলো কেন বলো তো ? গায়ের রংটা না হয় কালোই—

নিশীথ ॥ [অভিমান ভাঙ্গতে কথা ঘোরালো] না, না আমি বলছি মানে— ঐ আকাশী রংএর শাড়ীটায় তোমাকে মানিয়েছে কিন্তু ভারী চমৎকার ! মনে হচ্ছে—

বিনতা ॥ [মুখ ভার ক'রে চলে যাচ্ছিল] থাক, থাক। আমি বুঝি সব।

নিশীথ ॥ [কাছে গেল] এই। ঠাট্টা বোঝনা !

বিনতা ॥ কথায় কথায় অমন ঠাট্টা করো কেন ? আমার ভালো লাগে না।

নিশীথ ॥ আচ্ছা বেশ। ঠাট্টা থাক। আমাদের মেণ্টাল হসপিটালে আজ একটি ভারী ইণ্টারেষ্টিং কেস এসেছে -তার কথা বলি। ব'সো।

বিনতা ॥ থাক, তোমার পাগলা গারদের গল্প আর শুনতে চাই না। মন খারাপ হ'য়ে যায়।

নিশীথ ॥ [হেসে] মনোবিজ্ঞানীরা কি বলেন জানো ?

বিনতা ॥ কি বলেন ?

নিশীথ ॥ বলেন, প্রত্যেক মানুষই কোন না কোনও এক ধরণের মানসিক

রোগে ভুগছে। যার মধ্যে এই রোগের প্রকোপ বেশী তাকেই আমরা বলি পাগল।

বিনতা॥ তাই নাকি! তাহলে আমি? আমিও পাগল!

নিশীথ॥ ঠিক পাগল না হলেও—ছিটগ্রস্ত।

বিনতা॥ ছিটগ্রস্ত!—কেমন ক'রে বুঝলে?

নিশীথ॥ এমনিতে তোমার কথাবার্তা শুনে বা তোমার কাজের বাঁধুনি দেখে তোমাকে ছিটগ্রস্ত ভারা অবশ্য কঠিন। তবে তোমার পাগলামিটা কখন প্রকাশ পায় জানো?—সিনেমা যাবার বেলা। যে কোন কারণেই হোক, শো আরম্ভ হবার আধঘণ্টা আগে থেকে তুমি সিনেমায় গিয়ে হাজির হবেই।

বিনতা॥ বাঃ,—এর মধ্যে আবার পাগলামির কি আছে? ছবি আরম্ভ হ'য়ে যাবার পর সিনেমায় যাওয়ার কোনও মানে হয় নাকি?

নিশীথ॥ তাই ব'লে আধঘণ্টা আগে থাকতে সিনেমায় গিয়ে ব'সে থাকারও কোন মানে হয় না! আসলে, এটা একটা বাতিক।—আর কেমন করে এই বাতিক জন্মেছে তাও আমি বলে দিতে পারি।

বিনতা॥ বলো তো দেখি?

নিশীথ॥ [বিনতার কাছে এসে] ছোট বেলায় তুমি হয়তো সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসতে। কিন্তু গুরুজনদের ভয়ে হয়তো সিনেমায় যেতে পেতে না। যদিও বা কখনো সখনো যাওয়ার সুযোগ ঘটতো—তাহলেও হয়তো একা যেতে পেতে না; বড়দের কারো সঙ্গে যেতে হতো—অথচ বড়দের ঢিলেমির জন্যে হয়তো সিনেমায় যেতে দেরী হ'য়ে যেতো। তাই বড় হ'য়ে যখন একা একা সিনেমায় যেতে শিখলে—তখন হয়তো দেরী হয়ে যাবার ভয়ে শো আরম্ভ হবার অনেক আগে গিয়ে বসে থাকতে। ক্রমশঃ সেই অভ্যাসটাই আজ স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে!

বিনতা॥ [হাসলো তার অপরূপ ব্যাখ্যা শুনে। ব্যংগ ক'রে বললো] বাঃ বেশ বললে তো!—আচ্ছা, লোকের মনের কথা তোমরা এত সহজে টের পাও কি ক'রে?

নিশীথ॥ আমরা যে মনোবিজ্ঞানী!

বিনতা॥ ওঃ—তাই! আচ্ছা, এ রোগ সারানোর কোনও চিকিৎসা নেই?

নিশীথ॥ আছে বৈকি। এক রকমের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আছে—তাকে বলে মনোবিকলন। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রথমে মানসিক রুগীর রোগের

প্রকৃতিটা জেনে নেওয়া হয়, তারপর উপযুক্ত চিকিৎসা ক'রে রোগ সারানো হয়।

বিনতা॥ [নিশীথের কাছে এসে] আমার একটা কথা রাখবে ?

নিশীথ॥ কি কথা ?

বিনতা॥ রাখবে কিনা বলো আগে।

নিশীথ॥ নিতান্ত দুঃসাধ্য না হ'লে নিশ্চয়ই রাখবো।

বিনতা॥ [তার হাত ধ'রে] মনোবিকলন ক'রে তোমার পাগলামিটাও সারিয়ে নাও না গো।

নিশীথ॥ কি ? আমি পাগলামি করি ! কক্ষনো না।

বিনতা॥ বাঃরে, একটু আগে তুমিই তো বললে—সব মানুষই অল্পবিস্তর পাগল !

নিশীথ॥ এ্যাঁ !—হ্যাঁ। তা ঠিক।—তবে—। আচ্ছা বেশ, আমার মধ্যে পাগলামির কি লক্ষণ দেখেছো বলো ?

বিনতা॥ দুনিয়া শুদ্ধু লোককে পাগল ভাবাটাই তো পাগলামির মস্ত বড় লক্ষণ ! বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন কথা কেউ ভাবে নাকি ?

নিশীথ॥ তার মানে, তুমি বলতে চাও—আমি একটি বদ্ধ পাগল ?

বিনতা॥ নিশ্চয়ই। তা নইলে এমন লক্ষ্মীছাড়া কথা কেউ বলে ?

নিশীথ॥ দেখ, যা বোঝ না, তা নিয়ে তর্ক করতে আসো কেন বলো দেখি ?

বিনতা॥ ও ! বুঝিনা ! বেশ, তুমি যে একটি পয়লা নম্বরের পাগল তা যদি প্রমাণ করে দিতে পারি—তাহ'লে আমাকে কি দেবে ?

নিশীথ॥ হুঁ—চ্যালেঞ্জ ! All right I accept.—আর যদি না পারো, তাহ'লে তুমি আমাকে কি দেবে ?

বিনতা॥ না, তুমি হেরে গেলে কি দেবে তাই আগে বলো।

নিশীথ॥ কি দেব ? [একটু ভেবে] আচ্ছা বেশ, তুমি যা চাইবে, তাই দেব !

বিনতা॥ বেশ, এবার পূজোয় একটা শ্যাওলা রংএর টিস্যু শাড়ী কিনে দিতে হবে।

নিশীথ॥ শ্যাওলা রংএর টিস্যু শাড়ী কিনে দিতে হবে ! [খুব হাসলো] শ্যাওলা রংএর টিস্যু শাড়ী ?—বেশ, তাই দেব। আর তুমি হেরে গেলে ?

বিনতা॥ তুমি যা বলবে, তাই করবো।

নিশীথ ॥ বেশ। তুমি হেরে গেলে, একটি বচ্ছর বাপের বাড়ী যেতে পাবে না।

বিনতা ॥ [একটু থমকে গেল] এক বচ্ছর!

নিশীথ ॥ হুঁ। তুমিই চ্যালেঞ্জ করেছো। পেছিয়ে গেলে চলবে না। আর এই চ্যালেঞ্জ তিনদিন valid থাকবে; তিনদিনের মধ্যে আমাকে হারাতে না পারলে তোমাকে হার মানতে হবে। [নিশীথ বিনতার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।]

বিনতা ॥ [নিশীথের হাতে হাত রেখে] আমি রাজী।

[দুকাপ চা হাতে রঘুর প্রবেশ]

নিশীথ ॥ নাঃ রঘুদা—তুমি সত্যিই বুড়ো হ'য়ে গেছ। দু-কাপ চা করতে এত দেরী! [বিনতা নিশীথকে চা দিল। নিজে নিল]

বিনতা ॥ [এক চুমুক দিয়ে] ইস্ ভীষণ কড়া হ'য়ে গেছে!

নিশীথ ॥ [এক চুমুক দিয়ে] বাঃ! চমৎকার হয়েছে! বেঁচে থাকো রঘুদা।

রঘুদা ॥ ভাত আর মাংস ছাড়া আর কি রান্না হবে?

বিনতা ॥ না। আবার কি? মাংস নামিয়ে ভাতটা চড়াবে।

নিশীথ ॥ গরম ভাত আর মাংস! আঃ! গ্র্যাণ্ড হবে। এখনই জিভে জল আসছে!

বিনতা ॥ থামো তো দেখি। কেবল খাই, খাই। চলো রঘুদা, চালটা মেপে দিয়ে আসি।

নিশীথ ॥ এক কুনকে চাল বেশী নিও কিন্তু। চিবিয়ে চুষে চেটে গিলে একচোট যা খাবো আজ। [হাসতে লাগলো]

রঘুদা ॥ তাহলে খানিকটা পেঁপের চাটনিও করলে তো হয়! করবো?

বিনতা ॥ চলো। চলো। যেমন উনি, তেমন তুমি। পেট সর্বস্ব!

নিশীথ ॥ বিনু, ওঘরে বুককেসের সব নীচের তাকে একটা মোটা লাল মলাটের বই আছে, নিয়ে এসো তো আসবার সময়।

[বিনতা ও রঘু চলে গেল। নিশীথ সামনে রাখা সেদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে পড়তে লাগলো]

নিশীথ ॥ [কাগজ পড়তে লাগলো] ভীষণ বিমান দুর্ঘটনা—তেত্রিশ জন নিহত…বাস লরী সংঘর্ষ…তেরজন আহত। পাক-পুলিশের গুলিতে তিনজন ভারতীয় চাষী নিহত…আণবিক বোমার পরীক্ষা!—নাঃ কাগজ

খুললেই কেবল মৃত্যু, হত্যা আর বোমা-বিস্ফোরণ! শান্তিতে থাকতে দেবে না দেখছি কিছুতেই!

[বই হাতে বিনতা ঢুকলো]

বিনতা ॥ এই বইটা? [বই দিল]

নিশীথ ॥ হ্যাঁ। [বইএর ওপর জমে থাকা ধুলো সাফ করতে লাগলো]

বিনতা ॥ কদ্দিন খোলনি বইটা? পাতায় পাতায় ধুলো জমে গেছে।

নিশীথ ॥ বইটা আর বিশেষ কাজে লাগে না তো। যাক্, ওঘরের কাজ সারা হ'য়ে গিয়ে থাকে তো, বসো না একটু কাছে।

বিনতা ॥ বসবো কি গো! সিনেমায় যেতে হবে না?

নিশীথ ॥ তার এখনও ঢের দেরী আছে। একটা চ্যাপ্টারে চোখে বুলিয়ে নিয়েই উঠে প'ড়বো।

[বইয়ে মন দিল। বিনতা একটু চুপ থেকে দেখল তার বইয়ে মনঃসংযোগ। একটু পেছিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে ধরা একটা নীল কাগজ বার ক'রে পড়তে লাগলো।]

বিনতা ॥ পরম পূজনীয় প্রাণাধিকেষু প্রিয়তম আমার—

নিশীথ ॥ [বই থেকে মুখ না তুলেই] বিনু, জ্বালাতন করো না। লক্ষ্মীটি।

বিনতা ॥ [প'ড়ে চললো] তোমার সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠিটা পড়তে পড়তে তোমার সুন্দর মুখের কথাই মনে প'ড়ছে—

নিশীথ ॥ বিনু প্লীজ, এই চ্যাপ্টারটা পড়ে নিয়েই উঠবো।

বিনতা ॥ তা বেশ তো। পড়ো না। তুমিও পড়ো। আমিও পড়ি। [পড়তে লাগলো] হাতের মুঠোয় রয়েছে তোমার চিঠিটা। এর মাঝে আমি যেন তোমার হাতেরই স্পর্শ পাচ্ছি!

নিশীথ ॥ [বই বন্ধ করে] রাবিশ! ওটা কি চিঠি, না পাগলের প্রলাপ।

বিনতা ॥ তা আমি কি জানি? যার চিঠি আর যে লিখেছে তারাই বলতে পারে।

নিশীথ ॥ যতো সব জঞ্জাল! উনুনে ফেলে দাও গে। [আবার বই খুললো]।

বিনতা ॥ ইস্ তুমি কি নিষ্ঠুর গো! প্রাণে ধ'রে বলতে পারলে ঐ কথা! বাসু শুনলে কি বলবে বলো তো?

নিশীথ ॥ বাসু! তিনি আবার কিনি?

বিনতা ॥ এ্যাঁ!—তুমি কি গো? বাসুকে চিনতেই পারলে না? নাঃ পুরুষরা এমনিই হয় বটে।

নিশীথ ॥ কি আপদ! এর মধ্যে বাস্থ এসে জুটলো কোথা থেকে?

বিনতা ॥ তা আমি কি জানি? চিঠির শেষে লেখা রয়েছে 'ইতি তোমারই বাস্থ'—তাই বললাম।

নিশীথ ॥ দেখি কার চিঠি। [চিঠি নিয়ে দেখে]—I see বাস্থ! বাসবী! —আরেঃ, এদ্দিন বাদে বাসবীর চিঠি তুমি আবিষ্কার করলে কোথা থেকে?

বিনতা ॥ যাক, চিনতে পারলে তাহ'লে?—আচ্ছা বাসবী কে?

নিশীথ ॥ উঃ! ভারী কৌতূহল দেখি!

বিনতা ॥ তা একটু কৌতূহল হচ্ছে বৈকি। বলো না গো!

নিশীথ ॥ [চিঠি দেখতে দেখতে কতকটা আত্মগতভাবে] দেখতে দেখতে দশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। কিন্তু কি আশ্চর্য বলো তো?

বিনতা ॥ কি আশ্চর্য?

নিশীথ ॥ দশ বছর আগে যাকে একদিন না দেখে থাকতে পারতাম না— আজ তার কথা একেবারে ভুলেই গেছি!

বিনতা ॥ সত্যি, ভারী আপশোষের কথা! তা শুধু চিঠিতেই ইতি হয়েছিল —না আরো এগিয়েছিলে?

নিশীথ ॥ [সকৌতুকে] কি জানি—মনে নেই।

বিনতা ॥ আহা, আর কেন ভাল মানুষ সাজছো? বলেই ফেল'না বাপু।

নিশীথ ॥ কি হবে শুনে?

বিনতা ॥ সে আমি বুঝবো। বলো না গো।

নিশীথ ॥ দূর, কি হবে সে ছেলে বয়সের ছেলেমানুষীর কথা শুনে। তা ছাড়া, সব কথা ঠিক ঠিক মনেও নেই।

বিনতা ॥ যা মনে আছে তাই বলো।—আচ্ছা, কেমন ক'রে আলাপ হলো?

নিশীথ ॥ [একটু ইতস্ততঃ ক'রে] সত্যি শুনবে? [বিনতা ঘাড় নাড়লো] কিন্তু কোন মন্তব্য করতে পারবে না।

বিনতা ॥ বেশ বেশ। তুমি স্থরু করো তো।

নিশীথ ॥ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সেবার প্রথম এলাম কলকাতায় পিসিমার বাড়ী। এক বিকেলে পিসতুতো ভাইটি ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলো ছাতে। আমি দেখছিলাম। হঠাৎ ঘুড়িটা গিয়ে আটকালো সামনের বাড়ীর ছাতে। কিছুতেই খোলে না। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে নজরে পড়লো সেই বাড়ীর নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে বাসবী। চোখে চোখ

পড়তেই স'রে যাচ্ছিল। বললাম—ছাতে ঘুড়িটা আটকে গেছে, খুলে দাও তো।

বিনতা॥ তারপর ?

নিশীথ॥ তারপর আর কি ? ঘুড়ির স্থতো খুলে গেল।

বিনতা॥ হ্যাঁ ঘুড়ির স্থতো খুললো, কিন্তু একজনের মনের তারে আর একজনের মনের স্থতো জড়িয়ে গেল—এই তো ?

নিশীথ॥ কি জানি। তাই হবে হয় তো।

বিনতা॥ তা এই কথাটা বলতে অত ভণিতা করা হচ্ছিল কেন ? কত মানুষের জীবনেই তো এমন ঘটে।

নিশীথ॥ তোমার জীবনেও ঘটেছে ?

বিনতা॥ যাঃ। [দুজনে হাসলো] বলিহারী যাই তোমাকে। ঐ বয়সেই অত কাণ্ড !

নিশীথ॥ ব্যাপার কি জানো—ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যেমন মিষ্টি খাবার দেখলেই লোভ হয়, তেমনি সতেরো আঠারো বছরের ছেলেদেরও স্থন্দরী মেয়ে দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কবি সাহিত্যিকরা একেই বলেন যৌবনের দুষ্টু খিদে !

বিনতা॥ দুষ্টু খিদে ! বাঃ বেশ যুক্তি। তা তোমার দুষ্টু খিদেটা মরেছে তো ?

নিশীথ॥ একেবারে মরেছে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে ! তবে মরো মরো হয়েছে—তা ঠিক।

বিনতা॥ ম'লেই বাঁচি।

নিশীথ॥ হিংসে হ'চ্ছে বুঝি ?

বিনতা॥ বাঃ রে হিংসে হ'তে যাবে কেন ?

নিশীথ॥ আমার প্রথম প্রেমের গল্প শুনে। হাজার হোক স্ত্রীলোক তো।

বিনতা॥ স্ত্রীলোক ব'লেই তো হ'চ্ছে না। পুরুষ হলে হয়তো হ'তো।

নিশীথ॥ তাই নাকি ! পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান যে দেখছি অসীম।

বিনতা॥ থাক মশাই। অত বড়াই করতে হবে না। বিয়ের পর আমার বই খাতায় কোনও পুরুষ মানুষের নাম দেখলে তার পরিচয় জানবার জন্যে কত জ্বালাতে মনে নেই ?

নিশীথ॥ ওঃ সে তোমায় ঠাট্টা করবার জন্যে। পুরুষদের মন মেয়েদের মত অত প্যাঁচালো নয় বুঝলে ?

বিনতা ॥ হুঁ প্যাঁচালো নয় বটে। তবে জিলিপির মত সরল।

নিশীথ ॥ পুরুষদের মন বুঝলে আকাশের মত উদার,—কাঁচের মত স্বচ্ছ আর—

বিনতা ॥ আর গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতার মত পবিত্র! বলো। বলো। থামলে কেন?

নিশীথ ॥ থামলে কেন—এ্যাঁ! [খপ্ ক'রে বিনতার হাত চেপে ধরে] ভারী চালাক হয়েছো না? ভেবেছো, এইভাবে আমাকে রাগিয়ে দেবে। তারপর আমিও রাগের মাথায় যা-তা বলতে থাকবো। তখন আমার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবে—ঐ তো তুমি পাগলামি করছো! এ্যাঁ?

বিনতা ॥ [কৃত্রিম বিস্ময়ে] সত্যি, কি বুদ্ধি তোমার! [নেপথ্যে কড়া-নাড়ার শব্দ] আঃ কে আবার ডাকতে এলো?

নিশীথ ॥ কে আবার মূর্তিমান বেরসিক! রঘুদা, কে কড়া নাড়ছে দেখ তো?

[রঘু বাইরের দিকে গেল]

বিনতা ॥ ও নিশ্চয়ই শংকরবাবুর লোক। তাস খেলতে ডাকতে এসেছে।

নিশীথ ॥ না! অন্য কেউ নিশ্চয়ই। ওরা জানে আমি আজ সগিন্নী সিনেমায় যাব।

বিনতা ॥ বাঃ, সে গল্পও করা হয়েছে!

নিশীথ ॥ না বললে কি উঠতে দিতো নাকি? গিন্নীকে যথাসময়ে সিনেমায় না নিয়ে যেতে পারলে কি দারুণ নিগ্রহ ঘটে—সে অভিজ্ঞতা ওদের সবাইয়ের তো আছে! [বিনতা ও নিশীথ হাসলো। রঘু ঢুকলো] কে রঘুদা?

রঘুদা ॥ কি জানি, চেনা মনে হয় না। স্যুট বুট পরা।

[রঘু চলে গেল]

নিশীথ ॥ স্যুট বুট পরা? তাহলে বোধহয় হস্‌পিটালের ডাক্তার। ডাকো তো।

বিনতা ॥ যেই হোক বাপু—দু কথায় কাজ সেরে বিদায় করো। আজ আর কোথাও বেরুতে পাবে না।

নিশীথ ॥ তেমন জরুরী কিছু হ'লে বেরুতে হবে বৈকি! Duty first.

বিনতা ॥ ও! আচ্ছা। [অভিমানে চলে যাচ্ছিল, দিব্যেন্দু ঢুকলো]

দিব্যেন্দু ॥ বিনু!

বিনতা ॥ আরেঃ! দিব্যেন্দুদা! তুমি! উঃ কত, কতদিন পরে দেখা! [আনন্দে তার হাত চেপে ধরলো] সোজা রেঙ্গুন থেকে আসছো?

দিব্যেন্দু ॥ হ্যাঁ। [নিশীথকে]—আপনি নিশ্চয়ই এর– [নিশীথ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো]—নমস্কার। বিনুর বিয়ের সময় ছিলাম রেঙ্গুনে। তাই আসতে পারিনি।

বিনতা ॥ আরে দাঁড়িয়েই রইলে যে? বসো। [দিব্যেন্দু বসলো] কবে এলে? কোথায় উঠেছো?

দিব্যেন্দু ॥ এসেছি কাল সকালে। উঠেছি একটা হোটেলে। Excuse me, আপনার নামটা—কিন্তু ভুলে গেছি—কি যেন—

নিশীথ ॥ নিশীথ। নিশীথ চক্রবর্তী। আপনি?

দিব্যেন্দু ॥ দিব্যেন্দু গাঙ্গুলী। বিনুর—

বিনতা ॥ বেশ লোক যাহোক! হোটেলে উঠলে কি ব'লে? আমাদের এখানে উঠতে পারলে না?

দিব্যেন্দু ॥ ঠিকানা কি মনে ছিলো? আজ সকালে তোমাদের বাড়ী গিয়ে ঠিকানা নিয়ে—

বিনতা ॥ বেশ ক'রেছো! কোন হোটেলে উঠেছো বলো? একটা চিঠি লিখে দাও—রঘুদা গিয়ে জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসুক।

দিব্যেন্দু ॥ না, না। তার দরকার নেই। দিন পাঁচেক তো ভারী ক'লকাতা বাসের মেয়াদ।

নিশীথ ॥ তবে এই ক'টাদিন এখানেই থেকে যান। রঘুদা—

দিব্যেন্দু ॥ না, না। ও পারবে না সব গুছিয়ে আনতে। আমিই বরং কাল সকালে সব গুছিয়ে নিয়ে আসবো। [রঘু বাইরে থেকে এলো]

বিনতা ॥ বেশ। আজ রাতে তা'হলে এখান থেকে খেয়ে যাও। তাতে অসুবিধে নেই তো? রঘুদা। একটু চা-এর জল চাপিয়ে দাও। আর কিছু মিষ্টি—

দিব্যেন্দু ॥ না, না। শুধু চা হ'লেই চলবে।

বিনতা ॥ তুমি থামো তো। আমার খপ্পরে যখন পড়েছো—তখন আমার কথামতই চলতে হবে। মনে নেই বিয়ের আগের দিনগুলোর কথা!

[রঘু চলে গেল]

দিব্যেন্দু ॥ মনে নেই আবার? জানেন মশাই, ওর বিয়ের আগে যেদিনই গেছি ওদের বাড়ীতে, সেদিনই চারটে ক'রে সন্দেশ জোর ক'রে গিলিয়েছে।

বিনতা ॥ জোর ক'রে! লজ্জা করে না মিথ্যে কথা বলতে? কতদিন আমাদের মীটসেফ থেকে এটাসেটা চুরি ক'রে খেয়েছো—তা মনে নেই?

[দুজনে তর্ক সুরু ক'রলো]

নিশীথ ॥ বাঃ, বেশ। উনি এলেন এক দেশ থেকে—কোথায় একটু বিশ্রাম ক'রতে বলবে—তা না ঝগড়া সুরু করলে! এই জন্যেই বলে মেয়ে মানুষ—

বিনতা ॥ দেখ, যখন তখন 'মেয়ে মানুষ', 'মেয়ে মানুষ' ব'লবে না বলে দিচ্ছি।

দিব্যেন্দু ॥ ক্ষান্ত হন মশাই। কিছুতেই পারবেন না ওর সংগে। একবার রসনা-সঞ্চালন সুরু করলে—

বিনতা ॥ তোমার রসনা-সঞ্চালন থামাও দেখি। [অন্দরের উদ্দেশে] রঘুদা। [রঘু এলো] এঁকে বাথরুমটা দেখিয়ে দাও।

নিশীথ ॥ তারপর এসো। একবার দোকানে যেতে হবে।

বিনতা ॥ দোকানে কেন?

নিশীথ ॥ কিছু মিষ্টি আনতে হবে না?

বিনতা ॥ মিষ্টিতো ঘরেই আছে। রঘুদা, তুমি যাও। [রঘু চলে গেল। নিশীথকে]—তুমি যাও, সামনের দোকান থেকে ভাল দেখে কিছু ডালমুট আর দুটো ডিম নিয়ে এসো। বেণুদা মাংসের চেয়ে ডিমটাই বেশী ভালবাসে।

দিব্যেন্দু ॥ আশ্চর্য! আমি কি কি খেতে ভালবাসি, তাও ঠিক মনে আছে দেখছি!

বিনতা ॥ কেন মনে থাকবে না? আমি তো আর পুরুষ নই।

দিব্যেন্দু ॥ নিন মশাই, কেমন একটা ঠোক্কর দিল?

নিশীথ ॥ একটা ঠোক্কর! দিনেরাতে অমন কত ঠোক্কর যে আমায় খেতে হয়!

বিনতা ॥ তাই নাকি! [দুজনে তর্ক সুরু করলো।]

দিব্যেন্দু ॥ দাম্পত্য কলহটা আমার সামনে করা কি ভাল হ'চ্ছে বিনু? [হাসলো]

বিনতা ॥ যাও, যাও। তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না। [নিশীথ প্রস্থানোদ্যত] আর হ্যাঁ, বেণুদার জন্যেও একটা টিকিট এনো।

দিব্যেন্দু ॥ টিকিট! কিসের?

নিশীথ ॥ সিনেমার। টিকিট না হয় একেবারে হাউসে গিয়েই নেব।
দিব্যেন্দু ॥ না, না আমাকে বাদ দাও বিনু। বড্ডো tired আজ।
বিনতা ॥ সিনেমা দেখলে ও সব সেরে যাবে। [নিশীথকে] পাশাপাশি সীট হবে তো? কদ্দিন যে বেণুদার সংগে সিনেমা দেখিনি!
দিব্যেন্দু ॥ ভগবান করেন, 'হাউসফুল' হয়ে যায়।
বিনতা ॥ তাতেই বা কি? দুখানা টিকিট তো আছেই। তোমাতে আমাতে যাব। উনি বাড়ী পাহারা দেবেন।
দিব্যেন্দু ॥ অগত্যা! পড়েছি যবনের হাতে। [দিব্যেন্দু ও নিশীথ হাসলো]।
বিনতা ॥ যাও। যাও। তুমি আর দেরী করো না।
নিশীথ ॥ হ্যাঁ। যাই। [চলে গেল।]
বিনতা ॥ তুমিও যাও। হাতমুখ ধুয়ে এসো। [দিব্যেন্দু চলে গেল। বিনতা ঘরের টুকিটাকি কাজ করতে লাগলো। রঘু ঢুকলো] রঘুদা একবার বাজারে যেতে হবে যে।
রঘুদা ॥ উনিও কি ভাত খাবেন?
বিনতা ॥ না, না। বেণুদা আবার রাতে ভাত খেতে পারে না। তুমি খানিকটা ময়দা মেখে ফেল। তারপর দোকানে যাও। খানিকটা রাবড়ী নিয়ে আসবে।
রঘুদা ॥ এক কৌটো বাটারও তো আনতে হবে।
বিনতা ॥ হ্যাঁ। ও ঘরের দেরাজে টাকা আছে। নিয়ে যাও।

[রঘু চলে গেল। একটু পরে দিব্যেন্দু ঢুকলো।]

দিব্যেন্দু ॥ আঃ, শরীরটা বেশ ফ্রেশ বোধ হচ্ছে। [ভালভাবে ঘরের চারিদিক দেখে তারপর চেয়ারে ব'সে] বেশ বহাল তবিয়তেই আছো দেখছি!
বিনতা ॥ তা নেহাৎ মন্দ নেই। [দিব্যেন্দুর কাছে বসলো]।
দিব্যেন্দু ॥ আচ্ছা, নিশীথবাবু শুনেছিলাম—ডাক্তার না কি যেন?
বিনতা ॥ হ্যাঁ। একটা মেণ্টাল হস্‌পিটালের।
দিব্যেন্দু ॥ মেণ্টাল হস্‌পিটালের! মানে, পাগলা গারদের!
বিনতা ॥ কতকটা তাই বটে। তারপর, তোমার খবর কি বলো?
দিব্যেন্দু ॥ ভালোই।
বিনতা ॥ ভালোই তো বুঝলাম—কিন্তু কি রকম ভালো?

দিব্যেন্দু ॥ কি আশ্চর্য! ভালো ভালোই। তার আবার রকম ফের আছে নাকি?

বিনতা ॥ আছে বৈকি। যেমন ধরো শুধু ভালো, মন্দের ভালো। তারপরও আবার প্রশ্ন থাকে কি ভালো? শরীর ভালো? না, মন ভালো? না শরীর মন দুই-ই ভালো?

দিব্যেন্দু ॥ ভালোরে ভালো! এতো আচ্ছা ভালো লোকের পাল্লায় প'ড়েছি! আমার শরীর মন সব ভালো—হ'লো তো!

[দুজনে হাসতে লাগলো। নিশীথ ঘরে আসবার মুখে এদের হাসি শুনে একটু থমকে গেল। তারপরে ঘরে ঢুকলো। হাতে ডালমুটের ঠোঙ্গা।]

নিশীথ ॥ এই নাও ডালমুট।

বিনতা ॥ ডিম আনো নি?

নিশীথ ॥ হ্যাঁ। এই যে। [পকেট থেকে বার ক'রলো।]

বিনতা ॥ পকেটে ক'রে ডিম এনেছো! বেশ। ভেঙ্গে যেত যদি? বেণুদা বসো! চা নিয়ে আসছি।

নিশীথ ॥ আমাকেও এক কাপ দিও কেমন?

বিনতা ॥ আবার?

নিশীথ ॥ লক্ষ্মীটি। প্লীজ। বড্ডো tried. বেশ, আধকাপ দিও। দিও, কেমন।

বিনতা ॥ ধন্যি নেশা তোমার। রঘুদা—[বিনতা চলে গেল।]

দিব্যেন্দু ॥ বসুন, দাঁড়িয়েই রইলেন যে। [নিশীথ ব'সলো]—সংসার ব'লতে তাহ'লে আপনারা দুজন?

নিশীথ ॥ আর ঐ রঘুদা আছে।

দিব্যেন্দু ॥ দিব্যি আরামে আছেন বলুন? কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে!—সত্যি আপনাকে দেখে হিংসে হয়।

নিশীথ ॥ কেন?

দিব্যেন্দু ॥ ভালো বাড়ী, ভালো গিন্নী, ভালো চাকরী—একজন সাধারণ লোকের যা কিছু কাম্য থাকতে পারে সবই পেয়েছেন। ক'জন লোকের ভাগ্যে এ রকম জোটে!

নিশীথ ॥ তা সত্যি। তবে আমাদের সংসারের এই সুখ আর শান্তির জন্যে বিনতার গিন্নীপনার কৃতিত্বও অনেকখানি।

[বিনতা আসছিলো। শুনতে পেল নিশীথের শেষের কথা গুলো।]

বিনতা ॥ কি ভাগ্যি আমার !

দিব্যেন্দু ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন নিশীথ বাবু। বিনতার মত স্ত্রী পাওয়া সত্যি ভাগ্যের কথা।

বিনতা ॥ বটে ! এমন উপর্যুপরি খোসামোদের কারণটা কি শুনি ?

দিব্যেন্দু ॥ বাঃ, এতে খোসামোদের কি আছে ? যা সত্যি উনি তাই বলেছেন।

বিনতা ॥ এমন সত্যি কথাটা উনি কদাচিৎ বলেন কিনা, তাই সন্দেহ হচ্ছে।

নিশীথ ॥ তার মানে ? আমি সব সময় তোমার নিন্দে করি ?

বিনতা ॥ নিন্দে করার কিছু পাওনা তাই করোনা। পেলে কি আর ছাড়তে ? তোমাদের মত পুরুষদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

নিশীথ ॥ ফের তুমি আমাদের জাত তুলে কথা বলছো ?

দিব্যেন্দু ॥ সত্যি বিনু, গোটা পুরুষ জাতটার বিরুদ্ধে মন্তব্য করা উচিত নয়।

বিনতা ॥ বাঃ, অমনি গায়ে লেগেছে ! সাধে কি আর বলি—তোমরা নিজেদের কোটটা চেনো খুব।

নিশীথ ॥ দেখ, আর যা খুশী বলো, আপত্তি করবো না। কিন্তু পুরুষরা স্বার্থপর একথা বলো না। মেয়েদের মুখে অন্ততঃ একথা সাজে না।

বিনতা ॥ আমি একশ'বার বলবো।

নিশীথ ॥ আমি হাজারবার আপত্তি করবো।

দিব্যেন্দু ॥ আমি তো লক্ষবার আপত্তি করবো !

বিনতা ॥ তুমি থামো ভীষ্মদেব। একটা বিয়ে করবায় সাহস নেই !

দিব্যেন্দু ॥ বাঃরে, এর মধ্যে আবার বিয়ের কথা উঠছে কেন ?

নিশীথ ॥ হেরে গিয়ে কথা ঘোরাচ্ছে বুঝলেন না [হাসলো]

বিনতা ॥ [রাগে] কক্ষনো না। [চা জলখাবার নিয়ে রঘু ঢুকলো] এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলে !

রঘুদা ॥ আমি তাহ'লে চট্ করে বাজার থেকে ঘুরে আসি ?

বিনতা ॥ হ্যাঁ যাও। বেশী দেরী করো না। এলে আমরা বেরুবো। [রঘু চলে গেল] সত্যি বেণুদা তুমি কি বিয়ে করবে না ঠিক করেছো ?

দিব্যেন্দু ॥ দরকার কি ? এই তো বেশ আছি।

বিনতা ॥ বাজে কথা রাখো। সংসারী হ'তে মন চায় না কেন বলো তো ?

দিব্যেন্দু ॥ সংসারই নেই—তা সংসারী হবো কি ক'রতে ?

বিনতা ॥ সেইজন্যেই তো বলছি বিয়ে ক'রতে। মাথার উপর কেউ নেই বলে কদ্দিন আর এমনি ছন্নছাড়া হ'য়ে ঘুরে বেড়াবে?

দিব্যেন্দু ॥ যদ্দিন না ফুল ফুটবে। জানোতো, . জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে—তিন বিধাতা নিয়ে!

বিনতা ॥ হুঁ। বিধাতার ওপর বড্ড ভক্তি জন্মেছে দেখি! দেবো নাকি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে!

দিব্যেন্দু ॥ মানে?

বিনতা ॥ বেণুদা বিয়ে করতে চায় না কেন জানো?

নিশীথ ॥ কেন?

বিনতা ॥ দেবী ব'লে?

দিব্যেন্দু ॥ বিনু প্লীজ—don't be ungenerous!

বিনতা ॥ উনি একটি মেয়েকে কথা দিয়েছিলেন—

দিব্যেন্দু ॥ না, না। সেজন্যে ঠিক নয়—মানে—

নিশীথ ॥ [হাসে] তা যাকে ভালবাসতেন তাকেই বিয়ে করলেন না কেন?

দিব্যেন্দু ॥ [লজ্জা পেলে] ক'রলাম না মানে—সামাজিক বাধা ছিলো।

বিনতা ॥ সামাজিক বাধা না ছাই। আসলে তোমারই সাহস হয়নি তাই বলো। নইলে সে মেয়ে তো রাজীই ছিলো?

নিশীথ ॥ রাজীই ছিলো! সে মেয়ের মনের কথাও তুমি জানতে?

বিনতা ॥ জানতাম বৈকি।

দিব্যেন্দু ॥ যাকৃগে বাজে কথা থাক। আসুন স্যার, দুজনে মিষ্টিগুলোর সদ্ব্যবহার করি।

বিনতা ॥ না, না। তুমি একাই নাও!

দিব্যেন্দু ॥ এত খেয়ে মারা পড়বো নাকি?

বিনতা ॥ এতো আবার কি? ভারীতো চারটে সন্দেশ। ও তো একটা কচি ছেলেতেও খেতে পারে।

দিব্যেন্দু ॥ তা পারে। কিন্তু আমি তো কচি নই।

বিনতা ॥ থাক, থাক। অত বিনয়ে কাজ নেই। তুমি যে একটি পয়লা নম্বরের পেটুক তা আমার বেশ জানা আছে। [দিব্যেন্দু ও নিশীথ হাস্‌লো]

নিশীথ ॥ যাক, আপনার কপালেও তাহ'লে একটা বিশেষণ জুটলো।—পয়লা নম্বরের পেটুক!

দিব্যেন্দু ॥ তা হোক। তবু তো পয়লা নম্বরের! [সন্দেশ খেতে লাগলো]

নিশীথ ॥ জানেন মশাই, আমাকেও অমনি একটা বিশেষণ দিয়েছে—পয়লা নম্বরের পাগল।

দিব্যেন্দু ॥ কি আস্পর্ধা! আপনাকে পাগল বলেছে!

বিনতা ॥ পাগলই তো। বদ্ধ পাগল তুমি।

নিশীথ ॥ শুনছেন তো? শুনুন।

দিব্যেন্দু ॥ কি সাংঘাতিক কথা!

নিশীথ ॥ আচ্ছা মশাই—এই যে এতক্ষণ কথা বলছি আপনার সংগে—এর মধ্যে কোথাও এতটুকু পাগলামির ঝোঁক দেখেছেন?

দিব্যেন্দু ॥ একটুও না।

নিশীথ ॥ অথচ দেখুন, আমাকে পাগল প্রমাণ করবার জন্যে বাজী পর্যন্ত ধ'রেছে!

বিনতা ॥ বেশ তো। তুমি পাগল কিনা—তার প্রমাণ হয়ে যাক। বেণুদা তুমিই বিচার করবে।

দিব্যেন্দু ॥ না, না, আমাকে এসব পাগলামি কাণ্ডকারখানার মধ্যে টানছো কেন?—শেষে যে আমিই পাগল হ'য়ে যাব!

নিশীথ ॥ না মশাই, পেছিয়ে গেলে চলবে না। আপনাকেই বিচার করতে হবে। তিনদিন সময় আছে। এর মধ্যে ও আমাকে পাগল প্রমাণ ক'রে ছাড়বে বলেছে।

দিব্যেন্দু ॥ আপনি challenge accept ক'রেছেন?

নিশীথ ॥ নিশ্চয়ই। আমি হ'লাম গিয়ে পাগলামি সারানোর ডাক্তার—আর আমাকেই বলে কিনা পাগল!

দিব্যেন্দু ॥ না, না। কাজটা ভাল করেননি মশাই। তিনদিন কেন, তিন ঘণ্টার মধ্যে বিনতার মত যে কোনও মেয়ে, যে কোনও পুরুষকে বদ্ধ পাগল ক'রে ছেড়ে দিতে পারে!

নিশীথ ॥ দেখাই যাকনা—ওর দৌড় কতদূর। মনে থাকে যেন, হেরে গেলে একটি বচ্ছর বাপের বাড়ী যেতে পাবে না!

বিনতা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

দিব্যেন্দু ॥ না, বিনু কাজটা ভাল হ'চ্ছেনা। ওঁর যা মনের জোর দেখছি—

বিনতা ॥ দেখাই যাকনা—উনি কেমন পাগলামি সারানোর ডাক্তার!

নিশীথ ॥ [সিগারেট কেস এগিয়ে দিল] নিন স্যার।
দিব্যেন্দু ॥ [সিগারেট নিয়ে দেখে ফিরিয়ে দিল] ক্যাপস্টান ?—চলবে না তো। বিড়িখোর লোক মশাই—ও গোলাপী নেশায় শানাবে না।
বিনতা ॥ ইস্—তুমি বিড়ি খাও!
দিব্যেন্দু ॥ হ্যাঁ—খাই তাতে কি ?
বিনতা ॥ মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরোয় না ভক্ ভক্ করে!—কেন সিগারেট খেতে পারো না ?
দিব্যেন্দু ॥ খাইতো—চারমিনার। [পকেট হাতড়ে] ঐ যাঃ সিগারেটের প্যাকেটটা কোথায় ফেললাম ?
নিশীথ ॥ আপাততঃ একটা ক্যাপস্টানই নিন না ?
দিব্যেন্দু ॥ মাফ করবেন। স্ট্যাণ্ডার্ড খাটো করতে পারবো না। [উঠে দাঁড়ালো] এখনি আসছি সিগারেট নিয়ে।
বিনতা ॥ ধন্যি নেশা করা বাবা তোমাদের! সিগারেট খাবে—তাও বেছে বেছে—এটা নয়, সেটা নয়!
দিব্যেন্দু ॥ তোমরা শাড়ী জামা বেছে বেছে পরো না ?
নিশীথ ॥ একটা শাড়ী কিনতে কাপড়ের দোকানের গুদাম উজাড় ক'রে ফেলো না ?
বিনতা ॥ ঘাট হ'য়েছে বাবা আমার।—যাও, যা নেবার নিয়ে এস চট ক'রে।
দিব্যেন্দু ॥ পারবে আমাদের সংগে তর্ক করে ?
বিনতা ॥ আর কি, ঐ তর্ক করতেই তো শিখেছো! বাক্যবাগীশ কোথাকার।
নিশীথ ॥ যান মশাই, চট করে ঘুরে আসুন। যা চ'টেছে—বেশীক্ষণ একা থাকতে ভরসা হয় না।

[দিব্যেন্দু হেসে চলে গেল বাইরে]

বিনতা ॥ লোক দেখলে তুমি বড্ডো বাড়াও বুঝলে।
নিশীথ ॥ বাঃরে, আমি আবার কি বাড়াবাড়ি ক'রলাম ?
বিনতা ॥ বেণুদার সামনে আমাকে অমনভাবে ডাউন করলে কেন ?
নিশীথ ॥ বাঃ আমি ডাউন করলাম না, তুমিই আমাদের দুজনকে বাক্যবাগীশ বলে একেবারে নস্যাৎ ক'রে দিলে ?
বিনতা ॥ তা ছাড়া আর কি তোমরা ? [প্রস্থানোদ্যত]

নিশীথ ॥ সে যাই হোক। তোমার বেণুদা কিন্তু বেশ লোক।
বিনতা ॥ [ফিরে] হ্যাঁ। ও বরাবরই এমনি মিশুকে। হৈ চৈ ভীষণ ভালবাসে।
নিশীথ ॥ আচ্ছা, উনি তোমার কে হন ?
বিনতা ॥ সে কি ! তুমি চিনলে না ওকে ?
নিশীথ ॥ নাঃ, ওঁর পরিচয় তুমি কোনওদিন দিয়েছো বলে তো মনে পড়ে না।
বিনতা ॥ নিশ্চয়ই বলেছি—মনে নেই তাই বলো ? [মনে মনে বিনতা কি যেন মতলব ভাঁজছে।]
নিশীথ ॥ উঁহু। আমার মেমারী অত খারাপ নয়। এর কথা তুমি আগে কখনও বলো নি।
বিনতা ॥ বলিনি বুঝি ?
নিশীথ ॥ বলেছো বলে তো মনে পড়ছে না।
বিনতা ॥ তাহলে বোধ হয় ভুলে গেছি বলতে।
নিশীথ ॥ [অর্থপূর্ণ স্বরে] সত্যিই কি ভুলে গিয়েছিলে ?
বিনতা ॥ কেন, বিশ্বাস হ'চ্ছে না ?
নিশীথ ॥ তোমার উত্তরটা সত্যিই খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না।
বিনতা ॥ কেন ?
নিশীথ ॥ দিব্যেন্দুবাবু কি খেতে ভালবাসেন, ওঁর সংগে কতদিন সিনেমা দেখনি, উনি কেন বিয়ে করছেন না—এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তুমি এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বললে যে, তা শোনবার পর যে কোনও লোকের এই কথাটাই মনে হবে এককালে ওঁর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা বেশ ঘনিষ্ঠই ছিল। আর এত ঘনিষ্ঠ যে—বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে সে কথা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।
বিনতা ॥ বাঃ, এটাও একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নাকি ?
নিশীথ ॥ নিশ্চয়ই। আর সেই জন্যেই তো মনে হচ্ছে—তোমার বেণুদার কথা তুমি ভোলোনি, ভুলতে পারো না। তবে যে কোনও কারণেই হোক—ওঁর সংগে যে এককালে তোমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—এ কথাটাও তুমি আমার কাছে গোপন রাখতে চাও !
বিনতা ॥ যদি বলি সত্যিই তাই।
নিশীথ ॥ তাহ'লে বলবো, আজ আর কোনও সংকোচ না করে—সে গোপন কথাটা খুলে বলো।

বিনতা ॥ আমার গোপন কথা জানবার জন্যে ভারী কৌতূহল দেখছি !

নিশীথ ॥ হ্যাঁ—তা একটু কৌতূহল হ'চ্ছে বৈকি !

বিনতা ॥ অথচ আজ সকালেও না তুমি বলেছো—আমার কোনও গোপন কথা জানার জন্যে তোমার কোন কৌতূহল নেই !

নিশীথ ॥ সে বলেছিলাম এই জন্যে যে, আমি তখনও পর্যন্ত বিশ্বাস করতাম —তোমার এমন কোনও কথা থাকতে পারে না, যা তুমি আমার কাছেও গোপন রাখতে পারো।

বিনতা ॥ তবে সেই বিশ্বাসেই এই কৌতূহলটুকু ঠেকিয়ে রাখোনা কেন ?

নিশীথ ॥ উঁহু। এখন আর তা সম্ভব নয়। একটা কৌতূহল যখন জেগেছে তখন আসল কথাটা না জানা পর্যন্ত তা মরবে না। তা ছাড়া দেখ, এভাবে মনের কোনও জিজ্ঞাসাকে লুকিয়ে রাখা উচিত নয়। তাতে মনেরও ক্ষতি হয় – সংসারেও অশান্তি বাড়ে।

বিনতা ॥ বাঃ, সংসারে অশান্তি বাড়বে কেন ?

নিশীথ ॥ বাড়বে না ?—এই ধরোনা কেন, দিব্যেন্দুবাবুর সংগে তোমার সম্পর্কটা যে নেহাৎ তুচ্ছ নয়—তা তুমিও জানো, আমিও বেশ বুঝতে পারছি।

বিনতা ॥ বেশতো—তাতে কি হলো ?

নিশীথ ॥ সেই সম্পর্কটা যে ঠিক কি ধরণের তা জানবার জন্যেই কৌতূহল জেগেছে। অথচ তা যদি না জানতে পারি তাহ'লে এই কৌতূহল থেকেই মনের মধ্যে নানান সন্দেহ দেখা দেবে।

বিনতা ॥ অর্থাৎ আমি যদি সব কথা খুলে না বলি—তাহ'লে তুমি আমাকে সন্দেহ ক'রতে স্থরু করবে ?

নিশীথ ॥ অসম্ভব নয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, একটা সন্দেহ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

বিনতা ॥ ছিঃ, তুমি আমাকে সন্দেহ করো !

নিশীথ ॥ আমার মনে এ সন্দেহ জাগানোর জন্যে তুমিই কিন্তু দায়ী।

বিনতা ॥ আমি !

নিশীথ ॥ হ্যাঁ তুমি। [একটু চুপ] একথা কি অস্বীকার করতে পারো যে, দিব্যেন্দুবাবুর কথা তুমি সত্যিই ভোলনি ? [বিনতা চুপ] বলো। চুপ করে রইলে কেন ?

বিনতা ॥ [ধীর শান্ত স্বরে] না ভুলে যাইনি। ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম।

নিশীথ ॥ কেন? [বিনতা চুপ]—কারণটা তুমি না বললেও আমি ব্যাখ্যা করে দিতে পারি—শুনবে?

বিনতা ॥ আজ এ আলোচনা থাক না।

নিশীথ ॥ আশ্চর্য!—এই সামান্য কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে চাইছ কেন?

বিনতা ॥ যে কথা ভুলে থাকবার জন্যে আমি চেষ্টা ক'রছি—

নিশীথ ॥ কিন্তু ভুলে যাব বললেই কি সব কথা ভুলে থাকা যায়?

বিনতা ॥ যায় না?

নিশীথ ॥ না। মানুষ ইচ্ছে করলেই তার জীবনের কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ভুলে যেতে পারে না।

বিনতা ॥ মানুষ কি চেষ্টা ক'রলে তার জীবনের কোনও দুর্ঘটনার কথাও ভুলতে পারে না?

নিশীথ ॥ না। যে ঘটনার স্মৃতি মানুষের মনকে কষ্ট দেয় বা লজ্জা দেয়—মানুষ প্রাণপণে তা ভুলে থাকবার চেষ্টা করে।—একে বলে অবদমন। কিন্তু সেই ঘটনার স্মৃতি তার সত্বা থেকে সে একেবারে মুছে ফেলতে পারে না।

বিনতা ॥ তুমি কেমন ক'রে জানলে?

নিশীথ ॥ ভুলে যেওনা আমি মনোবিজ্ঞানী।

বিনতা ॥ মনোবিজ্ঞানীরা কি মানুষের মনের সব কথা টের পায়?

নিশীথ ॥ পায় বৈকি। এই মুহূর্তে আমি যেমন তোমার মনের কয়েকটা চোরাগলির সন্ধান পাচ্ছি॥

বিনতা ॥ কি জেনেছো তুমি আমার সম্বন্ধে?

নিশীথ ॥ সব কিছু না হ'লেও এটুকু অন্ততঃ স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে—বিয়ের আগে দিব্যেন্দুবাবুর সংগে তোমার এমন একটা সম্পর্ক ছিল যাকে ভদ্র-ভাষায় বলে—অসামাজিক।

বিনতা ॥ অসামাজিক!

নিশীথ ॥ নিশ্চয়ই।

বিনতা ॥ কক্ষনো না।

নিশীথ ॥ [হঠাৎ আক্রমণ ক'রলো] দিব্যেন্দুবাবুকে যদি তুমি সত্যিই ভালো-বাসতে তবে তাঁকেই বিয়ে করলে না কেন? [বিনতা চুপ]—বলো?

বিনতা ॥ [ধীরভাবে] সামাজিক বাধা ছিল।

নিশীথ ॥ সত্যিকার ভালবাসা কোনও দিন কোনও বাধার কাছে হার মানে নি—হার মানেও না।

বিনতা ॥ জানি।

নিশীথ ॥ তবে? [বিনতা চুপ]—জানতাম, এর কোনও জবাব তুমি দিতে পারবে না।

বিনতা॥ বিয়ের আগে কোনও মেয়ে যদি কোনও পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তবে সেটা কি অন্যায় ?
নিশীথ॥ মেলামেশাটা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেলে অন্যায় হয় বৈকি।
বিনতা॥ তোমার জীবনেও তো এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিলো। কই, আমি তো তা নিয়ে কিছু বলিনি।
নিশীথ॥ বলবার উপায় ছিল না। কারণ আমি অকপটে সব স্বীকার করেছি। আর তুমি কপটতার আশ্রয় নিয়েছিলে।
বিনতা॥ কি ক'রে বুঝলে ?
নিশীথ॥ মানুষের মন নিয়েই যে আমাদের কারবার। আমাদের ছলনা করা কি এতই সহজ ?
বিনতা॥ [ব্যঙ্গ ক'রলো] তাই নাকি! তবে তো সত্যিই ভারী ভয়ের কথা!
নিশীথ॥ [উত্তেজিত] অস্বীকার করতে পারো, তোমার আর দিব্যেন্দুর মধ্যে ভালবাসার টানটাই বড় ছিলো না ?
বিনতা॥ [দৃঢ়স্বরে] কক্ষনো না। Never !
নিশীথ॥ আঃ, চীৎকার ক'রো না।
বিনতা॥ চীৎকার করিনি। প্রতিবাদ করছি।
নিশীথ॥ প্রতিবাদ! বাঃ, কথা শিখেছো তো বেশ!
বিনতা॥ কথা কেউ অমনি শেখে না। তুমি যা বলছো তা শুনলে বোবা মেয়ের মুখেও কথা ফুটতো।
নিশীথ॥ তাই নাকি! একটা নতুন তত্ত্ব শিখলাম বটে। অন্যায় কাজ করাটা দোষের নয়—কাজটাকে অন্যায় বলাটাই দোষের!
বিনতা॥ তোমার কাছে যা অন্যায়—অন্যের কাছে তা তো অন্যায় নাও হ'তে পারে।
নিশীথ॥ চোর যখন চুরি করে তখন সেও বোধ হয় ঐ যুক্তিতেই চুরি করে! ন্যায় অন্যায় বিচার বোধটা তোমার বেশ প্রখর হ'য়েছে দেখছি!
বিনতা॥ হ'য়েছেই তো। ন্যায় অন্যায় বিচার করবার অধিকার তোমার মত পুরুষদেরই একচেটে নাকি ?
নিশীথ॥ থাম। থাম। নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত!
বিনতা॥ সে কথাটা তুমিই ভুলে গেছ। তা না হ'লে যার সম্বন্ধে কিছু জানোনা—
নিশীথ॥ [চীৎকার ক'রে] তুমি চুপ করবে কিনা জানতে চাই। বেহায়া, নির্লজ্জ কোথাকার।
বিনতা॥ যুক্তিতে পারলে না তাই গালাগাল দিতে সুরু ক'রেছো ? বাঃ, এই না হ'লে আর পুরুষ মানুষ!

নিশীথ ॥ [ছটফট করতে লাগলো] উঃ অসহ্য। অসহ্য। [বিনতার কাছে এসে] তুমি যদি আমার স্ত্রী না হ'তে—

বিনতা ॥ তাহ'লে বোধ হয় গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে—তাই না ?

নিশীথ ॥ তোমার মত লোককে নিয়ে ঘর করতে হবে ভাবতেও আমার লজ্জা করছে।

বিনতা ॥ ও কথা বলবার অধিকার আমারও আছে।

নিশীথ ॥ থামো। থামো। অধিকার ! অধিকার ফলাতে এসেছো ? আমি তোমার সেই ইডিয়েট বেণুদা নই—

বিনতা ॥ কেন তাঁকে গালাগাল করছো ? তাঁকে গালাগাল দেবার কোনও অধিকার তোমার নেই। [দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকতে গিয়ে থেমে গেল। আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলো]

নিশীথ ॥ অধিকার আছে কি নেই, সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি ? [পকেট থেকে সিনেমার টিকিট বার করে ছিঁড়ে ফেললো]—Scoundrel ! Stupid !

বিনতা ॥ ওকি !—টিকিট ছুটো ছিঁড়ছো কেন ?

নিশীথ ॥ [কাগজের টুকরোগুলো দলা পাকিয়ে দূরে ফেলে দিল] বেণুদার পাশে বসে সিনেমা দেখবার বড্ডো সখ—তাই না ? I must get him out this very night ! [দিব্যেন্দু অন্তরাল থেকে ঘরে এলো]

দিব্যেন্দু ॥ তার আর দরকার হবে না নিশীথ বাবু। আমি নিজেই যাচ্ছি।

বিনতা ॥ না, তুমি যেতে পাবে না।

দিব্যেন্দু ॥ ছেলেমানুষী করো না বিনু।

বিনতা ॥ তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। এ বাড়ীতে ওঁরও যতটা অধিকার আছে আমারও ততটা অধিকার আছে।

নিশীথ ॥ বটেই তো ! বেশ। তোমরা থাক। আমিই বেরিয়ে যাচ্ছি বাড়ী থেকে।

দিব্যেন্দু ॥ কি ছেলেমানুষী ক'রছেন নিশীথ বাবু ?

নিশীথ ॥ Shut up. আপনার জন্যেই আমার ঘরের শান্তি নষ্ট হয়েছে। রঘুদা—রঘুদা !

বিনতা ॥ চেঁচাচ্ছো কেন ? রঘুদা বাড়ী নেই।

দিব্যেন্দু ॥ নিশীথ বাবু—আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না কি ভাবে আমি আপনার সংসারের শান্তি নষ্ট করেছি। তবু যদি অজ্ঞাতে কিছু অন্যায় ক'রে থাকি, ক্ষমা করবেন। আমি এখনই চলে যাচ্ছি। [দোরের দিকে গেল।]

বিনতা ॥ [বাধা দিয়ে] না তুমি যেতে পাবে না।

নিশীথ ॥ না, না আপনি যাবেন কেন? আপনি থাকুন—আপনারাই থাকুন। আমিই চলে যাচ্ছি।

[ছুটে অন্দরে চলে গেল। দিব্যেন্দু বিমূঢ়। বিনতাও নিশীথের পেছনে গেল। অনতিবিলম্বে একটা ছোট চামড়ার সুটকেশ আর এক বোঝা জামা কাপড় নিয়ে ফিরে এলো। টেবিলের ওপর সুটকেশ রেখে জামাকাপড় ভ'রতে লাগলো। রাগে অধীর সে। বিনতা তার কাণ্ড দেখে বহু কষ্টে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি চাপলো।]

বিনতা ॥ ও সুটকেশটা ছোট। একটা বড় ট্রাঙ্ক এনে দেব?

দিব্যেন্দু ॥ আঃ বিনু। নিশীথবাবু শুনুন—

নিশীথ ॥ থাক। আর ভালমানুষির দরকার নেই। I am tried of it. আমার জীবনটাই আপনারা বিষিয়ে দিয়েছেন।

বিনতা ॥ [জোরে হেসে ফেললো] খুব হ'য়েছে ওঠো এবার। আর তেজ দেখিয়ে কাজ নেই। [নিশীথের হাত ধ'রে টানলো।]

নিশীথ ॥ না, না ছেড়ে দাও। [হাত ছাড়িয়ে নিল]

বিনতা ॥ ছেড়ে দাও বললেই যদি ছাড়া পাওয়া যেত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল কি? নাও সরো। [নিশীথকে সরিয়ে দিল] আচ্ছা তুমি কি গো? কাকে কান নিয়ে গেল শুনেই কাকের পেছনে ছুটলে! [নিশীথ অবাক]

দিব্যেন্দু ॥ কি ব্যাপার বলুন তো? সবটাই কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে!

বিনতা ॥ ব্যাপার আর কি? তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে কি তা বুঝতে আর বোঝাতে গিয়েই যত গণ্ডগোল।

দিব্যেন্দু ॥ সেকি! ওর সংগে তো আমার সম্পর্কটা আদৌ জটিল নয়! কি বুঝিয়েছো ওঁকে?

বিনতা ॥ আমি আর বোঝাবার সময় পেলাম কই? তার আগেই তো উনি সব বুঝে ফেললেন। মনোবিজ্ঞানী কিনা!

নিশীথ ॥ থামো। থামো।

বিনতা ॥ বাপ্‌স্ এখনও রাগ পড়েনি দেখছি!—বেণুদা হ'চ্ছে আমার আপন জাঠতুতো ভাই বুঝলে?—সেই যে বৈরাগী জেঠার কথা বলেছিলাম—

নিশীথ ॥ [লজ্জায় বিস্ময়ে] এ্যাঁ!

বিনতা ॥ এ্যাঁ নয়, হ্যাঁ।

দিব্যেন্দু ॥ কি আশ্চর্য!—এ-খবরটা আপনি জানতেন না?

বিনতা ॥ জানবেন না কেন?—জানতেন সবই তবে—

নিশীথ ॥ [অপ্রস্তুত] না, না। সত্যিই জানতাম না।—মানে—

বিনতা ॥ থাক। আর 'মানে' 'মানে' ক'রে কাজ নেই। এখন হার মানলে কিনা—তাই বলো?

নিশীথ ॥ কেন! কিসে? বাঃরে—

বিনতা ॥ বাঃ বেশ। বেণুদা তুমি তো দেখলে শুনলে সব। ওঁর কাণ্ড দেখে কি ওঁকে বদ্ধ পাগল বলে মনে হয় নি তোমার ?

নিশীথ ॥ এ্যাঁ ! কি শয়তান !—এইভাবে আমাকে ঠকালে !

বিনতা ॥ ঠকালাম বৈকি ? পুরুষ জাতটাই এমনি। স্বার্থে ঘা পড়লে তাদের আর মাথার ঠিক থাকে না।

দিব্যেন্দু ॥ কক্ষনো না।

বিনতা ॥ থাক। আর বড়াই ক'রে কাজ নেই। চোখের সামনেই তো একটি উদাহরণ দেখলে ?

নিশীথ ॥ সত্যি বড়ো অন্যায় হয়ে গেছে। কেন যে মাথাটা বিগড়ে গেল হঠাৎ।

বিনতা ॥ হঠাৎ যায়নি মশাই—হঠাৎ যায়নি। আমি স্ত্রী হ'য়ে স্বামীর মুখের ওপর কথা বলেছি—আমার অধিকার সাব্যস্ত করতে চেয়েছি—আর কি মাথার ঠিক থাকে ?

নিশীথ ॥ না, না, কক্ষনো সেজন্যে নয়—

দিব্যেন্দু ॥ আমি কিন্তু ব্যাপারটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি বিনু।

বিনতা ॥ ব্যাপার আর কি ?—পুরুষরা কখনো স্বার্থপর হয় না, পুরুষরা কখনো স্ত্রীর ওপর স্বামীত্বের অধিকার ফলাতে চায় না—এ-কথা উনি প্রায়ই বলেন। তাই আমিও ঠিক ক'রেছিলাম, কত তুচ্ছ কারণে যে পুরুষরা স্বার্থপর হ'তে পারে—তাদের স্বামীত্বের অধিকারে ঘা পড়লে তারা যে কেমন ক্ষ্যাপামি সুরু করে—তা আমি প্রমাণ করবো।

নিশীথ ॥ তুমি তো বড়ো সাংঘাতিক মেয়ে ! কবে কি বলেছি ঠাট্টা ক'রে—

দিব্যেন্দু ॥ কিন্তু একা নিশীথবাবুকে দিয়েই তো গোটা পুরুষ জাতটার বিচার হ'তে পারে না ?

বিনতা ॥ তা পারে না জানি। কিন্তু উনি যে গোটা পুরুষ জাতটার পক্ষ নিয়েই কথা বলতেন।—মনে থাকে যেন, শ্যাওলা রংএর টিস্যু শাড়ী।

দিব্যেন্দু ॥ [হেসে] ওঃ একেই বলে স্ত্রীলোক। এত কাণ্ডের মধ্যেও শাড়ীর কথাটি ঠিক মনে আছে।

[সকলে হেসে উঠলো।]

বিনতা ॥ [ঘড়ির দিকে নজর পড়তে] - ইস্ আটটা যে বেজে গেছে !—বেণুদা নাও।—ওঠো।

দিব্যেন্দু ॥ কেন ?

বিনতা ॥ বাঃ সিনেমায় যেতে হবে—মনে নেই ? [নিশীথকে]—তেজ দেখিয়ে টিকিটগুলো তো ছিঁড়লে—টাকাগুলো জলে গেল তো ?

নিশীথ ॥ হুঁ। গেল—তো—

বিনতা ॥ তোমার সিগারেটের বরাদ্দ থেকে কাটা যাবে।

নিশীথ ॥ বিহু—না, প্লীজ। সিগারেট কমালে সত্যি মারা পড়বো।
বিনতা ॥ উহুঁ। কোনও কথা শুনছি না। দোষ করেছো—তার শাস্তি পেতে হবে বৈকি!
দিব্যেন্দু ॥ উঃ বিহু—তুমি কি নিষ্ঠুর!

[সকলে হেসে ফেললো।]

দিবেন্দু ॥ ঐ যাঃ, ঘড়িটা খুলে হাত ধুচ্ছিলাম—কলতলায় রেখে এসেছি। দাঁড়াও নিয়ে আসি। [দিব্যেন্দু ভেতরে গেল]
বিনতা ॥ [ছড়ানো কাপড়গুলো গোছাতে-গোছাতে] ধোপদুরস্ত জামা কাপড়গুলোর কি দশা ক'রলে দেখো তো?—এইজন্যেই বলে নিগুর্ণ পুরুষের তিনগুণ রাগ!

[নিশীথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিনতার কাজ দেখতে লাগলো। তার মন অকৃত্রিম অনুশোচনায় ভ'রে উঠলো।]

নিশীথ ॥ সত্যি বিহু, তোমাকে অবিশ্বাস করাটা আমার উচিত হয় নি।
বিনতা ॥ স্ত্রীর অসম্মানে স্বামীর সম্মান যে বাড়েনা, একথা তোমরা ভুলে যাও বলেই তো সংসারে এত অশান্তি বাড়ে।
নিশীথ ॥ [বিনতার কাছে এসে তার কাঁধে হাত রেখে আবেগে] কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সত্যিই অবিশ্বাস করিনা।
বিনতা ॥ [তার হাতটা চেপে ধরে সলজ্জে] আমি জানি। [তারা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল পরিবেশটাকে। পেছনে দিব্যেন্দু ঢুকলো। একটা সাদা রুমাল উড়িয়ে]
দিব্যেন্দু ॥ শান্তি! শান্তি!
বিনতা ॥ রঘুদা আমরা চ'ল্লাম—ঘরদোর সামলে সুমলে রেখো। আর ডিমটা রেঁধে ফেলো।—উনুনে আঁচ রেখো আর—
দিব্যেন্দু ॥ আর কোনও কথা নয়। All quiet on the family front—Now to the cinema—March.

[বিনতার এক হাত ধরলো নিশীথ, আর এক হাত দিব্যেন্দু। উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে তিনজনে বেরিয়ে গেল। হতভম্ব রঘু ঘরের মাঝে এগিয়ে এসে আপন মনেই বললে—]

রঘুদা ॥ পাগলগুলো ভালোয় ভালোয় ফিরলে বাঁচি!—

[ভেতরে চ'লে গেল।]